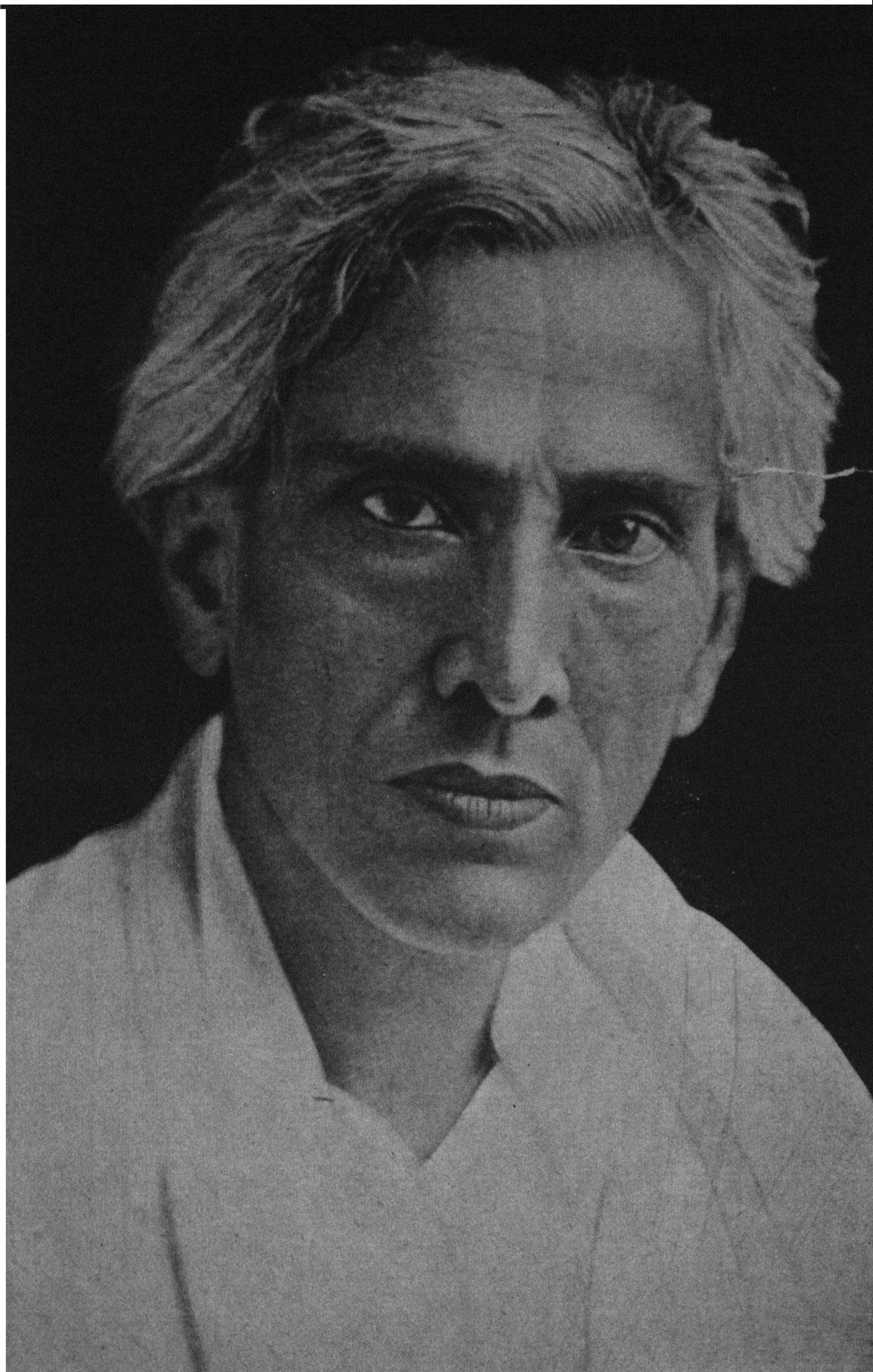


শরৎ-কথামালা

ইন্দ্রমিত্র



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি আই টি স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : ৩১ ভাদ্র ১৩৬৭

নিবেদন

ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, গার্ল্‌স' কলেজ, হাওড়া, শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগার, পানিত্রাস, শ্রীমোনা চৌধুরী এবং স্বর্গত হরেন্দ্রনাথ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমিয় ঘোষের কাছে বিস্তর সাহায্য পেয়েছি। সকলের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি।

এই বইখানা কিশোরকিশোরীদের জন্য লেখা।

ইন্দ্রমিত্র

শ্রীসুধেন্দু মল্লিক

সুহৃদবরেষু

১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামে নতুন একটি উপন্যাসের প্রথম কিস্তি বেরিয়েছে। লেখকের নাম ছাপা নেই।

রবীন্দ্রনাথ কি তখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক? না। সম্পাদক না হলেও তিনি তখন 'বঙ্গদর্শনে'র মূল ভরসা।

রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল, নিবেদন করেছেন: "নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসরকাল চালনা করিয়া বর্ত্তমান বৎসরে আমি সম্পাদকপদ হইতে নিষ্কৃতি গ্রহণ করিতেছি। এই পাঁচ বৎসর নানা দুঃখ দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিশ্রামপ্রার্থী। আশা করি, পাঠকগণ আমার সম্পাদনকালের সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া আমাকে অবসরদান করিবেন। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৩।"

এবং শৈলেশচন্দ্র মজুমদার নিবেদন করেছেন: "গত দুই বৎসর হইতেই সম্পাদকমহাশয় অবসর লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের একান্ত অনুরোধেই লন নাই; এখন কিন্তু তাঁর বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক, তিনি এখন বৈষয়িক সকল বন্ধন হইতেই মুক্তি পাইবার প্রয়াসী, আর তাঁহাকে সম্পাদকরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারা গেল না। নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন-প্রচারের সময়ে প্রথমে রবীন্দ্রবাবুকে সম্পাদকরূপে পাইবার আশা আমাদের ছিল না, তবু প্রধানত তাঁহারই সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবার ভরসাতেই আমরা বঙ্গদর্শনপ্রকাশে সাহসী ও উৎসাহী হইয়াছিলাম। আজও আবার তাঁহারই নির্দ্দেশে ও উপদেশে বঙ্গদর্শনপ্রচারে ব্রতী রহিলাম। রবীন্দ্রবাবু সম্পাদক না থাকিলেও বঙ্গদর্শনের মূল-ভরসা তিনিই। তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে, প্রধানত তাঁহারই সহায়তায়, বঙ্গদর্শন পরিচালিত হইবে। ইতি।"

পকেটে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখের একখানা 'ভারতী' নিয়ে শৈলেশচন্দ্র হাজির হলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগ গুরুতর: নিজের কাগজ 'বঙ্গদর্শনে'র দাবি অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে লেখা দিয়েছেন কেন?

রবীন্দ্রনাথ বললেন—তা হয়েছে, কখনও হয়তো ওরা কবিতা-টবিতা সংগ্রহ করে রেখে থাকবে, প্রকাশ করেছে।

চোখ বড় করে শৈলেশচন্দ্র বললেন—কবিতা-টবিতা কি বলছেন মশায়? উপন্যাস!

রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বললেন—উপন্যাস কি বলছ শৈলেশ? উপন্যাস

লিখলামই বা কখন আর 'ভারতী'তে তা প্রকাশিত হলই বা কেমন করে? তুমি নিশ্চয়ই ভুল করছ!

পকেট থেকে 'ভারতী'খানা বের করে নতুন উপন্যাসের পাতাটি খুলে রবীন্দ্রনাথের সামনে রাখলেন শৈলেশচন্দ্র। বললেন—নাম না দিলেই কি এ আপনি লুকিয়ে রাখতে পারেন? এখনও কি অস্বীকার করছেন?

রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে রচনাটি আদ্যোপান্ত পড়লেন। তারপর বললেন—লেখাটি সত্যিই ভারি চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার বলে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্যিই অন্য লোকের।

রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন শৈলেশচন্দ্র। বললেন—আপনার নয়?

মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু মাথা নাড়লেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হল; লেখকের নাম ছাপা হয়নি। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র তৃতীয় কিংবা শেষ কিস্তি প্রকাশিত হল; সেবার লেখকের নাম ছাপা হয়েছে : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু কে এই শরৎচন্দ্র?

ছেলেবেলায় কতগুলি ফোড়া ও ঘা হয়ে মাথার চুল সব উঠে যায়। ঠাকুরমা তাই আদর করে নাম রেখেছেন—ন্যাড়া।

ন্যাড়ার ভালো নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। শরৎচন্দ্রের বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মায়ের নাম ভুবনমোহিনী। ইনি হালিশহরের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। শরৎচন্দ্রের দিদির নাম অনিলা দেবী। মতিলালের সাতটি পুত্রকন্যা। নরেন্দ্র দেব লিখেছেন : "প্রথম কন্যা অনিলা দেবী, তারপরই জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র, তারপর দুটি পুত্রের শিশুকালেই মৃত্যু হয়, চতুর্থ প্রভাসচন্দ্র, পঞ্চম পুত্র প্রকাশচন্দ্র। এঁরা সকলেই দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কেবল সর্বশেষ কন্যা শ্রীমতী সুশীলা দেবীর জন্ম হয় ভাগলপুরে মাতুলালয়ে। এইজন্য পশ্চিমা মেয়েদের নামের অনুকরণে এঁর ডাকনাম হয়েছিল 'মনিয়া'।"

অস্থির স্বভাবের মানুষ মতিলাল। কোনও কাজেই তিনি বেশীদিন লেগে থাকতে পারতেন না। তাঁর সংসারে খুব অভাব-অনটন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এককথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই হাত দিয়েছেন মতিলাল; কিন্তু কোনও লেখাই তিনি শেষ করে যাননি।

ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস নামে দুই পুত্রকে নিয়ে কেদারনাথ ভাগলপুরে বসবাস করেছেন। সময়ে সময়ে ভুবনমোহিনী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাগলপুরে বাবার কাছে থেকেছেন।

শরৎচন্দ্রকে প্রথম ভর্তি করা হয়েছে দেবানন্দপুরে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায়। তারপর গ্রামে একটা নতুন বাঙলা স্কুল হয়েছে—সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের বাঙলা স্কুল। মতিলাল সেখানে ভর্তি করে দিয়েছেন শরৎচন্দ্রকে।

বিহারে একটা চাকরি পেলেন মতিলাল। ডিহিরিতে। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "সেখানে তিনি (মতিলাল) সপরিবারে চলে গেলেন। শরতের তখন মাত্র সাত-আট বছর বয়স...কিন্তু এ চাকরি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি এবং ১৮৮৬ সালে তাঁদের আবার ভাগলপুরে ফিরতে হল।" ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর দুর্গাচরণ এম-ই স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তারপর ভর্তি হয়েছে ভাগলপুর জিলা স্কুলে। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "বছরের শেষে ফার্ষ্ট হয়ে শরৎ ডবল প্রমোশন পেলেন! চেলাচামুণ্ডার দলে হরিধ্বনি পড়ে গেল; বন্ধুবান্ধবেরা তাকে সমঝে চলতে লাগলো এবং বড়রাও তার সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠলেন।"

রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ওরফে রাজুর সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলে রাখা ভালো। রাজু ছিল মানুষের মতো মানুষ। যেমন শক্তি তেমনি সাহস। বদমাশের সে যম। ভালো কাজে না এগিয়ে ছাড়ে না। মড়া পোড়াতে ছোটে। অসহায় রুগীর সেবা করে। সাঁতারে আর ব্যায়ামে ওস্তাদ। ছবি আঁকতে পারে, ছুতোরের কাজ জানে, চমৎকার গান গায়, অভিনয় করে। হারমোনিয়ম বাজাতে জানে, বাঁশি বাজাতে পারে। কিন্তু রাজুর কথা এখন আর থাক।...

আবার মতিলালকে সপরিবারে দেবানন্দপুরে ফিরে আসতে হল। ১৮৮৯ সালের কথা।

এবার শরৎচন্দ্রকে ভর্তি করা হল হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "তিনি (শরৎচন্দ্র) কিছুদিন দেবানন্দপুরে থাকার সময় হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হোয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ছিলেন...।"

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হয়ে শরৎচন্দ্র আগাগোড়া ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকেনি।

গ্রাম থেকে অনেক ছেলেই হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়তে যেত। পাঁচ-ছ'জন ছেলের একটি দলের নেতা শরৎচন্দ্র। গ্রাম থেকে স্কুলে যেতে তিন মাইল কাঁচা রাস্তা পার হতে হয়। রাস্তাটি গ্রীষ্মকালে ধুলোয় আর বর্ষাকালে কাদায় ভর্তি থাকে।

শরৎচন্দ্র বড় দুরন্ত!

নিজের হাতে ছিপ বানিয়ে মাছ ধরে। বঁইচিফল পেড়ে এনে মালা গাঁথে। ঘুড়ির সুতো মাজে। ঘুড়ি বানায়। বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। গড়ের জঙ্গলের মধ্যে নিজের হাতে মাটি কেটে বড় গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে; সেখানে বলতে গেলে একখানা ঘর তুলেছে; ঘরের মধ্যে মজুত আম-কাঁঠাল লিচু-আনারস কলাটলা—সব ফল গ্রামের বাগান থেকে গোপনে যোগাড় করেছে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গোপনেই সেসব ফল ভোগে লাগায়। অন্যের নৌকো—কখনও একা, কখনও বন্ধুদের সঙ্গে—খুলে নিয়ে নদীতে বেড়াতে যায় দু-তিন মাইল দূরে—কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া অথবা সপ্তগ্রামের পুল পর্যন্ত। কৃষ্ণপুরের ওই আখড়া শরৎচন্দ্রের পছন্দমতো জায়গা। পায়ে হেঁটেও—একা অথবা বন্ধুদের সঙ্গে—সেখানে যায়।

দুরন্তপনার জন্য শরৎচন্দ্রকে গ্রামের কেউ কেউ অপছন্দ করেন।

কিন্তু কেবল দুরন্তপনাতেই শেষ নয়। শরৎচন্দ্রের স্বভাবে অন্য জিনিসও আছে। দরকার হলে কোনও রুগীর জন্য শরৎচন্দ্র গভীর রাত্রেও একা লাঠি আর লণ্ঠন হাতে নিয়ে তিন মাইল নির্জন রাস্তা হেঁটে শহর থেকে ওষুধ নিয়ে আসে, ডাক্তার ডেকে আনে। রাত জেগে রুগীর সেবা করে।

এই স্বভাবের জন্য গ্রামের অনেকের স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছে শরৎচন্দ্র।

গানবাজনার দিকে শরৎচন্দ্রের খুব টান। বাড়ি থেকে পালিয়ে একবার একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়েছে। অবশ্য সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

গ্রামের জমিদার নবগোপাল দত্ত মুন্সীর ছেলের নাম অতুলচন্দ্র। ১৮৯০ সালে অতুলচন্দ্র হুগলী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছেন। বয়সে ইনি শরৎচন্দ্রের চেয়ে চার বছরের বড়। ছেলেবেলা থেকেই শরৎচন্দ্রের মুখে মুখে গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখেছেন: "শরৎচন্দ্রের এই বয়সে গল্প বলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এবং এজন্যই অতুলচন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বি.এ. পাস করার পর যখন কলিকাতায় এম.এ. ও আইন পড়েন, তখন মধ্যে মধ্যে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিতেন ও শরৎচন্দ্রের যাত্রা ও থিয়েটার দেখার আগ্রহ ছিল বলিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় থিয়েটার দেখাইয়া দেশে পাঠাইতেন। যাওয়ার সময় বিশেষভাবে বলিয়া দিতেন যে, তিনি অভিনয়ের বিষয়টি যেন গল্পে লিখিয়া রাখেন। ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে পুরস্কার দিতেন। এইভাবেই ছেলেবেলা হইতেই শরৎচন্দ্রের গল্প লেখার উৎসাহ বাড়িতে থাকে।"

হ্যাঁ, দেবানন্দপুরেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যরচনার হাতেখড়ি হয়েছে।

মতিলালের দুরবস্থা এমন দারুণ যে কিছুকাল শরৎচন্দ্রের স্কুলের মাইনে পর্যন্ত তিনি দিতে পারেননি। কিছুদিনের জন্য শরৎচন্দ্রকে স্কুলে পড়াও বন্ধ করতে হয়েছে।

আবার সপরিবারে ভাগলপুরে এলেন মতিলাল। মামাবাড়ি থেকে শরৎচন্দ্র ভর্তি হল তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে।

শরৎচন্দ্র একটি বেজি পুষেছে। দরজার বাইরে একটি খোঁটাতে বেজিটি বাঁধা থাকে। একটি খুরিতে জল। নিজের ভাগের মাছের টুকরোর অর্ধেক আর দুধভাত শরৎচন্দ্র বেজিটিতে খেতে দেয়।

ঘরে দারুণ ইঁদুরের উৎপাত। শুতে যাওয়ার আগে শরৎচন্দ্র তাই চেন খুলে বেজিটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

প্রায় সারারাত জেগে শরৎচন্দ্র সবে শুয়েছে। সকালে মাঝের ফটক খোলা হয়নি তখনও। বাইরে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্রের বন্ধু নীলা ডাকল—শরৎ, ও শরৎ!

—কি রে? নীলা!

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আছে। চোখ না খুলেই শরৎচন্দ্র উত্তর দিল—কি রে নীলা? একটু বেড়িয়ে আয়। এইমাত্তর শুয়েছি ভাই!

—তোর অসুখ করেছে?

—হ্যাঁ।

—রক্তবমি করেছিস?

—দুৎ, জ্বালাস নে।

—ও রক্ত কিসের?

—কোথায় রে?

—তোর গায়ের কাপড়ে।

ধড়মড় করে শরৎচন্দ্র উঠে বসল।

—এ কি রে! এ বেজি ব্যাটার কাজ, ইঁদুর খুন করেছে নিশ্চয়।

গায়ের কাপড়খানা রক্তাক্ত। গায়ের কাপড় ফেলে শরৎচন্দ্র বেজিটাকে বেঁধে নীলাকে দরজা খুলে দিতে গেল।

নীলা গালে হাত দিয়ে নির্বাক। বলল—যাক, খুব বেঁচে গেছিস। তোর বেজি ব্যাটা একটা গোখরো মেরেছে।

দুজনের চক্ষুস্থির।

একটা কাঠি দিয়ে নাড়তেই সাপের লেজটা নড়ে উঠল।

নীলা জিজ্ঞেস করল—কখন শুয়েছিলি?

শরৎচন্দ্র বলল—তা তিনটে হবে বোধহয়।

—তুই মরবি, বলছি।

—দুৎ।

—এ-ঘর ছাড়।

—কোথায় সাপ নেই, শুনি?

—তোর এই ঘরটা ব্যাটাদের আড়ত।

—তুই তবে আর আসিস নে।

—তোর তামাক সাজবে কে রে?

এ-প্রশ্ন নীলার মুখে সাজে। শরৎচন্দ্রের ছেঁড়া দড়ির খাটের নীচে তামাকের বন্দোবস্ত। গায়ের কাপড়ের তলায় নীলাই টিকে-তামাক লুকিয়ে নিয়ে আসে। সযত্নে তামাক সাজে, নিজে বারকয়েক টেনে তামাক ধরিয়ে শরৎচন্দ্রের হাতে নলটা তুলে দিয়ে বলে—খা!

তামাকের কথার পর নীলা বলল—ফেল করে মরবি দেখছি।

শরৎচন্দ্র বলল—সব করব। কিন্তু ওটি কিছুতেই করা হবে না।

দুজনে আরাম করে তামাক খেল। তারপর নীলা চলে গেল। আর শরৎচন্দ্র অঙ্কের বই টেনে নিয়ে পড়ায় মন দিল।

হই-হই পড়ে গেল বাড়িতে। মুশাই চাকর সাপটাকে বের করে নিয়ে এল। উঠোনে কাঠপালা জড়ো করে পোড়ানোর ব্যবস্থা হল। ছেলেমেয়েদের ভীড় জমে গেল উঠোনে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শরৎচন্দ্র বলল—ই কেয়া করতে হো মুশাই, সাঁপকো জরায় কর খাওগে?

মুশাই মাথা নেড়ে বলল—নেই।

—তব্?

—গোহমনা সাঁপ ব্রাহ্মণ হ্যায়, জরুর জ্বলানা চাইয়ে।

—উস্‌কে মু ঝরকায়কে, গঙ্গাজি মে বিগ দেও। মছ্‌লি সব খা লেগা।

মুশাই রাজী হল না। বলল—নেহি। তোঁ যাকে পড়। ই কাম হামরা হ্যাঁয়। তোঁ কি জানেইছিস?

কিন্তু সেখানেই শেষ হল না। মুশাইকে দিয়ে ভুবনমোহিনী মনসার পুজো পাঠিয়ে দিলেন। প্রসাদের অপেক্ষায় উপোস করে রইলেন ভুবনমোহিনী।

প্রসাদ নিয়ে ফিরে আসতে সময় খুব কম লাগল না।

শরৎচন্দ্রের টেবিলে খুরি-ঢাকা প্রসাদ রইল নীলার জন্য। শরৎচন্দ্র জানে তামাকের টানে নীলা বিকেলে আসবে।

এসেই নীলা জিজ্ঞেস করল—ওটা কি রে?

—ওটা ভাই তোর জন্যে পেসাদ মনসার। মা রেখে গেছেন।

প্রসাদ কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে নীলা বলল—খুব বেঁচে গেছিস কিন্তু।

—হয়েছে! তামাক সাজ। তোর আর বক্তৃতা করতে হবে না।

মতিলালের কথায় ভুবনমোহিনী বাস্তুকে ভোগ দিলেন। পাথরবাটিতে দুধকলা সাজিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে বললেন—তোমার কৃপাতে আমার শোরো রক্ষে পেয়েছে, মা বাস্তু!

খেতে বসে শরৎচন্দ্র বলল—আচ্ছা মা, দেশের কেউ বাদ গেল না, সবাই

পেল মনসার পেসাদ, আর যে সত্যিকার কাজ করলে তার কপালে অষ্টরম্ভা?

মা বললেন—কেন, নীলাকে দিসনি?

—নীলা নাকি সাপ মেরেছে?

—ষাট! ষাট! মরে যাই, কি ভুল আমার!

বলে ছুটে গিয়ে মা একটি ছোট পাথরবাটিতে দুধকলা মেখে এনে বললেন—তুই দিবি না আমি দিয়ে আসব?

—তোমাকে কামড়াবে। আচ্ছা, মা, যে যেমন জীব সে তাই খায়, ও কলা খাবে কেন? মাছ দাও।

—দুধে-মাছে এক করতে নেই যে।

—কি হয় মা?

—গরুর অকল্যাণ। এই নে এই পাতে—আলাদা করে দিস—দুধে-মাছে এক করিস নে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

বলে শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেল।

ভুবনমোহিনী একদিন বিপ্রদাসকে বললেন—বিপিন, শোরো পাশ হয়েছে।

বিপ্রদাস বললেন—হুঁ। কিন্তু এ-পাশ তো কিছুই না মেজদি। ভালো করে পড়ায় মন দিতে বলো ওকে।

—বলছিল, ফী দিতে হবে। নাকি অনেক টাকা লাগবে।

—কত?

—ওকে জিজ্ঞেস কর। আমি ডেকে দিচ্ছি।

—থাক। আমি জেনে নেব।

পরদিন গুলজারিলালের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট লিখে চড়া সুদে টাকা ধার করে নিয়ে এলেন বিপ্রদাস।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা হয়ে গেল।

রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ওরফে রাজু তখন পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে কাঠের কারখানায় ছুতোর মিস্তির কাজে মন দিয়েছে। সেই কারখানায় এই সময়ে ঘন ঘন দেখা গেছে শরৎচন্দ্রকে। এই সময়ে রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে। গোড়ার দিকে রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গালাগালি হাতাহাতি মারামারি হয়েছে। একজনের সঙ্গে আরেকজনের শত্রুতা, প্রতিযোগিতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছে দুজনে। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "রাজেন্দ্রের অমিত সাহস, তেজ—অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সব কাজে সফলতামুখী প্রতিভার কাছে ছিল শিষ্য শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রণাম।"

দুরন্ত রাজু জলে জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে দাপাদাপি করে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি।

১৮৯৪ সালে শরৎচন্দ্র সেকেন্ড ডিভিশনে এন্ট্রান্স পাশ করল। এখানে বলা দরকার, ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র একটি সাহিত্যসভা গড়ে তুলেছে। গোড়ার দিকে বিভূতিভূষণ ভট্টের সঙ্গে এই সাহিত্যসভার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। পরে দেখা গেছে বিভূতিভূষণ এই সভার একজন সভ্য। বিভূতিভূষণের বিধবা বোন নিরুপমা দেবীও এই সভার একজন সভ্যা—অবশ্য আড়ালে থেকে। শরৎচন্দ্র সভাপতি। গুরুজনদের চোখ এড়িয়ে নির্জন মাঠে সপ্তাহে একদিন সভা বসে।

তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে ভর্তি হয়েছে শরৎচন্দ্র। কিন্তু এফ-এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি টাকার অভাবে। শরৎচন্দ্র, ১৯১৯ সালের ২৪ অগস্ট, লিখেছেন : "বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও তাহ'লে দু'বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপবাস ক'রেই দিন কাটবে।"

কলেজের পড়াশুনায় ইস্তফা দেওয়ার আগেই—১৮৯৫ সালের নভেম্বরে—শরৎচন্দ্রের মা মারা গেছেন। তারপর মতিলাল শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে ভাগলপুরে আলাদা বাসা করেছেন খঞ্জরপুর মহল্লায়। দেনার দায়ে মতিলাল দেবানন্দপুরের বসতবাড়িখানা পর্যন্ত সওয়া দু'শ টাকায় বিক্রী করে দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় যখন শরৎচন্দ্রের পিতা তাঁহার তিন পুত্র এবং এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন তখন আমরা ছিলাম তাঁহাদের প্রতিবেশী। আমার অগ্রজ ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা। শরৎচন্দ্র তখন সম্পূর্ণভাবে বেকার এবং সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু। সতীশচন্দ্র সঙ্গীত, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি "আদমপুর ক্লাব" নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটি ড্রামাটিক সেকশন ছিল এবং সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে বাংলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। 'মৃণালিনী' 'বিল্বমঙ্গল' 'জনা' নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি, ও জনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়-সুখ্যাতি বর্দ্ধিত করেন।"

কিছুদিন শরৎচন্দ্র রাজ-বনেলী এস্টেটে চাকরি করেছেন। শরৎচন্দ্র একদিন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বলেছেন : "আমি কিছুদিন বনেলী-ষ্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চল্‌চে। ষ্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্ম্মচারী সেই কাজে ষ্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহ-কারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলেম। ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো।"

ওই চাকরি শরৎচন্দ্রের বেশী দিন ভালো লাগল না। চাকরি ছেড়ে আবার তিনি লেখাপড়ায় মন দিলেন।

বিভূতিভূষণ ভট্ট—ডাকনাম 'পুঁটু'—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছেলে-বেলার বন্ধু।

১৮৯৯ সালে পুজোর ছুটির পর সৌরীন্দ্রমোহন কলকাতার কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে ভর্তি হয়েছেন। পুঁটু তখন ওই কলেজের ছাত্র। পুঁটুদের বাড়িতেই সৌরীন্দ্রমোহন প্রথম দেখেছেন শরৎচন্দ্রকে। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকের কথা।

সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন :

"পুঁটুর বসবার ঘরে টেবলের সামনে চেয়ারে বসে দেখি. এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক। যেন বহুকাল রোগভোগ করছেন—এমন চেহারা! মাথার দীর্ঘ পাৎলা কেশ অবিন্যস্ত—মুখে অবিন্যস্ত কতকগুলো পাৎলা দাড়ি। ভদ্রলোকের সামনে টেবিলের উপর মোটা বই খোলা—তিনি নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন, মাঝে মাঝে মাথার কেশরাশির মধ্যে দু'হাতের অঙ্গুলি চালনা ক'রে কি যেন ভাবছেন।...

পুঁটুদের বাড়ী আমাদের যাতায়াত ছিল হামেশা। যখনি যেতুম, শরৎচন্দ্রকে দেখতুম সেই চেয়ারখানিতে বসে আছেন—কখনো বই পড়চেন. কখনো লিখচেন।...

সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় যে-সময়েই পুঁটুদের বাড়ী গিয়েছি. দেখেছি. শরৎচন্দ্র বসে আছেন সেই চেয়ারখানিতে। ঐ চেয়ারখানি ছিল তাঁর রিজার্ভ-করা। বই পড়তেন—মোটা মোটা ইংরেজী বই। একবার সে-বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়েছিলুম—ইংরেজী ফিলজফির বই. বায়লজির বই—এই সব বই পড়তেন; বটানি পর্য্যন্ত বাদ ছিল না।

গল্প লিখতেন অনর্গল।"

ভাগলপুর থেকে ফেরবার সময়ে সৌরীন্দ্রমোহন শরৎচন্দ্রের অনুমতিতে তাঁর দুখানা গল্পের খাতা পুঁটুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। ভবানীপুরের বন্ধুদের শরৎচন্দ্রের গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবেন। তাক লাগিয়েছেন।

আরেকটা কাজ করেছেন সৌরীন্দ্রমোহন। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র একটা কপি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

ভাগলপুরে সাহিত্যসভার মুখপত্র হিসেবে 'ছায়া' নামে একখানা হাতে-লেখা

মাসিকপত্র বেরিয়েছে। ১৯০১ সালের কথা। 'ছায়া'য়, বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের রচনা দেখা গেছে।

তারপর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। ১৯০১ সালের শেষার্ধের কথা। সন্ন্যাসীবেশে কিছুদিন এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত এলেন মজঃফরপুরে। আশ্রয় নিলেন ধর্মশালায়। সেখানে অনেকেই তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তারপর প্রায় দু-মাস অতিথি হয়ে থেকেছেন শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। অনুরূপা দেবী লিখেছেন : "শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল।...অসহায় রোগীর পরিচর্য্যা, মৃতের সৎকার এমনই সব কঠিন কার্য্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন।" মহাদেব সাহু মজঃফরপুরের একজন জমিদার। গাইয়ে-বাজিয়ে হিসেবে শরৎচন্দ্র তাঁর সুনজরে পড়েছেন। আমন্ত্রিত হয়ে কিছুদিন কাটিয়েছেন মহাদেব সাহুর সঙ্গে।

মতিলাল, বলা বাহুল্য, তখন ভাগলপুরে। কতদিন দেখা গেছে মতিলাল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ছেঁড়া চটির ধুলোয় কোমর পর্যন্ত ধূসর, মাথার চুলে জটা বাঁধতে আরম্ভ করেছে, পেটে ভাত নেই, হাতে পয়সা নেই' হাত-পা নেড়ে বিড়বিড় করতে করতে কয়লাঘাটের পথে অশ্বত্থতলায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মতিলালের ছোট খুড়শ্বশুরের নাম অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রচণ্ড শীতে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে মতিলাল একদিন দেখা করতে এলেন অঘোরনাথের সঙ্গে।

অঘোরনাথ বললেন—তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন হে মতিলাল?

মতিলাল বললেন—ভালো লাগল না, ছোটকাকা।

—এত শীতে গায়ে কাপড় দাওনি কেন?

—নেই যে!

—শরৎ কোথায়?

—ঝগড়া করে কোথায় নিরুদ্দেশ!

—আজকাল কিছু কাজকর্ম আছে?

—না।

—কি করে চলে?

প্রশ্নের উত্তর দিলেন না মতিলাল। চোখ দুটি ড্যাবড্যাব করে উঠল। পাছে চোখের জল ধরা পড়ে যায়, মতিলাল তাই চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

গায়ের কাপড় মতিলালের গায়ে পরিয়ে দিলেন অঘোরনাথ। মতিলালের হাতে একখানা নোট গুঁজে দিলেন।

একটু হেসে মতিলাল জিজ্ঞেস করলেন—ক'দিন আছেন, ছোটকাকা?

—কালই যাব।

অঘোরনাথের পায়ের ধুলো নিলেন মতিলাল। বললেন—আর হয়তো দেখা হবে না ছোটকাকা—বয়স হচ্ছে তো আমাদের।

আর দেখা হয়নি দুজনে।

দিনকয়েক বাদে মতিলাল মারা গেলেন। ১৯০২ সালের কথা।

বাবা মারা গেছেন! হঠাৎ খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র মজঃফরপুর থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলেন ভাগলপুরে। শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর চলে গেলেন কলকাতায়। উঠলেন ভবানীপুরে হাইকোর্টের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায়। লালমোহন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা। লালমোহনের ভাই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এমন অনেক কিছু খরচপত্র থাকে যা প্রতি ক্ষেপে অভিভাবকের নিকট চেয়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। এই অসুবিধা থেকে মুক্তিলাভের জন্য শরৎচন্দ্র হিন্দী অনুবাদকার্য্য আরম্ভ করে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করতে আরম্ভ করেন। হাইকোর্টের পেপারবুক তৈয়ারী করার ব্যাপারে দাদার অধীনে অনেককেই অনেক কাজ করতে হত। যিনি যে কাজ করতেন তিনি সে কাজের পারিশ্রমিক পেতেন, শরৎচন্দ্রও পেতেন। কিন্তু আইন-আদালতের ভাষার সহিত পরিচয়ের স্বল্পতা হেতু এই কার্য্য বেশী দিন চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।"

ভবানীপুরের এই বাসায় খুব আরামে থাকেননি শরৎচন্দ্র। বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরে থেকেছেন। খাবার ভাত দুবেলা সেখানে এসেছে। খাওয়ার পর তাঁকে বাসন মেজে দিতে হয়েছে। তাঁকে জল খেতে দেওয়া হয়েছে একটি টিনের সিগারেটের কৌটায়।

ছ-সাত মাস কাটল।

শরৎচন্দ্র একদিন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেসে গেলেন। সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। তাঁকে জানালেন যে 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র জন্য 'মন্দির' নামে একটি গল্প দিয়েছেন; কিন্তু লেখক হিসেবে নিজের নামের বদলে সুরেন্দ্রনাথের নাম বসিয়েছেন। প্রাইজ যদি পাওয়া যায়? তাহলে যেন প্রাইজের টাকায় মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' শরৎচন্দ্রকে দেওয়া হয়।

পরদিন শরৎচন্দ্র বাড়ির কর্তাদের কিছু না জানিয়ে জাহাজে উঠে রেঙ্গুন চললেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের কথা।

এখানে বলে রাখা ভালো, কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় 'মন্দির' গল্পটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকে গল্পটি ছাপার অক্ষরে আছে। বলা বাহুল্য, সেখানে লেখকের নাম—সুরেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মেসোমশাই। তিনি রেঙ্গুনে বিখ্যাত অ্যাডভোকেট। লুইস স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি।

একদিন সকালবেলা। আটটা কি নটা বেজেছে। শরৎচন্দ্র ঢুকলেন অঘোরনাথের বাড়িতে। শরৎচন্দ্রের উস্কো চুল, ময়লা কাপড়, গায়ে একটা ছেঁড়া সার্ট, কাঁধে গামছা, পায়ে ঠনঠনের চটিজুতো।

অঘোরনাথ বাইরের ঘরেই বসেছিলেন। তাঁকে দেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন শরৎচন্দ্র। প্রণাম করলেন।

অঘোরনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন—কি রে শরৎ, তুই কোথা হতে এলি?

চোখের জল মুছতে মুছতে শরৎচন্দ্র বললেন—আমাকে করনটিনে আটকে রেখেছিল।

অঘোরনাথ আরও অবাক হয়ে বললেন—তুই আমার নাম করতে পারলি না? আমার নাম করে কত লোক পার পেয়ে যায়, আর তুই পড়ে রয়েছিস করনটিনে?

শরৎচন্দ্র বললেন—সাতদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়েছে।

অঘোরনাথ বললেন—তোর বোকামি। আমার নাম করলেই কোনও কষ্ট পেতে হত না। এমন কি আমার নাম করে রাস্তায় কাউকে বললে তোকে এনে ঘরে পেঁাছিয়েও দিয়ে যেত।

রেঙ্গুনে অঘোরনাথের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন শরৎচন্দ্র। গৃহশিক্ষক রেখে তাঁকে বর্মী ভাষা শেখাতে লাগলেন অঘোরনাথ। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা শরৎচন্দ্রকে উকিল করবেন। কিন্তু সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

অঘোরনাথ বর্মা রেলওয়ের এজেণ্ট জন সাহেবের আপিসে একটা চাকরি যোগাড় করে দিলেন শরৎচন্দ্রকে।

অঘোরনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের আত্মীয় অঘোরবাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরিবারবর্গ নিকটে না থাকায় তাঁহার মৃত্যুশয্যায় সেবা-শুশ্রূষার ভার শরৎচন্দ্র ও আমি লইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং রাত্রিজাগরণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সাহায্য করিতাম। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যূষে আপন মনে কত কি আবৃত্তি করিতেন এবং ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন। ঐ আবৃত্তি ও গানের অধিকাংশই ছিল কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে। কয়েকদিন শরৎচন্দ্রের সাহচর্য্যে থাকিয়া বুঝিয়া-

ছিলাম যে, শরৎচন্দ্র একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। কখন কখন তিনি সহজ লোকের মত আচার-ব্যবহার করিলেও অধিকাংশ সময় পাগলের মত আপনার খেয়ালে আপনি মত্ত থাকিতেন। কোন প্রকার নিয়ম বা বাঁধাবাঁধির ধার ধারিতেন না। তাঁহার আচরণে বা কথাবার্ত্তায় কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি একজন মহাভাবুক লোক, সর্ব্বদা আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। মাসাধিক কাল একত্র বাস ও একত্র রাত্রিজাগরণের ফলে আমি শরৎচন্দ্রের মধুর স্বভাব ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাই। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে ও আমি তাঁহাকে 'শরৎদা' বলিয়া ডাকিতে থাকি।"

১৯০৫ সালের ৩০ জানুআরি অঘোরনাথ মারা গেলেন। অল্পদিন পরে অঘোরনাথের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন শরৎচন্দ্র।

মেসোমশায়ের মৃত্যুর তিন-চার মাস বাদে শরৎচন্দ্র সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে এজেণ্ট আপিসের চাকরি ছেড়ে দিলেন। রেঙ্গুন ছেড়ে চলে গেলেন। পেগুতে পি-ডব্লু-ডি আপিসে একটা চাকরি জুটল। ১৯০৫ সালের কথা। দু-তিন মাসের বেশী পেগুতে চাকরি করেননি। আবার ফিরে এসেছেন রেঙ্গুনে। যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "শরৎবাবু এখানে (রেঙ্গুনে) তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের বাসায় থাকিতেন। সেই আত্মীয়টির দেহান্তর ঘটিলে, কিছু-দিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেসে থাকিতে বাধ্য হন।...শরৎবাবু কোথায় যেন পেগু না টঙ্গুতে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন. হঠাৎ একদিন আমাদের মাঝখানে, লম্বা লম্বা চুল ও দাড়ি লইয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রেঙ্গুনে রেলওয়েতে চাকরি পেলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু দু'তিনমাস বাদে এই চাকরিও ছাড়তে হল।

তারপর শরৎচন্দ্র কিছুদিন রেঙ্গুনে আশ্রয় নিয়েছেন মণীন্দ্রকুমার মিত্রের বাড়িতে। আবার চাকরি পেয়েছেন। এবার চাকরি জুটেছে ডেপুটি অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের আপিসে।

বহুদিন মিস্ত্রীপাড়ায় বাস করেছেন শরৎচন্দ্র। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "সহর হইতে দুই মাইল দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন সে স্থান-গুলির নাম 'বোটাটং' ও 'পোজোন ডং'। রেঙ্গুন সহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডক্ ইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে তাহাতে ফিটার, বাইশ্‌ম্যান ও ঢালাই মিস্ত্রীর সমস্ত কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের ছিল একচেটিয়া। অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তানও এই কাজ শিখিয়া এখানে দৈনিক ৩/৪ টাকা রোজগার করে। ঐ সকল মিস্ত্রী একত্র দলবদ্ধ হইয়া এ অঞ্চলে সপরিবারে বাস করিত।...শরৎচন্দ্র স্বল্প ভাড়ায় ঐরূপ একটি ছোট বাড়ীতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমি ঐ পল্লীর নাম 'মিস্ত্রী পল্লী'র পরি-

বর্ত্তে 'শরৎ-পল্লী' রাখিয়াছিলাম। ঐ পল্লীতে শরৎচন্দ্রের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরীর দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিতেন, সেবা শুশ্রূষা করিতেন, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন এবং বিপদে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত ও 'বামুন দাদা' বলিয়া ডাকিত। এই বামুনদাদার প্রতি তাহাদের প্রভূত বিশ্বাস ছিল, অনেকের টাকাকড়ির আদান-প্রদান এই বামুনদাদার মারফতেই হইত। ইহাদের একটা কীর্ত্তনের দল ছিল, বামুনদাদার পরিচালনায় ছুটীর দিন ইহারা খোল, করতাল সংযোগে নাম সংকীর্ত্তন করিত।"

রেঙ্গুনে বহুদিন গিরীন্দ্রনাথ সরকার লাঠকুঠি ও পাগলা গারদের কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। শরৎচন্দ্র অনেকবার গিরীন্দ্রনাথের কাছে লাঠকুঠি ও পাগলা গারদ দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন। গিরীন্দ্রনাথ বলেছেন--শরৎদা, যখন লাটসাহেব সহরে থাকবেন না তখন একদিন তোমায় লাটসাহেবের বাড়িতে নিয়ে যাব, কিন্তু পাগলা গারদে তোমায় নিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।

গিরীন্দ্রনাথ একদিন শরৎচন্দ্রকে লাটকুঠিতে নিয়ে গেলেন। "শরৎচন্দ্র ফটক পার হইয়াই মনের উল্লাসে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রাংগণে কতক্ষণ ছুটা-ছুটি করিলেন, কাচ নিৰ্ম্মিত গৃহমধ্যে সযত্নে রক্ষিত পুষ্পলতা গুল্মাদি পরীক্ষা করিলেন, চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান, জলাশয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরৎচন্দ্র বলিলেন এরূপ উৎকৃষ্ট রাজভবন, বহুমূল্য আসবাব-পত্র ও সাজসরঞ্জাম তিনি ইতিপূৰ্ব্বে কখন দেখেন নাই।"

বলরুমে ঢুকে মনের আনন্দে বিলাতী ঢঙে একটু নেচে নিলেন শরৎচন্দ্র। তারপর উপরে শয়নকক্ষে ঢুকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে গিরীন্দ্রনাথকে বললেন—এখন তুমিই তো এখানকার লাট হে! দ্যাখো ভাই, কিছুদিন আগে এক জ্যোতিষী গণনা করে আমায় বলেছে যে, ভবিষ্য-জীবনে ধন, মান, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজদ্বারে আমার খুব সম্মান হবে। আজ তো দেখছি তোমার আশীর্বাদে লাটের বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত হয়ে গেল।

গিরীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার জ্যোতিষী আর কী কী বলেছে, শরৎদা?

শরৎচন্দ্র বললেন—আর বলেছে আমার দুটি বিয়ে হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি প্রজাপতিও আমার গায়ে উড়ে বসল না।

লাটকুঠি থেকে কিছু দূরে ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনের উপরেই পাগলা গারদ।

লাটকুঠি থেকে পাগলা গারদে এলেন গিরীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র সঙ্গ ছাড়েননি।

ভিতরে একেক জন পাগলের একেক রকম কাণ্ড। কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বন্ধ দুয়ারে বারবার বৃথা চেষ্টা করে ধেইধেই নাচছে, কেউ শূন্যে হতাশ চোখে আকাশপানে তাকিয়ে আছে, কেউ গলায় ফাঁসির দড়ি জড়িয়ে টানাটানি করছে, কেউ মাটিতে শুয়ে ঠিক যেন লম্বা পাড়ি দিয়ে সাঁতার কাটছে। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র পাগলদের দেখিয়া নিজেও পাগলের মত অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন। একটি পাগল তাঁহাকে মুখভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ করিলে শরৎচন্দ্রও তাহাকে তদ্রূপ মুখভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ করিলেন। অন্য একজন তাঁহাকে দেখিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে থাকিলে শরৎচন্দ্রও ঠিক যন্ত্রচালিত গ্রামোফোন রেকর্ডের ন্যায় হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া তাহার সহিত বহুক্ষণ হাসিলেন। একটি হৃষ্টপুষ্ট বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতেছে দেখিয়া শরৎচন্দ্রের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ভীষণ চিত্ত বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। অন্তরের দুঃখ ও উদ্বেগ কিছুতেই সামলাইতে না পারিয়া 'ভগবান কি নিষ্ঠুর! কি নির্দয়!' বলিয়া পাগলের মত হাউ হাউ করিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।"

শরৎচন্দ্রের দশা দেখে ওয়ার্ডার দারোয়ান প্রভৃতি ছুটে এসে গিরীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করল—বাবুটি কি পাগল?

বহু চেষ্টায় শরৎচন্দ্রকে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন গিরীন্দ্রনাথ।

ফিরতি পথে ট্রেনে শরৎচন্দ্র বেশী কথাবার্তা বলেননি, দু-একটা যা বলেছেন তা ঠিক পাগলের মতো। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "এই দিনের ঘটনা আমার স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের পরিচয় তাঁহাকে দেখিলে বুঝিবার উপায় ছিল না। এই ঘটনার পর হইতে রেঙ্গুনে আমি তাঁহাকে 'পাগল' আখ্যা দিয়াছিলাম।"

এখানে, মনে পড়ে যায়, কবি নবীনচন্দ্র সেন রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন; তিনি শরৎচন্দ্রকে 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধি দিয়েছেন।

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন :

"তিনি (শরৎচন্দ্র) তখন রেঙ্গুনের যে বাড়ীতে বাস করতেন সে বাড়ীর নীচের তলায় একজন মেকানিক বা লোহালক্করের মিস্ত্রী ছিল। জাতিতে সে চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, বিপত্নীক। সংসারে তার একটিমাত্র বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। চক্রবর্তীর চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে ফিরে এসে বাড়ীতে সে এক আড্ডা বসাতো। সেখানে জুটতো যত নেশাখোর মাতাল গেঁজেল কারিগর ও বদমাইসের দল। এরাই ছিল তার বন্ধু ও সঙ্গী। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলতো তাদের পৈশাচিক হুল্লোড়! মেয়েটিকে

এদের নানারকম ফাই-ফরমাস খাটতে হ'ত। চক্রবর্তীকে রেঁধে খাওয়ানো, বাসন মাজা প্রভৃতি সংসারের যা কিছু সবই সেই মেয়েটি করতো। এর মধ্যে আবার কোনো বিষয়ে একটু ত্রুটী হ'লেই চক্রবর্তী মেয়েটাকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিত।

শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার পর প্রায়ই বাসায় থাকতেন না, রাত্রে ফিরে এসে ঘরে শুতেন আবার সকালে উঠে বেরিয়ে যেতেন। একদিন রাত্রে শুতে এসে দেখেন ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। কে তাঁর ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছে—চোর আসেনি ত?—তিনি দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দেবার জন্য হাঁকতে লাগলেন। একটু পরেই দরজা খুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চক্রবর্তীর মেয়ে! থর্ থর্ করে সর্বশরীর কাঁপছে তার তখনও, দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে চক্রবর্তী তার বন্ধু ঘোষালবুড়োর সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দেবে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ঘোষালবুড়ো সেজন্য চক্রবর্তীকে কিছু টাকাও ধার দিয়েছে। কিন্তু ঘোষালবুড়ো পাকা বদমায়েস ও বেজায় মাতাল! সে আজ নেশার ঝোঁকে চক্রবর্তীর মেয়েকে নিজের পত্নী বলে দাবী করে তাকে বাড়ীর মধ্যে তাড়া করে এসেছিল, সে ভয়ে পালিয়ে এসে দাদাঠাকুরের ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু এমন করে আর ক'দিন চলবে! মেয়েটি শরৎচন্দ্রের পায়ের উপর কেঁদে লুটিয়ে পড়লো—আপনি আমাকে রক্ষা করুন—আপনি আমাকে বাঁচান!

শরৎচন্দ্র মেয়েটিকে তাঁর ঘরে খিল দিয়ে সে রাত্রের মত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে বলে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'ভয় নেই; কাল সকালে এর বিহিত করবো।'

চক্রবর্তীকে মেয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বিপদে পড়লেন। চক্রবর্তী বলে—মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়েছে—বিয়ে দেবো না? এই বিদেশে, আমি গরীব মানুষ, ওর চেয়ে আর ভাল পাত্র কোথা পাবো। ঘোষালের টাকা আছে—ভাত-কাপড়ের দুঃখ পাবে না, একটু নেশা ভাঙ্ করে—তা হোক। সে তো আমিও করি। আর বয়সের কথা যদি বলো বাবু—বেটাছেলের আবার বয়স কি?

শরৎচন্দ্র অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চক্রবর্তী শোনে না। ঘোষালের দেনা তিনি মিটিয়ে দেবেন বললেন—তবুও বলে—না, মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে তো?—শেষে চক্রবর্তী ধরে বসলো—এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত-কুল রক্ষা করো না!

অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই সেই মেয়েটিকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাকে নিয়ে সুখীই হয়েছিলেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্য তখন তাঁর পাছে পাছে ফিরছিল। রেঙ্গুনে আবার দারুণ প্লেগের মহামারি দেখা দিলে—শরৎচন্দ্রের স্ত্রী পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ

ঘণ্টার মধ্যে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় কেঁদেছিলেন।"

শরৎচন্দ্রের এই স্ত্রীর নাম শান্তি দেবী। শান্তি দেবীর শেষ অসুখের সময়ে গিরীন্দ্রনাথ সরকার এসেছেন শরৎচন্দ্রের আস্তানায়। তার আগে তিনি সেখানে আসেননি। গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, একটি বড় ঘরকে বেড়া দিয়া ভাগ করা হইয়াছে, ঘরের মধ্যেই রান্নাঘর, স্নানের জায়গা ও পাইখানা—চমৎকার ব্যবস্থা। ঘরে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের বাতি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, পার্শ্বে একটি ছোট টেবলের উপর মোটা মোটা কয়েকখানি বই, একখানি ক্যাম্বিসের ইজি-চেয়ার, একটি গড়গড়া, একটি রেঙ্গুন প্যাটার্ন কাঠের সিন্দুক, কাঠের আলনায় কয়েকখানি কাপড়। সামান্য জিনিষ-পত্রে ঘরটি সাজান, কোন বিলাসিতার চিহ্ন নাই। দেয়ালে কয়েকখানি সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারের মধ্যে একখানি রবিঠাকুরের বাঁধান ছবি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।"

শান্তি দেবীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র বাসাবদল করেছেন; শহরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একত্রে বাসা নিয়েছেন।

কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যি কি কখনও শরৎচন্দ্রের একটি সন্তানের জন্ম হয়েছিল?

গিরিজাকুমার বসুর স্ত্রী তমাললতা বসু লিখেছেন:

"আমি প্রথম দেখবার সৌভাগ্য লাভ করি শরৎদাদাকে শিবপুরে। সেখানে আমরা কাছাকাছি থাকার দরুণ তিনি প্রায়ই যেতেন আমাদের বাড়ীতে তাঁর প্রিয় গড়গড়াটি হাতে করে।

তখন থেকেই তিনি আমাদের ভারি স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। আমাদের স্নেহের পুত্র অমিয় যখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবেতে ফার্ষ্ট হয়ে সব কটা প্রাইজ ও সোনারুপোর মেডেল পেলে, ভাল ছেলে বলে ও কামাই না করার দরুণও প্রাইজ পেলে, তখন তাঁর সে কী আনন্দ। প্রাইজ শুদ্ধ তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখালেন।

আবার ১৯ বছর বয়সে যখন বি.এ. পড়তে পড়তে সেই অমিয় দারুণ টাই-ফয়েড রোগে ৪৮ চল্লিশ দিন ভুগে মারা গেল, তখন তাঁর কী দুঃখ, কী সমবেদনা—সান্ত্বনা দান! বললেন "তোমরা তো ওকে ১৯ বছরের জন্যে পেয়ে-ছিলে ও ভোগ করেছি'ল, এই যে আমার মোটেই ছেলেপুলে হয় নি।" তাঁর সে স্নেহ মমতা ভালবাসা জীবনে ভুলবো না।" (তমাললতা বসু : শরৎদাদা, 'দীপালি', ৩ ফেব্রুআরি ১৯৩৮, পৃ. ৩১)

তখন 'দীপালি'র প্রধান সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়; সম্পাদক, সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মনে রাখা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্রের

বাবার নাম বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'দীপালি'তে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তমাললতা বসুর ওই রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল বাদে 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' নামে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন : "তিনি (শরৎচন্দ্র) একটি মেয়েকে কুপাত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে বিবাহ ক'রে নিজের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে লাভ করেছিলেন একটি পুত্র-সন্তান। কিন্তু দুর্দান্ত প্লেগ এসে তাঁদের সেই সুখের সংসার ভেঙে দেয় এবং শরৎচন্দ্র হন আবার একাকী!" (হেমেন্দ্রকুমার রায় : সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ৪৭)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রে'র পরিশিষ্টে গিরিজাকুমার বসুর 'শিবপুরে শরৎ-সাহচর্য্যে' নামে একটি রচনা সংযোজিত আছে; কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে সেই রচনায় একটি অক্ষরও নেই।

পরবর্তীকালে রাধারাণী দেবী জানিয়েছেন যে তমাললতা বসুর ওই রচনায় শরৎচন্দ্রের সন্তান সম্পর্কিত অংশে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'নিজের ইচ্ছামত কথা' বসিয়ে দিয়েছিলেন, তথ্য বদলেছিলেন।

আবার আগের কথায় ফিরে যাওয়া দরকার।

শরৎচন্দ্র আবার সংসার পেতেছেন। হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে। স্বয়ং হিরন্ময়ী দেবী বলেছেন : "আমাদের রেঙ্গুনেতেই বিয়ে হয়েছিল।...তখন আমার বয়স ১৪/১৫..."*

দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর শরৎচন্দ্র বহুদিন রেঙ্গুনে ৩৬ নম্বর গলিতে বাড়ি ভাড়া করে থেকেছেন।

শরৎচন্দ্র, ১৯১২ সালের ২২ মার্চ, লিখেছেন : "চাকরি করি। ৯০ৎ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা অ্যালাউয়্যান্স পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে।"

হ্যাঁ, চাকরি করতে করতে একটা দোকানও খুলেছেন শরৎচন্দ্র। চায়ের দোকান।

একদিন আপিসে এসে তিনি বন্ধুদের বললেন—আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি। দেখবে তো চলো।

কথাটা কেউ বিশ্বাস করলেন না।

আপিস ছুটির পর তিনি দু-চারজন বন্ধুকে জোর করে নিয়ে গেলেন তাঁর নতুন চায়ের দোকানে।

একজন বন্ধু বললেন—তাহলে তো শরৎবাবুর চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। চায়ের দোকানে নিজে না বসলে দুদিনেই সাবাড় হয়ে যাবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—না হে না, বসতে হবে না। জানো, আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? একটিন দুধে কত চিনি মেশাতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে, আমি সব ঠিক করে নিয়েছি। সকালবেলা দুধের টিন কিনে দেব, সারাদিন কত টিন দুধ খরচ হবে সন্ধ্যাবেলা হিসেব করলেই পয়সা ধরা পড়বে।

দিনকতক হিসেব-টিসেব করে চালাতে না-চালাতেই লোকে ধারদেনার চোটে দোকানটাকে একেবারে কাণা করে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্র তখন বোটাটং ল্যান্সডাউন স্ট্রীটে একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে থাকেন। সেই লাইনে সবই কাঠের বাড়ি। সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠ থেকে নদী খুব দূরে নয়।

হঠাৎ একদিন—১৯১২ সালের ৫ ফেব্রুআরি—রাস্তার শেষদিকে একটা কাঠের বাড়িতে আগুন লেগে গেল। ওই বাড়ি থেকে আট-দশটা বাড়ির পর শরৎচন্দ্রের বাড়ি।

ছোট্ট একটা কাঠের বাক্স আর দু-একখানা বই বগলে করে শরৎচন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সব জিনিসপত্র ঘরে পড়ে রইল। একটি কুকুর ছিল; তাকে কোলে নিতে ভোলেননি।

কাছেই আলিমুল্লার বাজারের পাশে একখানা বাড়ি ভাড়া নিলেন। বারান্দা থেকে শরৎচন্দ্র দেখতে লাগলেন তাঁর অয়েলপেণ্টিং, ঘরের সাজসরঞ্জাম, বই-পুঁথি আগুনে পুড়ছে। আগুনের হাত থেকে আঁকবার সরঞ্জামগুলো শরৎচন্দ্র বাঁচাতে পেরেছেন। শরৎচন্দ্র, ১৯১২ সালের ২২ মার্চ, লিখেছেন: "আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের ম্যানাসক্রিপ্ট—"নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০/৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তা'ও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসর পাব্লিশ করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয় তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।"

এই অগ্নিকাণ্ডের কয়েক বছর আগের কথা। সরলা দেবী তখন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা। সম্পাদনার কাজে তাঁর সহায়ক হয়েছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সৌরীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হল; লেখকের নাম ছাপা হয়নি। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্যের 'ভারতী'তে বড়দিদির দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হল; লেখকের নাম ছাপা হয়নি।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'ভারতী'র কপি প্রেসে পাঠাতে গিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন দেখলেন, সর্বনাশ, 'বড়দিদি'র শেষাংশের কপি হারিয়ে গেছে। সৌরীন্দ্রমোহন জানতেন, বর্মা যাওয়ার আগে শরৎচন্দ্র তাঁর রচনাগুলি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হেপাজতে রেখে গেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ তখন ভাগলপুরে। শেষ পর্যন্ত সৌরীন্দ্রমোহন শেষাংশ চেয়ে চিঠি লিখলেন তাঁকে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত না নিয়ে 'বড়দিদি'র শেষাংশ দিতে রাজী হলেন না সুরেন্দ্রনাথ। তিনি এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন। উত্তর এল—অগত্যা!

১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র তৃতীয় কিংবা শেষ কিস্তি প্রকাশিত হল; সেবার লেখকের নাম ছাপা হয়েছে : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আগেই বলা হয়েছে সেকথা। একটা কথা বলা হয়নি—গোড়ায় নাম ছিল 'শিশু', পরে নাম বদলে 'বড়দিদি' করা হয়েছে।

১৯১২ সালে পুজোর সময় শরৎচন্দ্র হঠাৎ এসে উপস্থিত। সৌরীন্দ্রমোহনকে বললেন—'বড়দিদি' গল্পটা আমায় পড়তে দাও।

সেদিন কালীপুজো। বেলা প্রায় দুটো। সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়িতে বাইরের ঘরে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও সৌরীন্দ্রমোহন একত্র হয়েছেন। বাঁধানো 'ভারতী' খুলে সৌরীন্দ্রমোহন 'বড়দিদি' পড়তে আরম্ভ করলেন।

শুয়ে শুয়ে শরৎচন্দ্র গল্প শুনতে লাগলেন। মাঝে মাঝে উঠে বসেন। সৌরীন্দ্রমোহনের হাত চেপে ধরে বলেন—চুপ।

চোখে জল, গলার স্বর ভিজে। মুগ্ধ বিস্ময়ে শরৎচন্দ্র বললেন—এ আমার লেখা! এ গল্প আমি লিখেছি!

যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না।

তাঁকে বলা হল—লেখা ছেড়ে কী অপরাধ করছ, বলো তো!

শরৎচন্দ্র উদাস হয়ে বসে রইলেন বহুক্ষণ। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন —লিখব। লেখা ছাড়া উচিত হয়নি।

সেবার 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। 'যমুনা'য় লেখা দিতে রাজী হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষের 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের 'বোঝা' নামে একটি লেখা ছাপা হয়েছে। পুরনো লেখা। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্রের 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের 'রায়ের সুমতি' নামে একটি লেখা ছাপা হয়েছে। নতুন লেখা। তারপর 'যমুনা'য় স্বনামে-বেনামে শরৎচন্দ্রের বিস্তর রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১৪ সালের জুনে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র অন্যতর সম্পাদক হয়েছেন। পরবর্তীকালে 'রূপ ও রঙ্গ' নামে একখানা পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক হিসেবেও শরৎচন্দ্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ১৯১৮ সালে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সঙ্গে সকল

সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাঘের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বিরাজ বৌ' নামে শরৎচন্দ্রের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের কোনও রচনা দেখা যায়নি। পরে 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের বিস্তর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বেশী লেখা কোন পত্রিকায় বেরিয়েছে? নিঃসন্দেহে 'ভারতবর্ষে'।

প্রায় একযুগ বর্মায় কাটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে একাধিকবার কলকাতায় এসেছেন। রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র, ১৯১২ সালের ১১ মার্চ, কলকাতায় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছেন: "আমি ও দেশে মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও যাইবার আশা রাখি। আমি যখন যাই অন্ততঃ শেষ দু-বারের মধ্যে চেষ্টা করিয়াও প্রমথর ঠিকানা না জানায় দেখা করিতে পারি নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎ-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০১)

শরৎচন্দ্র, ১৯১৩ সালের ৩১ মে, লিখেছেন : "আমাদের office hour, strictly with hardest labour from 10-30 to 6-30। নিয়ম এই যে যদি কারু কোন দিন কোন তরফ থেকে রিমাইন্ডার আসে—৬ মাসের জন্য ১০ হিসাবে (জরিমানা) রিডাকশন। এই ত সুখের চাকরি।"

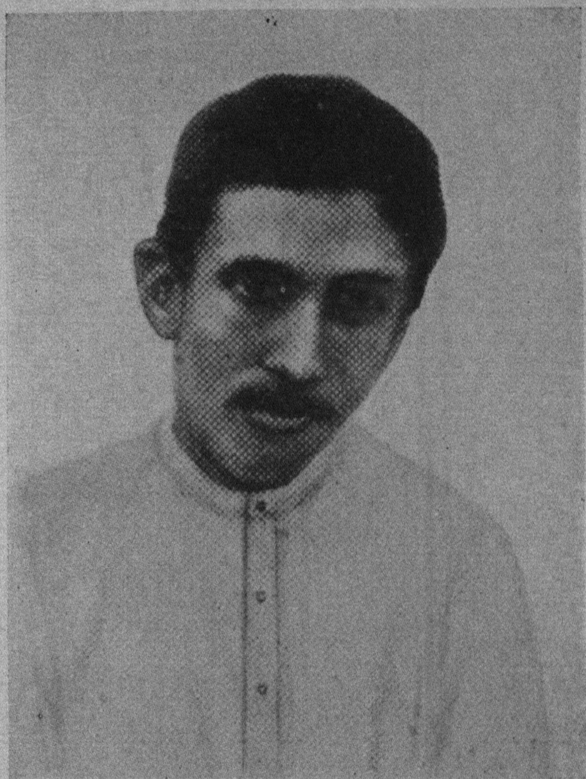
চাকরি আর শরৎচন্দ্রের পোষাচ্ছে না। যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "সেকশনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থেকে সুরু করিয়া বড় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর বার্ণার্ড, এমন কি শেষটায় সেকশনের ইনচার্জ অফিসার পর্যন্ত চ্যাটর্জীর (শরৎচন্দ্র) প্রতি বিরক্ত হইয়া গেলেন। চ্যাটার্জীও ক্রমশঃ এমন বেপরোয়া হইয়া উঠিতে লাগিলেন যে ব্যাপারটা একদিন চরমে উঠিল। দুই পক্ষে লাগিল ঠোকা-ঠুকি। বাকযুদ্ধে জয়ী হইলেও শরৎচন্দ্র মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হইলেন।"

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে কলকাতা যেতে লিখেছেন। কলকাতায় মাসে একশ টাকা আয়ের ভরসা দিয়েছেন।

১৯০৪ সালে হেমেন্দ্রমোহন রায় রেঙ্গুনে এসেছেন। দীর্ঘকাল তিনি চাকরি করেছেন অ্যাকাউণ্ট্যান্ট জেনারেল আপিসে। কেরানী হয়ে ঢুকেছেন; শেষ পর্যন্ত সিনিয়ার ডেপুটি অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল হয়েছেন। শরৎচন্দ্র একই আপিসে হেমেন্দ্রমোহনের সঙ্গে বহুদিন কাজ করেছেন। দুজনে যথেষ্ট চেনা-জানা ছিল। বর্মায় শরৎচন্দ্রের চাকরি-বাকরি সম্পর্কে হেমেন্দ্রমোহন একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করেছেন :

"Mr. Aghore Nath Chatterjee managed to get for him (Saratchandra), a temporary appointment in the office of the

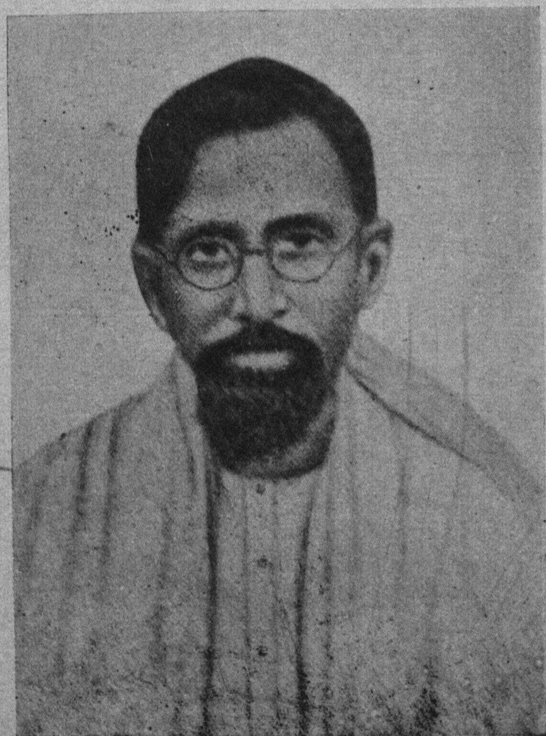
Auditor, Burma Railways through Mr. K. Bose, an Accountant of that office. After the death of Mr. A. Chatterjee, Dr. Chatterjee stayed for sometime with Mr. Ananda Prasad Bhattacharjee, an Overseer in the Government House, Rangoon. Dr. Chatterjee served 1½ years in the office of the Auditor, Burma Railways and had to resign his appointment. During this period he tried to become a lawyer, but as he could not pass the Burmese Language examination, his desire was not fulfilled. After leaving the service of Burma Railways, Dr. Chatterjee worked for some time as an Assistant with Mr. P. K. Mitter a Paddy merchant, Nyaunglebin, where he stayed for some time in the house of Mr. Krishna Kumar Mukherjee near Railway Station. Dr. Chatterjee did not like the Paddy work and left the place. He then stayed with Mr. N. K. Mitter, at present an Advocate of 'Pegu' for about 1½ years. During this stay, Dr. Chatterjee was extremely humorous and witty and used to entertain everybody with his humorous and witty talk and songs and for this reason he was liked by all. Mr. N. K. Mitter requested his cousin Mr. M. K. Mitter, who was then Deputy Examiner, Public Works Accounts Burma, to arrange for an appointment for Dr. Chatterjee who then came to Rangoon to stay with Mr. M. K. Mitter in a house in Thompson Street, Rangoon. Dr. Chatterjee used to read Spencer's books on Sociology which is depicted in his writing. Mr. M. K. Mitter managed to obtain an appointment of a temporary clerk on Rs. 30/- per mensem in July 1905 in the office of the Examiner, Public Works Accounts Burma, for Dr. Chatterjee. He was then able to obtain through the Examiner a temporary appoinment on Rs. 50/- per mensem in August 1905 in the office of the Executive Engineer, Pegu Division, Pegu. This appointment lasted only for about 2½ months when his services were dispensed with. He remained unemployed to the end of March 1906. He was retaken as a temporary clerk in the office of the Examiner, Public Works Accounts Burma in April 1906, on Rs. 50/- per mensem. For the satisfactory work, his pay was raised to Rs. 65/- per mensem from July 1906. After a year his pay was increased to Rs. 80/- per mensem. In July 1909, his pay was fixed at Rs. 90/- per mensem and this pay he drew until he resigned his appointment in April 1916, and returned to Bengal. He was all along



অল্পবয়সে শরৎচন্দ্র



শরৎচন্দ্র



শরৎচন্দ্র

a temporary clerk. 1910 he applied for a Permanent footing but as his age exceeded 30 years, he was not taken to the permanent establishment, but to speak the truth, Dr. Chatterjee was not very serious to transfer his services to permanent establishment.

The office of the Examiner, Public Works Accounts, Burma, was amalgamated with the office of the Accountant General Burma in 1911-12 and as a result, Dr. Chatterjee went to the office of the Accountant General Burma, Rangoon, in February 1912. Dr. Chatterjee appeared in 4th Grade Public Works Department Accountantship examination in 1905 and could not pass the examination....

Dr. Chatterjee was not keeping very good health in Burma. He fell ill while at Nyaunglebin. He went to Calcutta on leave in November 1907 for 3 months for an operation and returned in February 1908. In October 1912, he proceeded again in leave on medical certificate and returned in November 1912. For his bad health, he had to take again leave in June 1914, and came back in December 1914. He fell sick in February 1916 and had to resign in April 1916...."
(সতীশচন্দ্র দাস : শরত প্রতিভা, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ৭৭-৮০)

১৯১৬ সালের মে মাসে বর্মা ছেড়ে কলকাতা চলে এলেন শরৎচন্দ্র। বাসা করলেন বাজেশিবপুরে। জীবনে আর কখনও বর্মা যাননি, আর কখনও কেরানীগিরি করেননি, সাহিত্যকেই সম্বল করেছেন। শরৎচন্দ্র, ১৯১৯ সালের ২৪ অগস্ট, লিখেছেন : "বর্ম্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরানী—হঠাৎ বড় সাহেবের সঙ্গে মারামারি ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেছি। কিন্তু অকস্মাৎ এমনি কপাল ফিরে গেল যে রাতারাতিই একটা বিখ্যাত লোক হয়ে গেলাম।"

শরৎচন্দ্র বিস্তর টাকা খরচ করে ভালো ভালো বই কিনে হোমিওপ্যাথি বিদ্যা আয়ত্ত করতে লেগে গেছেন। হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মুখে একদিন একটি গল্প শুনেছেন : "বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেলো কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর—পেসেণ্ট খুঁজতে লাগলুম। বাড়ীতে যারা আসে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগেস করি তাদের কিছু অসুখ হয়েছে কিনা। সবাই বলে—না, কিছু হয়নি। গরহজম? মাথাব্যথা? চোঁয়া ঢেকুর? অম্বল? সবাই বলে—না কোনো অসুখই হয়নি। বেজায় দমে গেলুম—কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে! যাই হোক অনেক চেষ্টাচরিত্তিরের পর বাড়ীর পেছনদিকের এক

গয়লানীর অসুখ হ'তে একদিন আমার কাছে এলো। খুব ভালো ক'রে দেখে-শুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু'একদিন পরেই এসে আবার ওষুধ নিয়ে যেও বাছা—আর যদি তোমার কেউ জানাশুনো থাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো—অমনি ওষুধ দেব। কিন্তু সেই যে সে গেলো আর আসে না। একদিন বাড়ীর পিছনদিকের জানলাটী খুলে দেখি সে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। তাকে ডেকে বললুম, হাঁ বাছা—তোমার সেই যে কি অসুখ করেছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে—আর আসো না কেন? গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছি আর দরকার নেই। যা বাবা—এতো পড়লুম অমনি চিকিৎসা করব ওষুধ দেব তাতেও রুগী জুটল না, যাও বা জুটল তাকে আর চিকিৎসা করতে হ'লো না, এক ওষুধে সেরে গেলো।"

অনেক আগেই বলা উচিত ছিল, পানিত্রাস গোবিন্দপুরের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর বিবাহ হয়েছে। নরেন্দ্র দেব লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র, তাঁর দিদি ও ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখুয্যে মহাশয়ের অনুরোধেই পাণিত্রাসে সামতাবেড় গ্রামে বাটী নির্মাণ করে বসবাস করছিলেন।" ১৯২৫ সালে শরৎচন্দ্র পাণিত্রাস অঞ্চলে সামতাবেড় গ্রামে বাড়ি করেছেন। ১৯২৬ সালে সামতাবেড় চলে গেছেন। যাওয়ার আগে কিছুদিন থেকেছেন কালীকুমার মুখার্জি লেনের একটা বাড়িতে। সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ি রূপনারায়ণ নদীর তীরে। কালিদাস রায় লিখেছেন : "এই রূপনারায়ণ নদীর তীরে গৃহনির্মাণ করে বাস করারও একটা ইতিহাস আছে। যখন তিনি শিবপুর ছেড়ে সামতাবেড়ে বাস করতে যান—তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। তখন তিনি শিবপুরেই গৃহনির্মাণের সংকল্প করছিলেন। সহসা একদিন শুনলেন—তাঁর ভগিনীর গ্রাম সামতাবেড়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। তিনি তখনই ভাবলেন এই সময়ে ঐ গ্রামে একটা বড় বাড়ী করলে গ্রামের লোক খেটে অন্নোপার্জন করতে পারবে। এই ভেবে তিনি প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ করে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী তৈরী করে বাস করতে গেলেন। যে গ্রামে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হয়—বেছে বেছে শরৎচন্দ্র সেই গ্রামেই বাস করতে গেলেন। যেরূপ আর্থিক অবস্থা হলে লোকে দুঃখী কাঙালদের কাছ থেকে দূরে থাকতেই চায়—শরৎচন্দ্র সেই অবস্থায় গেলেন তাদের মধ্যেই বাস করতে। গ্রামের বহু লোক তাঁর গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল। সকলেই অল্পবিস্তর তাঁর দ্বারে সাহায্য পেয়েছিল।"

সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ির একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "সাম্‌তাবেড়-এ রূপনারায়ণের তীরে বাড়ী উঠল। দুতলা। টালির ছাদ। কিন্তু, সব মাটির দেওয়াল। বড় বড় ঘর। প্রশস্ত বারান্দা। নদীর দিকে বারান্দার কোণে একখানি ঘর। লেখবার আসর। বারান্দায় বিরাট আরাম চৌকী, ইজিচেয়ার। পাশেই গড়গড়া। সামনে প্রাঙ্গণে ফুলের

বাগান। অদূরে কূলভাঙা নদী। বিশাল জলরাশি। তারি বুকে দোলে ছোট ছোট নৌকা। পরপারে 'মসীমাখা তরুছায়া'।"

পাণিত্রাস কেমন জায়গা?

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—পাণিত্রাস কী রকম জায়গা, এখানে ম্যালেরিয়া নেই?

শরৎচন্দ্র হাসতে লাগলেন। বললেন—উপীন, তুমি সে-গল্প কাননকে করোনি? আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, তাঁর বয়েস প্রায় সত্তর। তাঁকে পাণিত্রাসের স্বাস্থ্যের কথা কেউ জিগগেস করলে জবাব দেন, আর কেন বলেন মশাই, এই বুড়ো বয়সেও খোলা জায়গায় নিশ্চিন্তে একটু তামাক খেতে পাই না।

কিন্তু তাতে কী হল? কাননবিহারী ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

উপেন্দ্রনাথ তখন ব্যাখ্যা করে বললেন—পাড়াগাঁয়ে গুরুজনদের সামনে তামাক খেতে নেই। শরতের ভগ্নীপতির চেয়েও বড় এত বুড়ো এখানে আছেন যে তাঁর তামাক খাওয়ার নিয়ত ব্যাঘাত হয়—এমন ভালো স্বাস্থ্য এখানকার!

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: "সামতাবেড় দরিদ্র গ্রাম। একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না সহজে। শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা যত্ন করে শিখেছিলেন দরিদ্রের সেবা করবার জন্য। গ্রামের যত চাষাভূষো দীনদরিদ্র কুলিমজুর সবার সঙ্গে তিনি ডেকে আলাপ করতেন। তাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন। ছেলেমেয়ের অসুখ করেছে শুনলে চিকিৎসা করতেন। বিনামূল্যে ওষুধ দিয়ে তাদের ভাল করে তুলতেন। কিন্তু রোগীর পথ্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা দিতে পারতো না। শরৎচন্দ্র নিজ ব্যয়ে তাদের পথ্যেরও ব্যবস্থা করতেন। এমনি করে তিনি সারাগ্রামের 'দাদাঠাকুর' হয়ে উঠেছিলেন।"

গ্রামে শরৎচন্দ্র কেমন করে সময় কাটান? শরৎচন্দ্র একদিন কালিদাস রায়কে বলেছেন—গ্রামে আমার সময় কাটাবার কোনও অসুবিধা নেই। জেলেরা মাছ ধরছে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। ছেলেরা তাস খেলছে, খানিকক্ষণ তাদের উপদেশ দিলাম। বুড়োরা দাবা খেলছে, দুটো উপরচাল বলে দিলাম। নিজেও দু-বাজি খেললাম। মাহিষ্যবুড়ী মুড়ি ভাজছে, তার সঙ্গে দুটো গল্প করলাম। একমুঠো মুড়ি খেতে খেতে কামাররা লোহা পিটুচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আগুনের ফিনকি ছড়ানো দেখলাম। এইভাবে—কোথাও গাই দোওয়া, কোথাও নালা কাটা, কোথাও দেওয়াল দেওয়া, কোথাও ঘর ছাওয়ানো—এইসব দেখে দিনগুলো দিব্যি কেটে যায়। গাঁয়ের দাঠাকুর আমি, কত যে সালিশি মেটাতে হয়, কত যে গৃহকলহের নিষ্পত্তি করতে হয়, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদেরও মীমাংসা করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। এছাড়া বারোয়ারির

চাঁদা তোলার তদারক করার প্রয়োজন হয়, ঘরে আগুন লাগলে নিভাবার ব্যবস্থা করতে হয়, কারো কঠিন ব্যারাম হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, বিয়ের ঘটকালি করতে হয়, বিয়েবাড়ি, শ্রাদ্ধবাড়িতে গিয়ে বিলিব্যবস্থা করতে হয়—এমনি কত কাজ।

বিশেষভাবে বলবার মতো একটি কাজের খবর আছে।

দেশী স্টীমার কোম্পানির সঙ্গে বিদেশী স্টীমার কোম্পানির একটি প্রতি-যোগিতায়, শরৎচন্দ্র, বলা বাহুল্য, দেশী স্টীমার কোম্পানির পক্ষ নিয়েছেন। শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ, 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদককে একখানা আবেদনপত্র লিখেছেন। সেই আবেদনপত্র 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ :

"রূপনারায়ণ নদীর ধারে পাণিত্রাসে আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে ঘাটাল স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানীর স্টীমার ও লঞ্চ চলে। কোলাঘাট হইতে ঘাটাল পর্য্যন্ত ইহাদের গতায়াত। হোরমিলার কোম্পানীও এই লাইনে তাহাদের স্টীমার চালায়। গত ছয় বৎসর কাল এই দুইটি কোম্পানীর মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। হোরমিলার কোম্পানীর স্টীমার বড়, অথচ কম জলে চলিতে পারে; সুতরাং সারা বৎসর তাহাদের চলায় বাধা হয় না। এছাড়া তাহাদের অর্থের অভাব নাই; ফলে, ভাড়া কমাইয়া যাত্রীদের সিগারেট উপহার দিয়া, একতালা ও দোতালার ভাড়া সমান করিয়া এবং অধিক সংখ্যক স্টীমার দিয়া তাহারা দেশী কোম্পানীর পক্ষে প্রতিযোগিতা কঠোর ও নিদারুণ করিয়া তুলিয়াছে। দেশী কোম্পানীর স্টীমার ছোট, জল ভাঙ্গে বেশী, সেইজন্য সারা বৎসর সকল সময় চলিতে পারে না। তথাপি, এতপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও দেশী কোম্পানীর স্টীমারে লোক যথেষ্ট হয়। ইহার একটা বড় কারণ এই যে, যাত্রী-গণের অধিকাংশই এই স্বদেশী "ঘাটাল কোম্পানীর" অংশীদার এবং প্রায় সমস্ত দেশের লোকই এখন দেশী কোম্পানীকে নানাভাবে সাহায্য করিতে চায়। এই সকল কারণে এবং ঘাটাল কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কর্ম্মপটুতা, সততা ও নিঃস্বার্থতার জন্য এই ধনী, বিদেশী ও শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত লড়াই করিয়া, প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও দেশী কোম্পানীটি এখনও টিকিয়া আছে।

এই দেশী কোম্পানীটিকে এই অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া তোলা দেশের লোকের একান্ত কর্ত্তব্য। বহুদিন হইতে ইহার সকল দিক দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যাতায়াতের যথেষ্ট ও নিয়মিত সুবিধা করিয়া দিতে পারিলেই যাত্রীরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেশী কোম্পানীরই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন হোরমিলার কোম্পানীর শীতলার মত একখানি বড় স্টীমার।

ইতিপূর্ব্বে ঘাটালের বিশিষ্ট উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, মহাজন প্রভৃতি কোম্পানীর পরিচালকগণ নিজেদের এবং এগার শত যাত্রীর মধ্যে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা তুলিয়া দুইটি ছোট স্টীমার ও একটি মোটর লঞ্চ ক্রয় করিয়া আজ ছয় বৎসর এই লড়াই চালাইতেছেন। তাহার উপর বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যয়ে ঘাটালের জনসাধারণের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সেখান হইতে আরও বেশী সংখ্যক অংশীদার পাওয়ার আশা করা বর্ত্তমানে শুধু অন্যায় নহে, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা। সেইজন্য আমি আজ এই আবেদন লইয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

কোম্পানীটি এবং কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ ঘাটালের স্থানীয় ব্যাপার হইলেও, সমস্যাটি স্থানীয় নহে, সার্ব্বজনীন। দেশী কোম্পানী বনাম বিদেশী কোম্পানী ইহাই হইল আসল সমস্যা। একটি দেশী বাঙ্গালী কোম্পানীকে বাঁচাইয়া তুলিয়া লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করা, বাঙ্গালীর শুধুই কর্ত্তব্য নয়, গৌরবের বিষয়। আশা করি, এই স্বাদেশিকতার ক্ষেত্র হইতে সমস্যাটিকে দেখিয়া দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ ও ধনিগণ এই কোম্পানীকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন। শুধু সাহায্য ভিক্ষা দিয়া নয়,—ব্যবসায়ে অংশীদার হইয়া যে সাহায্য দেওয়া যায় তাহাই আমরা চাই। অথচ, একথা প্রকাশ করা প্রয়োজন যে, এই অসম প্রতিযোগিতায় হয়ত অনেকদিন পর্য্যন্তই দেশী স্টীমার কোম্পানী লাভবান হইতে সমর্থ হইবে না। তথাপি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, একটি বড় স্টীমার ক্রয় করিতে পারিলেই এই দেশী "ঘাটাল কোম্পানী" অচির ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা মুক্ত হইয়া একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারিবে।

এই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ আমার সবিশেষ পরিচিত। তাঁহাদের সহিত ভালরূপ মিশিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই কোম্পানীর কাজকে জাতীয় কাজ মনে করিয়া একান্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত বিনা পারিশ্রমিকে ইহার কর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায়, প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিবার মত সাহায্য ও সুবিধা পাইবামাত্রই এই দেশী কোম্পানী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশা ও আনন্দের কথা এই যে, ইহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিপিন-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী গ্রাজুয়েট নন্—কলকব্জা সম্বন্ধে তাঁহার হাতেকলমে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাও প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি নিজ হাতে স্টীমার চালানো শিক্ষা করিয়া পোর্ট অফিসে সারঙের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া স্টীমারের যাবতীয় কলকব্জা কোনো ডকে না দিয়াও গবর্নমেণ্ট সারভেয়ারের অনুমোদনে নিজেই মেরামত করিয়া চালাইতেছেন। কলকব্জা ঘটিত ব্যক্তিগত জ্ঞানের অভাবে বহু

স্থানে এইরূপ কোম্পানীর যে ক্ষতি হয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার আশঙ্কা নাই। প্রয়োজনীয় মূলধন পাইলে এরূপ সুদক্ষ ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এই কোম্পানীর ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, দেশের কল্যাণকামী জনগণের নিকট আমার এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না, ইতি—"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩২ সালের ২০ এপ্রিল, লিখেছে: "...কলিকাতাবাসী শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে কলিকাতা মনোহরপুকুরে শরৎচন্দ্র অবিলম্বে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার মনস্থ করিয়াছেন এবং এই গৃহ সম্পূর্ণ হইলেই তিনি কলিকাতাতেই বাস করিবেন।"

১৯৩৪ সালে বালিগঞ্জে একখানা বাড়ি করেছেন শরৎচন্দ্র। 'বাতায়ন', ১৯৩৪ সালের ৬ জুলাই, লিখেছে: "আমরা বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশাই বর্ষাকালে কলিকাতায় থাকবার জন্যে এখানে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছেন। গত সপ্তাহে তিনি এই নূতন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করেছেন। তাঁর ঠিকানা হচ্ছে পি ৫৬৬, মনোহরপুকুর সেকেন্ড রোড।"

কিন্তু বালিগঞ্জে তাঁর মন টিকত না। সামতাবেড় যাওয়ার জন্য ছটফট করতেন। সুযোগ পেলেই সামতাবেড়ে চলে যেতেন। গেলে আর সহজে বালিগঞ্জে আসতে চাইতেন না।

কালিদাস রায় লিখেছেন: "বালিগঞ্জে থাকতে থাকতে তাঁর বিলাত যাওয়ার একবার ইচ্ছা হয়েছিল। অনেকে বলেছিল—তিনি নাকি নোবেল প্রাইজের জন্য চেষ্টা করতে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম শরৎদাকে—গুজব সত্য কিনা। তিনি বলেছিলেন—"দিন দিন শরীর খুব খারাপ হচ্ছে—কবে মরে যাব, ও জগৎটা একবার চোখে দেখে আসি। তাছাড়া একটু স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে বলে সবাই ভরসা দিচ্ছে। নোবেল প্রাইজ-ট্রাইজের কথা যা শত্রুপক্ষ রটাচ্ছে ওসবে বিশ্বাস করো না। বাংলার গ্রাম্যজীবনের ছবি কখনো তারা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে? হিন্দী অনুবাদেই রস নষ্ট হয়ে যায়! তা ছাড়া ওদেশে আমার মত নভেলিস্টের অভাব কি?"*

একখানা মোটরগাড়ি কিনেছেন শরৎচন্দ্র। একজন ড্রাইভার বহাল করেছেন। ড্রাইভারের নাম কালী। শরৎচন্দ্র প্রথম দিনই কালীকে বলেছেন—আমি যতদিন বাঁচব, কালী, তোমার কোনও অভাব রাখব না। কিন্তু একটি কথা তোমাকে বলে রাখি। যেদিন তুমি গাড়ি চালাতে গিয়ে পথে কোনও মানুষ কেন, একটা কুকুর, বিড়াল বা হাঁস-মুরগীও চাপা দেবে সেদিন তক্ষুনি তোমার চাকরি

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাশপোর্টের জন্য সে-সময়ে গভর্নমেন্টের কাছে যাঁদের দরখাস্ত জমা পড়েছে তাঁদের নামের তালিকা আমি দেখেছি। তালিকায় শরৎচন্দ্রের নাম পাইনি।

যাবে। আমার এই কথাটি মনে রেখো।

শরৎচন্দ্র একবার সুরেন্দ্রনাথ আর গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন স্টীমারে। সম্পর্কে ওঁরা শরৎচন্দ্রের মামা। ছেলেবেলার বন্ধু।

সকালবেলা স্টীমারে চা পাওয়া গেল। বিশ্রী চা। যেমন দেখতে তেমনি খেতে।

শরৎচন্দ্র বললেন—দ্যাখো তো হে সুরেন, যদি মেজেঘষে একে ঠিক করতে পারো। চা নইলে তো মারা যাব।

চিনি দুধ ইত্যাদি দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ওই চা অনেকটা সচল করলেন।

শরৎচন্দ্র চুমুক দিয়ে বললেন—বাঃ, মেজেঘষে তো দাঁড়িয়েছে মন্দ নয়।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—মেজেঘষে সব জিনিসকেই ভালো দাঁড় করানো যায়।

চায়ের কাপ মুখ থেকে নামিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—উঁহু, একটা জিনিস শুধু পারা যায় না।

—কী?

শরৎচন্দ্র বললেন—লেখা।

কথা শুনে সুরেন্দ্রনাথ আর গিরীন্দ্রনাথ হাসলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—হাসি নয়, ভালো করে ভেবে দ্যাখো, ও জিনিসটা ঘষেমেজে কিছুতেই ভালো হয় না। যে যেমন সুরু করলে, বাস্ তার চলল সেইরকম। একশ বচ্ছর লিখুক না, তবু তাই। রবিবাবুর লেখা—সে একেবারে গোড়া থেকেই রবিবাবুর। নকল করে, ভেংচে, কেউ তার নাগাল পেলে না।

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় কাহিনীটি নিবেদন করে গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "শরৎ রবিবাবুর নাম করেছিল। কিন্তু আর একজনের নামও করা যায়, সে শরৎ স্বয়ং।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, বলেছেন :

"তিনি (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের শিক্ষক। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এই নগরেরই এক পথের ধারে। ডেকে বললেন, শরৎ, তোমার লেখা আমি পড়ি নি, কিন্তু লোকে বলে সেগুলো ভাল হচ্ছে। একদিন তোমাদের আমি পড়িয়েছি। আমার আদেশ রইল—যা সত্যই জান না, তা কখনো লিখো না। যাকে যথার্থ উপলব্ধি কর নি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন ক'রে পাও নি, তাকে ঘটা ক'রে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হ'তে চেয়ো না। কেন না এ ফাঁকি কেউ-না-কেউ একদিন ধরবেই, তখন লজ্জার অবধি থাকবে না। আপন সীমানা লঙ্ঘন করাই আপন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা। এ ভুল যে করে না তার আর যে দুর্গতিই হোক তাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না। অর্থাৎ বোধ হয় তিনি এ-কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, পেটের দায়ে যদি বা কখনও ধার কর, ধার ক'রে কখনও বাবুয়ানি ক'রো না।

সেদিন তাঁকে জানিয়েছিলাম, তাই হবে।

আমার সাহিত্য-সাধনা তাই চিরদিন স্বল্প পরিধিবিশিষ্ট। হয়ত, এ আমার ত্রুটি, হয়ত এ-ই আমার সম্পদ...”

শরৎচন্দ্র বিস্তর বই লিখেছেন। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ‘বড়দিদি’। প্রকাশক ফণীন্দ্রনাথ পাল লিখেছেন : “শরৎচন্দ্রের নিষেধ অমান্য করিয়াও তাঁহার ‘বড়দিদি’ আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কোন লেখাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য মাত্র আট আনা নির্দ্ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে লোক পাঠাইয়াও এক বৎসরের মধ্যেও কিন্তু চারিশতের অধিক পুস্তক বিক্রয় করিতে পারি নাই।”

১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজ বৌ’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘পরিণীতা’ ও ‘পণ্ডিতমশাই’।

‘পণ্ডিতমশাই’ প্রকাশিত হওয়ার অনেকদিন পরের কথা। রবীন্দ্রনাথ একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন—শরৎ, তোমার একখানা বই পড়লুম—পণ্ডিতমশাই।

বইখানা রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আপনি আবার ওসব বই পড়েন কেন? ও কিছুই হয়নি। তাছাড়া আপনার নিয়েই তো সব।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—তোমাদের এ অযথা বিনয় কেন বলো তো? আত্ম-বিশ্বাস না থাকলে মানুষ বড় হয় না। বলো, এতদিন লিখছি ভালো না হওয়াটাই আশ্চর্য—তা নয়, আমি বললুম ভালো লেগেছে তবু তুমি বললে ও কিছুই হয়নি।

১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের ‘মেজদিদি’। ১৯১৬ সালে ‘পল্লীসমাজ’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘বৈকুণ্ঠের উইল’ ও ‘অরক্ষণীয়া’।

‘অরক্ষণীয়া’ সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “শরৎচন্দ্র যখন অরক্ষণীয়া গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদ ভারতবর্ষে দেন তখন তার উপসংহার অন্যভাবে করেছিলেন। সেটি পড়ে তাঁর চিরশুভার্থী বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাজেষ্ট করেন—ঐভাবে শেষ না করে এইভাবে (বর্ত্তমান গ্রন্থে যে উপসংহার আছে) শেষ করলে ভালো হয়। শরৎচন্দ্র তাই করেছিলেন। বই বেরবার কিছুদিন পরেই মফস্বলের এক ক্লাবের কতকগুলি ভদ্রলোক হরিদাসবাবুকে চিঠি লিখে জানান যে তাঁদের ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তুমুল তর্ক এমন কি বাজী রাখাও হয়েছে উপসংহারের বক্তব্য নিয়ে। একদল বলছে, জ্ঞানদার সঙ্গে অতুলের বিয়ে হবে শরৎবাবু এই ইঙ্গিতই করেছেন, আর একদল বলছে, না তা কখনোই না। অতএব হরিদাসবাবু যেন শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—জ্ঞানদাকে অতুল শ্মশান থেকে নিয়ে যাবার পর তাদের কি হলো এবং তিনি কি বলেন সে কথা যেন তাঁদের হরিদাসবাবু জানান। শরৎচন্দ্র

আসতেই হরিদাসবাবু তাঁকে সব কথা বললেন। শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে; বললেন, আপনার জন্যেই তো এই বিপদ হলো—বেশ দিয়েছিলুম জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে, অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচত, লেখক বাঁচত, প্রকাশক বাঁচত, এখন এর কি জবাব দেব আমি তো ভেবে পাচ্চিনে—এরকম চিঠি রোজ এলেই তো গেছি। ব'লে হাসতে হাসতে বললেন, তারা তো জানতে চেয়েছে জ্ঞানদা ও অতুলের শ্মশান থেকে যাবার পর কি হলো? আচ্ছা লিখে দিন: শরৎবাবু বলিলেন—তারপর তাহাদের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই; সুতরাং কি হইল তিনি বলিতে পারেন না।"

১৯১৬ সালের প্রথমার্ধের একদিন।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন 'অনাড়ম্বরবেশী শীর্ণকায় ভদ্রলোকে'র সঙ্গে কথা বলছেন। সুধীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল, সিনেট অফিসের সিঁড়ি দিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন নেমে আসছেন।

সুধীন্দ্রনাথ দু-একটি কথার পর দীনেশচন্দ্রকে বললেন—আপনি শরৎবাবুকে চেনেন না? ইনি একজন ভালো ঔপন্যাসিক।

দীনেশচন্দ্র বললেন—তাঁর লেখা আমি পড়েছি বলে মনে হয় না। ইনি কি কি বই লিখেছেন?

শরৎচন্দ্রের লেখা কয়েকখানা বইয়ের নাম করলেন সুধীন্দ্রনাথ। কিন্তু একখানাও দীনেশচন্দ্র পড়েননি।

দীনেশচন্দ্র বললেন—ইনি তো আমাকে এঁর কোনও বই দেননি।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি দিলে কি আপনি পড়বেন?

খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বললেন—ঠিক যে পড়ব, এমন বলতে পারি না। তবে আপনি বই দিয়ে দেখতে পারেন।

তিন-চার মাস বাদে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান থেকে কয়েকখানা বই পেলেন দীনেশচন্দ্র। বহুদিন পর বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের গল্পে সজীব মানুষ দেখলেন। দীনেশচন্দ্রের বিবেচনায়: "শরৎ বাবুর ভাষার সংযম আছে; সংযত দুই-একটি কথায় তাঁহার চরিত্রগুলির অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।" দীনেশচন্দ্রের বদ্ধমূল বিশ্বাস: "শরৎ বাবুর প্রতিভা অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের রচনার গুণ ব্যাখ্যা করে দীনেশচন্দ্র একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষে'—১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষে। প্রবন্ধের উপসংহারে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: "আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে নববলদৃপ্ত, অসামান্য প্রতিভাশালী এই লেখকের অভ্যুত্থানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একখানা চিঠি লিখেছেন শরৎচন্দ্রকে। চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষে'—১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘে। চিঠিখানা থেকে অংশ-

'শ্রীকান্তে'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার অংশ

বিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"দৈবক্রমে আপনার একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। তাহার পর আপনার সব বই আনিয়া পড়িয়াছি।

অতি-মানুষ কদাপি দেখা যায়।

আপনি সাধারণ জীবনেরই কথা লিখিয়াছেন,—যারা দ্বারা জাতীয় জীবন রক্ষিত হইতেছে। তাহাতে যে কি মহত্ত্ব আছে ও কি মহত্ত্ব সম্ভব, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, অথচ আমাদের সম্মুখেই ঘটিতেছে।

অপ্রাকৃত ও অসম্ভাবিত চরিত্রের কথা বলেন নাই। বহুভাষী নবনীগঠিত পুরুষের পরিবর্তে পুরুষত্ব এবং নারীকে পুতুলরূপে না আঁকিয়া তাহার নারীত্ব দেখাইয়াছেন।

যাহা ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র, তাহার পরিবর্তে যাহা চিরন্তন তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন।"

১৯১৭ সালের ফেব্রুআরিতে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব।' ভাগলপুরের রাজুর কথা মনে আছে? 'শ্রীকান্তে'র ইন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, এই রাজু। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র যখন শ্রীকান্ত লিখচেন, তখন এই রাজুর কথা প্রায় বলতেন। বলতেন— রাজু আমার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে...তাকে জীবনে ভুলবো না। আমাকে রাজু অনেক কিছু দিয়ে গিয়েছে...তার সে-দানের ঋণ শোধ হবার নয়।"

'শ্রীকান্ত, প্রথম পর্বে'র পর ১৯১৭ সালে শরৎচন্দ্রের আরও চারখানা বই প্রকাশিত হয়েছে—'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ' ও 'চরিত্রহীন'। সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন : "বেশ মনে আছে 'চরিত্রহীন' পড়িবার জন্য পাঠকদের যে আগ্রহ দেখিয়াছি, তাহা বোধ হয় কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটে নাই। 'চরিত্র-হীন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দুই বৎসর লাগিয়াছিল। যেদিন 'চরিত্রহীন' প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই দিনই এই ৩৷৷৹ মূল্যের উপন্যাসের ৪৫০ কপি বিক্রয় হইয়া যায়।"

'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে', ১৯১৮ সালের ১১ জুলাই, 'বিন্দুর ছেলে' ও 'মেজদিদি'র দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

"There has, however, recently arisen a young Bengali writer (Sarat Chandra Chatterjee) of stories for whom we may with some confidence already claim parity with Guy de Maupassant. He lacks, fortunately for him, the morbid pre-occupation with sex of the Frenchman. His knowledge of the ways and thoughts and language of women and children, his power of transferring these vividly to the printed page, are such as are rare indeed in any country. In India, and

especially in the great "joint-family" residences of Bengal, swarming with women of all ages and babes of all sizes, there is a form of speech appropriated to women's needs, which Mr. Kipling somewhere describes as *choti boli*, the "little language." Of this Mr. Chatterjee is an admirable master, to an extent indeed not yet attained, we believe, by any other Indian writer. For those who read dictionary at elbow, his transcripts of homely revealing conversations in the *Zenana* are subjects for despairing admiration. Yet what a significant glimpse they permit into the more recondite features of social life in modern Bengal. Mr. Chatterjee is much too true an artist to allow his gift of kindly yet scrupulously accurate observation to be distracted by social or political prejudice. He is, we gather, on the whole inclined towards a sane conservatism; he remains a Hindu at heart in a country whose whole civilization is based on Hindu culture. He has, we dimly suspect, his doubts as to the wisdom and working of Europeanized versions of the old religion and the old customs. But he is so keen and amused a spectator of the life about him, whether in cosmopolitan Calcutta or in somnolent little villages buried in dense verdure among the sunny ricefields, that it is not without doubts and diffidence that we attribute to him a tendency to praise past times and comfortable old conventions.

In the two little volumes before us are, in all, six admirable short stories, which should be read and re-read by every one whom official duty or private inclination calls to a just comprehension of Bengali mentality, a right sympathy with the best side of Bengali social life. Here are adorable naughty children (always boys, somehow) whom any healthy English mother would love. Here is a remrakable picture gallery of the women of Bengal, some gently pious, yet bold in the defence of the humble and oppressed; some termagants or pretentious humbugs, such as would have delighted the creator of Philamante or Bélise. All these are depicted with unflagging vigour and vivacity. It is pleasant, too, to find that, even where the purdah still hangs between male and female, women are quite conscious of their own natural power and manage their men-kind with a sometimes charming, sometimes appalling, determination. There are Chrysales, it seems,

in modern Bengal as in the France of Louis XIV; and, above all, there are humble Martines for whom we can feel an amused admiration. In the story headed "Andhare Alo", ("light in darkness") is a masterly and pathetic sketch of a beautiful nautch girl. The tale is told so delicately and with such deep comprehension of the feminine mind that it would be a shame to spoil it by an attempt to summarize its incidents. Edmund White would have admired this singularly intimate picture of the mental workings of one who is named (like the heroine of one of the best of White's novels) Bîjli the Dancer.

It may be doubted whether Mr. Chatterjee's tales can be adequately rendered into English, and therefore, perhaps, some apology is due to English readers who may never come across any of the work of this talented young Bengali. Yet it is well that the British elector should know, if only at second-hand, that in one Indian province at least exists a literature as copious, as varied, as full of hope and promise as that of any Western nation. English readers have heard of Sir Rabindranath because, being that rarest of things, a true biglot, he has been able to put his singularly accomplished and varied verse forms into a fairly adequate English prose rendering. He is not, of course he is not, *a rara avis* in Bengali, much less in Indian literature. To suppose such a thing is to misunderstand the nature of literary evolution—to think of literary eminence as an isolated, a volcanic fact like the Puy de Dòme or Fusiyama. Tagore is one of the greatest of Bengali authors, as Mont Blanc is one of the greatest of mountains. But his is not a solitary height, as he would be one of the first to protest. Mr. Chatterjee's tales, let us add in conclusion, have more than a literary merit. His is not predominantly a satirical temperament. Yet his keen and courageous picture of Hindu life may well be recommended to those who hold that political remedies can be provided for social sores. It may be that his wise and witty comprehension of the life about him is itself a symptom, and that "il est moral comme l' experience." There is in him, at times, a touch of discouragement and sadness; but that reminds us once more of Alfred de Musset's wise and penetrating lines on

> Cette māle gaieté, si triste et si profonde,
> Que, quand on vient d'en rire, on devrait en pleurer.

It is of excellent omen that Mr. Chatterjee's art has received such instant and wide appreciation in his own country. Let us hope that in other Indian provinces there are rising authors as keenly observant and gifted with a like faculty of easy and natural expression. When all is said, it is rather by intellectual effort than by political agitation that Indians will win for themselves the place they claim in the great society of nations—a place for which their share in our own Imperial responsibilities will in due course fit them if they have the wit and wisdom to comprehend and use rightly that "policy of association" which is the watchword of the French administration of what Frenchmen prefer to call "colonies"—intellectual colonies of the French spirit—rather than, in our more dubious phrase, "dependencies."*

'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে' এই দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার মাসকয়েক আগে—১৯১৮ সালের ফেব্রুআরিতে—প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'। এই বইখানায় 'স্বামী' নামে একটি গল্প আছে। এবং 'স্বামী' সম্পর্কে একটি কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নন-কো-অপারেশন আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তার ৪/৫ বৎসর পূর্বে শরৎচন্দ্র বর্মা থেকে বাঙলায় ফিরে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সখ্য হয়। দেশবন্ধু তখনও দেশবন্ধু হননি, তিনি তখনও ব্যারিস্টার এবং কবি চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর পরিচালিত বাঙলা মাসিকপত্র 'নারায়ণে' প্রকাশের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে একটি লেখা চেয়ে পাঠান। শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্বামী' গল্পটি রচনা করে, গল্পটির কোন নামকরণ না করে দাশ মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁকেই গল্পটির নামকরণ করবার ভার দেন।" 'স্বামী' প্রকাশিত হয়েছে 'নারায়ণে'—১৩২৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্রে।

দেশবন্ধুর ধারণা টাকা দিয়ে শরৎচন্দ্রের মতো শিল্পীর রচনার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। অতএব তিনি একখানা ব্ল্যাঙ্কচেক পাঠিয়ে দিয়েছেন শরৎচন্দ্রকে; অনুরোধ জানিয়েছেন যেন শরৎচন্দ্র নিজের ইচ্ছামতো ব্ল্যাঙ্কচেকে টাকার অঙ্ক বসিয়ে নেন।

টাকার ঘরে শরৎচন্দ্র যে কোনও টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারতেন, কারও কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু কত বসিয়েছেন শরৎচন্দ্র? মাত্র একশ টাকা।

এই ঘটনার বহুদিন পরের কথা।

১৯২৫ সালের ২ মে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে ফরিদপুর গেলেন। কিন্তু সম্মেলনে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। কলকাতা ফিরে এলেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, মন খুব বিষণ্ণ। সাব্যস্ত হল, দার্জিলিং থেকে শরীর সুস্থ করে এসে আবার পুর্ণোদ্যমে দেশসেবার কাজে লাগবেন। মন খুব বিষণ্ণ, শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "শরৎচন্দ্র বসে বসে তাঁর হাতের দশ আঙুলে দেশবন্ধুর দশ আঙুলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত বিশ্বাস ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে দিতে লাগলেন। বহুক্ষণ পরে বললেন, "আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, দার্জিলিং থেকে ফিরে আসুন স্বাস্থ্যলাভ করে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি সর্বত্যাগী, আপনি অভ্রান্ত, আপনি অগ্নিশুদ্ধ, আপনিই দেশের নেতা। দেশ আপনারই, টম, ডিক, হ্যারির নয়।"

১৯২৫ সালের ১১ মে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিং রওনা হলেন। আর তিনি ফিরে আসেননি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ১৯২৫ সালের ১৬ জুন, ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন।

দেশবন্ধু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের 'স্মৃতিকথা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'মাসিক বসুমতী'তে—১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে। প্রবন্ধটি থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধার করি:

"মনে হয়, পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীয়ের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না।

আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এত বড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।

তাঁহার আয়ুষ্কাল যে দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরাও জানিতাম, তিনি নিজেও জানিতেন।

সেদিন পাটনায় যাইবার পুর্ব্বে আমায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শয্যাগত; আমি কাছে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবার final শরৎবাবু।

বলিলাম, আপনি যে স্বরাজ চোখে দেখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তার আর সময় হইল না।

তিনি যখন জেলে, তখন জন কয়েক লোক প্রাচীরের গায়ে নমস্কার করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার যো নাই, আমরা তাই জেলের পাঁচীলে তাঁকে প্রণাম করিতেছি। একথা তিনি শুনিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, এরা আপনাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? দুই চোখ তাঁহার ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন। মিনিট ২০ পরে ডাক্তার দাসগুপ্ত ঘরের কোণ হইতে আমার মোটা লাঠিটা আনিয়া আমার হাতে দিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, ইঙ্গিতটা বুঝেছেন শরৎবাবু? এরা আমাদের একটুখানি গল্প করতেও দিতে চায় না।

এ গল্পের আর আমাদের অবসর মিলিল না।

লোক বলিতেছে, এত বড় দাতা, এত বড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়, ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য? বাস্তবিক, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মধ্যেও এত বড় বৈরাগী আর আমি দেখি নাই। ঐশ্বর্য্যে যাহার প্রয়োজন ছিল না, ধন সম্পদের মূল্য যে কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে টাকাকড়ি দুই হাতে ছড়াইয়া ফেলিবে না ত ফেলিবে কে? একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, লোক ভাবে, আমি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়িয়া ঝোঁকের মাথায় প্র্যাক্‌টিস ছাড়িয়াছি। তাহারা জানে না যে, এ আমার বহুদিনের একান্ত বাসনা, শুধু ত্যাগের ছল করিয়াই ত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখিব, কিন্তু এ যখন ভগবানের ইচ্ছা নহে, তখন এই আমার ভাল।...

গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিক মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গলাদেশে ইংরাজী বাঙ্গলা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তবগান সুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি, তাহার আর তুলনা নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সংসারে কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাইতে পারে না? দেশবন্ধু একটুখানি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা' হ'লে কি আর রক্ষা ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মাঝে অহর্নিশি জ্বল্‌ছে, সে ত এক মুহূর্ত্তে আমাকে ভস্মসাৎ করে দিত।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা, তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা

হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম, গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হ'য়ে উঠে ত তবে থাক্।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করতে জানিনে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝ্‌বে, তার যথাসর্ব্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে! এই সকল কথা বলিতে গেলেই উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাঙ্গলাদেশ ও এই বাঙ্গলাদেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন, কি বিশ্বাসই করিতেন! কিছুতেই যেন আর তাহাদের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন না।

এ কথার আর উত্তর কি, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, বাস্তবিক এতখানি ভাল না বাসিলে এই অপরিসীম শক্তিই বা তিনি পাইতেন কোথায়? লোক কাঁদিতেছে,—মহতের জন্য দেশের লোক ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে, সে আমি চিনি। কিন্তু এ সে নয়। একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ সেই। আর আমরা, যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারণাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায় রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে! যেখানে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাসের আর সীমা ছিল না। যেন একেবারে অন্ধ। ইহার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সহস্র প্রমাণ প্রয়োগেও এ বিশ্বাস টলাইবার যো ছিল না।

সে দিন বরিশালের পথে, স্টীমারে, ঘরের মধ্যে আলো নিবানো, আমি মনে করিয়াছিলাম, পাশের বিছানায় দেশবন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, অনেক রাত্রিতে হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, শরৎবাবু, ঘুমাইয়াছেন?

বলিলাম, না।

তবে চলুন, ডেকে গিয়ে বসিগে।

বলিলাম, ভয়ানক পোকার উৎপাত।

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করার চেয়ে সে ঢের

সুসহ। চলুন।

দুই জনে ডেকে আসিয়া বসিলাম। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তারা দেখা যায়, নদীর অসংখ্য বাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টীমার চলিয়াছে, তাহার দূর-প্রসারী সার্চ্চলাইটের আলো কখনও বা তীরেবাঁধা ক্ষুদ্র নৌকোর ছাতে, কখনও বা তরুশিরে, কখনও বা জেলেদের কুটীরের চূড়ায় গিয়া পড়িতেছে। দেশবন্ধু বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, শরৎবাবু, নদী-মাতৃক কথাটার সত্যকার অর্থ যে কি, এ দেশে যারা না জন্মায়, তারা জানেই না। এ আমাদের চাই-ই চাই।

এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পরে তিনি একা কত কথাই না বলিয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।...

নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লাঞ্ছনার কথায় তাঁহার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকিত। কে নাকি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিল, দেশবন্ধু শব্দের আর একটা অর্থ চন্ডাল। এই কথায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজে উচ্চকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, উচ্চজাতির দেওয়া বিনা দোষে এই অপমানের গ্লানি নিপীড়িতদের সহিত সমভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিত। ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনারা দয়া করে' আমাকে এই 'পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে' দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিগে। আমি ঢের কাজ কর্‌তে পারবো।

এই বলিয়া তিনি ইহাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুসমাজ কত অত্যাচার করিতেছে, তাহাই এক একটা করিয়া বলিতে লাগিলেন।...

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, শু'তে যাবেন না? চলুন।

চলুন, বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই রেভোলিউসনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাকটিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা' ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যা'বে না, তখন আরও স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠ্‌বে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎবাবু।

কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রিশেষের আলো-অন্ধকার আকাশের নীচে, নদীবক্ষে

দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।...

দেশের মধ্যে রেভোলিউসনারী ও গুপ্তসমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলি স্বরূপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনই অসম্ভব ছিল। তাঁহাদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাঙলায় একটা appeal লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম, "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেও না পারো, ত অন্ততঃ ৫/৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থ চিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু আমার 'যদি' কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি'তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে' 'assuming but not admitting' করে' এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি, তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।...

একবার একটা সভার পরে গাড়ীর মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অনেকে আমাকে আবার প্র্যাকটিস্ করে' দেশের জন্যে টাকা রোজগার করে' দিতে পরামর্শ দেন। আপনি কি বলেন?

আমি বলিলাম, না। টাকার কাজের শেষ আছে, কিন্তু এই আদর্শের আর অন্ত নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হ'য়েই থাক্। এ আমাদের অসংখ্য টাকার চেয়েও ঢের বড়।

দেশবন্ধু জবাব দিলেন না। হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই হাসিটা এবং স্তব্ধতার মূল্য যেন আমরা বুঝিতে পারি,—ইহার চেয়ে বড় কামনা আর নাই।"

সুভাষচন্দ্র বসু তখন মান্দালয় জেলে বন্দী। সেখান থেকে তিনি, ১৯২৫ সালের ১২ অগস্ট, শরৎচন্দ্রকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"মাসিক বসুমতীতে আপনার 'স্মৃতিকথা' পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার অন্তর্দৃষ্টি, দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও

আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা,—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।...

আমার—শুধু আমার কেন এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না—অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

আবার আগের কথায় ফিরে যাওয়া দরকার।

'স্বামী'র পর ১৯১৮ সালে শরৎচন্দ্রের আরও দুখানা বই প্রকাশিত হয়েছে —'দত্তা' আর 'শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব'।

প্রমথ চৌধুরী শরৎচন্দ্রের একজন গুণগ্রাহী। 'আহুতি' নামে তাঁর একখানা গল্পের বই ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানা তিনি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরে নয়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের খাতিরে। উৎসর্গপত্রে প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন : "শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করকমলেষু—"

১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'ছবি', 'গৃহদাহ' ও 'বামুনের মেয়ে'।

'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট', ১৯২২ সালের ৭ ডিসেম্বর, দুজন ভারতীয় লেখিকার রচনার উল্লেখ করে লিখেছে :

"The position of women occupies their attention as much as it does that of Saratchandra Chatterjee, who has been writing stories all his life, and whose sales have been enormous. "Srikanta" is his chief work, and is largely autobiographical."

১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' ও 'দেনা-পাওনা'।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩ সালে শরৎচন্দ্রকে 'জগত্তারিণী মেডেল' দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের আগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ ওই মেডেল পাননি। 'ভারতবর্ষ', ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্তিকে, লিখেছে : "অতি সুসংবাদ! আমাদের শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবার 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।... সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করায় স্বর্ণপদকেরই সম্মান বৃদ্ধি হইল।"

উত্তরকালে হরিহর শেঠ লিখেছেন : "তিনি (শরৎচন্দ্র) একবার অনেক

অনুরোধে বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক হইয়াছিলেন।...সেবার তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে ভ্রমর ও রোহিণীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ইহাতে পরীক্ষার্থী হইতে উহাদিগের অধ্যাপকগণ পর্যন্ত সকলের পক্ষে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে এরূপ ভাবের প্রশ্ন করার জন্য অভিযোগ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি কর্তৃপক্ষকে বলিয়াছিলেন, যত সংখ্যা ইচ্ছা এই প্রশ্নে গ্রেস্ দিতে পারেন। ইহার পর আর কখনও তাঁহাকে পরীক্ষক মনোনীত করা হয় নাই।"

১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'নববিধান'।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯২৫ সালের একদিন, শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার উপন্যাসগুলির মধ্যে কোনখানা আপনি সবচেয়ে ভালো মনে করেন?

কিছুমাত্র ইতস্তত না করে শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—গৃহদাহ। আর্টের দিক থেকে এ একেবারে নিখুঁত।

রবীন্দ্রনাথ একদিন শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছেন—শরৎ, শুনতে পাই তুমি নাকি গল্পের শেষ থেকে আরম্ভ করে উল্টোদিকে গোড়ায় এসে পৌঁছও!

শরৎচন্দ্র বলেছেন—তা নয়, তবে মাঝখানে পাঁচ-ছ'টা পরিচ্ছেদ ছেড়ে দিয়ে পরের দিকের একটা পরিচ্ছেদ অনেক সময় লিখি।

১৯২৬ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'হরিলক্ষ্মী'। এই বই-খানার মধ্যে বিখ্যাত 'মহেশ' গল্পটি আছে। 'মহেশ' সম্পর্কে একটি বলবার মতো খবর—গল্পটি পড়ে মার্জিনে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "A wonderful style and a great creative artist with a profound emotional power."

১৯২৬ সালের অগস্টে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করেছে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন: "পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্নমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি।" কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই প্রার্থনা নিষ্ফল হয়েছে; রবীন্দ্র-নাথ কোনও প্রতিবাদ করতে রাজী হননি।

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রোম্যাঁ রোলাঁর মতে শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে, লিখেছেন: "রল্যাঁ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের ইংরেজী

অনুবাদের ইটালীয় অনুবাদ পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তিনি আর কি কি বহি লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৭ সালের ২৩ অগস্ট, লিখেছেন : "শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়; সেইজন্য তাঁর গল্পসাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প-বলার সর্বজনীন আদর্শটাই ফলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে।"

১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব' আর 'ষোড়শী' ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ); ১৯২৮ সালে 'রমা' ('পল্লীসমাজে'র নাট্যরূপ)।

প্রমথ চৌধুরী, ১৯২৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, বলেছেন : "এই বিংশ শতাব্দীতে যে সকল নব সাহিত্যিক বাঙলায় আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ গুণী, সে সম্বন্ধে বোধ হয় সকল সাহিত্যিক পাঠক-সমাজের সঙ্গে একমত। অন্ততঃ আমার নিজের মত যে তাই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই।" ('ভারতবর্ষ', কার্তিক, ১৩৩৫, পৃ. ৭৯৮-৯৯)

১৯২৯ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত 'তরুণের বিদ্রোহে' শরৎচন্দ্র বলেছেন : "আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবনসমস্যার আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্ম্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবন্ধ ক'রে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে চাইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্ম্মীর, সাহিত্যিকের নয়।"

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩১ সালে। 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ১৭ মে, দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছে; শেষাংশ-টুকু উদ্ধার করি : "...'শেষ প্রশ্নে'র রচয়িতা শরৎচন্দ্রের কথা ভাবিতে গিয়া কল্পনাচক্ষে জাগে—বিষয়বিরাগী মহাদেবের ছবি। সাহিত্যের এই কাল-ভৈরব অত্যন্ত সহজে ও হেলাভরে মুঠি মুঠি রত্ন বিলাইয়া চলিতেছেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার কোনো আসক্তি নাই। ভালোর প্রতিও যেমন লোভ নাই, মন্দের প্রতিও তেমনি ঘৃণা নাই। তাঁহার সাহিত্য এই নির্দ্বন্দ্ব নিরাসক্ত মনের সৃষ্টি।"

'শেষ প্রশ্ন', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'ভাল বই, অসাধারণ ভাল বই।'

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "শরৎবাবুর অনেক বইয়ে দেখা যায় তাঁর দরদ মানুষের প্রতি, বিশেষ করে এই বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, আর্টকে ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি যে দরদ-সর্বস্ব লেখক নন, আর্টের মর্য্যাদাও যে তিনি বোঝেন, শেষ প্রশ্ন তা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করেছে। শেষ প্রশ্নের রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ কলাসম্মত ও গভীর।"

হিজলীতে রাজবন্দীরা 'শেষ প্রশ্ন' পড়তে চেয়েছেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট রাজী হয়নি। 'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ৮ জুন, লিখেছে: "বন্দিশালায় শেষ প্রশ্নের স্থান কেন হইবে না তাহা বুঝা যায় না। কারণ, সমাজসমস্যা নিয়া যে বইখানা লেখা তাহার এমন দুর্দ্দশা কেন? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্য এদিকে একটু খেয়াল করিবেন কি?"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলের পর অনেক-দিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্পসাহিত্যে আরেকটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দ্দা উঠল। সেদিন যেমন ভীড় ক'রে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণকর্ত্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় ক'রে জাগিয়েচেন সে হচ্চে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেচেন বিস্তৃত করে স্পষ্ট করে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উৎঘাটিত ক'রেচেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল! তাদের আনাগোনাও চ'লচে। একদিন তা'রা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাঁকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভুলে তবে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। তাও যদি হয় তাতে দুঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে সেইটেই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতাটা উপরি পাওনা মাত্রই; না জুটলেও নালিশ না করাই ভাল। নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ সবশেষে যার পালা তিনি যদি বা দলিলগুলোকে রক্ষা করেন স্বত্বাধিকারীকে পার ক'রে দেন বৈতরণীর ওপারে।" ('নবশক্তি', ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩১, পৃ. ৪)

লণ্ডন থেকে 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট', ১৯৩২ সালের ১১ ফেব্রুআরি, লিখেছে:

"The Oxford University Press has published "Srikanta", by an admirable living Bengali writer, Saratchandra Chatterji. For proof of Sarat Babu's imaginative strength let the reader try the escapade of the two boys on the midnight Ganges. One paragraph will show the quality of both the author and his skilful translator, Mr. K. C. Sen:—

Sunday 15 January, 1933

Beng. : 2 Magh, 1339

Sam : 4 Magh (Budee) 1989 Fas : 4 Magh 1340

[illegible]

ডায়েরির পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্র হিসেব রেখেছেন

In a few moments the darkness had closed in upon us. All that could be discerned were the swollen waters, immense and dim, flowing in parallel lines on the right and left, and buoyed up between, the swift little canoe and the two boys in it. Everything else was blotted out. I had not then reached the age at which I could realize the solemn immensity of this aspect of Nature, but have not forgotten to this day what I saw on that night. It was the vast incarnate form of midnight gloom that shaped itself before my eyes, still and silent without the stir of a breath, lonely and companionless as death itself. Dark masses of her hair covered the earth and the heavens, and through the intense gloom, flashing from the limitless currents which shot out like enormous glistening rows of teeth appeared a dim phosphorescence, sinister and malevolent, like a hard mocking smile half-suppressed. Here a rushing current would suddenly strike against the bed of the river and, rising, burst into foam; there cross-currents would meet, and dashing together create a whirlpool. And all about us were mad unimpeded masses of furious sweeping water."

১৯৩২ সালের অগস্টে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'স্বদেশ ও সাহিত্য'।

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র বাঙালা-সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন। মানুষের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় ঘটিয়েছেন। বইয়ের পাতায় নায়ক নায়িকারা আগে ছিলেন বইয়েরই জগতের লোক, বইয়ের দেশে ছিল তাঁদের বাড়ী; অবাস্তব মেঘরাজ্যে তাঁরা ছিলেন স্বপ্নবিহারী। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আরও ঘনিষ্ঠ আরও অন্তরঙ্গ ভাবে, তাদের পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা এমন কি দৈনন্দিন আহার বিহারের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটল। বইয়ের দেশে বিচরণকারী অলৌকিক প্রাণী থেকে তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন পৃথিবীর মাটির রক্তমাংসের জীব, আমাদের বুকের স্পন্দনের সঙ্গে তাঁদের বুকের স্পন্দনের যোগসূত্র স্থাপিত হল, তাঁদের আমরা চিনি জানি। দুঃখ-দৈন্য নিপীড়িত জীবনের পথে পথে এ'দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সত্য ও নিত্য। তাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারী আমাদের সুপরিচিতও বটে, অতি প্রিয়ও বটে; তাই তাদের সুখ-দুঃখ আমাদের বুকের রক্তে দোলা দেয়, কেননা তারা আমাদেরই আপনার জন। সাহিত্যে এই নব-নীতির প্রবর্ত্তন করলেন শরৎচন্দ্র। কথাসাহিত্যে নব-পন্থতির জনক তিনি।"

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন :

"আমাদের বাঙালী-জীবনের বাস্তবতাকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙলাসাহিত্যের যে-দিকটী তিনি ফসলগুচ্ছে সাজাইয়াছেন, তাহার রসসমৃদ্ধির তুলনা পাওয়া কঠিন। আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে যে এত মাধুর্য্য তাহা কে কবে জানিত, এমন রসানুভূতির দৃষ্টি লইয়া কে কবে আমাদের জীবনের দিকে তাকাইয়াছিলাম? আমাদের সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তো আমাদের চিরকালের পরিচয়, তাহার সুখ-দুঃখ তো আমরা প্রতিদিন ভোগ করি, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন নিবিড় রসানুভূতির সঞ্চার যে সম্ভব, সুখদুঃখের মাধুর্য্য যে এত বেশী তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, না, আমাদের মনের অনুভূতির অলিগলি যে এত সূক্ষ্ম ও জটিল সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল? বস্তুতঃ, উপন্যাসের বাস্তব ঘটনাপর্য্যায়ের মধ্যে এমন তীব্র হৃদয়াবেগের সঞ্চার, এমনি সুতীক্ষ্ম অনুভূতির প্রেরণা এবং সর্ব্বোপরি কি চরিত্র, কি ঘটনাবস্তু সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভাবের মোহে ও ভাষার জালে এমন মাদকতার সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের আগে বাঙলাসাহিত্যে আমরা কমই দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্রই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম না হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি ও সাহসে আমাদের চিত্তের খেয়াল ও সংস্কারকে, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলাকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া নামাইলেন, এবং আমাদের জীবনের অনেক গোপন অলিগলির লজ্জা ও দৈন্য ঘুচাইলেন।

শরৎচন্দ্রের কথা বলিবার ভঙ্গীটিও সুন্দর ও মধুর, খুব সহজ (direct) সরল (sincere) ও স্বাভাবিক। তাহার একটী লঘুগতি আছে, কিন্তু তাহা চপল ও চটুল নহে। দুর্জনার কথাবার্ত্তা যেখানে, সেখানেও বলিবার ভঙ্গী বুদ্ধি ও অনুভূতিতে উজ্জ্বল ও সরস, কিন্তু তীব্র ও প্রখর নহে। কথাবার্ত্তার মধ্যে উজ্জ্বল হাস্যরসের কিছু প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু সরস রসিকতার লঘু হাসির আনন্দ আছে, এবং তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনার ভঙ্গীটিও খুব অভিনব; এমন ঘরোয়া অথচ সরল ও সরস করিয়া ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা করিবার শক্তি খুব সহজ শক্তি নয়। এই কথার ভঙ্গী, এই বর্ণনার ভঙ্গী, ভাষার সহজ লঘুগতি, শব্দের সহজ অনাড়ম্বর সব কিছু লইয়া তাহার যে 'ষ্টাইল' সে যেন এক নূতন সৃষ্টি, নূতন রূপ।"

প্রমথ চৌধুরী সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় তিনি লিখেছেন : "আমরা নিত্য বলি, সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম্ম হ'চ্ছে—পাঠককে আনন্দ দান করা। আর লোকপ্রিয় সাহিত্য যে বহু লোককে আনন্দ দান করেছে—সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। শরৎ-সাহিত্যের বহু নিন্দাও শুনেছি; বহু প্রশংসাও শুনেছি। কিন্তু সমালোচকদের সেই নিন্দা-

প্রশংসা অতিক্রম ক'রে, এ সাহিত্য লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সে সাহিত্য বহু লোকের মনকে স্পর্শ ক'রেছে এবং উৎফুল্ল ক'রেছে। যে সাহিত্য নিজগুণে লোক-সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তার সম্বন্ধে সমালোচক আর বেশি কি ব'লতে পারেন?"

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব'; ১৯৩৪ সালের মার্চে 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ'।

'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট,' ১৯৩৪ সালের ২৯ মার্চ, লিখেছে :

"After Tagore has come Saratchandra Chatterji, a novelist who has not Tagore's range or his personal quality, but can tell a story and has a rich experience on which to base it, and an interest in the unpoetical life of to-day...."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৩৪ সালের ১ জুলাই। সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সেদিন বিজ্ঞাপিত হল যে ২৭৪ ভোট পেয়ে শরৎচন্দ্র পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন :

"ধন্য শরৎচন্দ্র! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কোথা হইতে অবতীর্ণ হইলে? বাস্তবিক তোমার মত একজন লেখকের বড়ই প্রয়োজন ছিল। সামাজিক ব্যাধি ও দুর্নীতি প্রভৃতি অঙ্কিত করিবার জন্য তুমি যে তুলি ধরিয়াছ তাহা অতুলনীয়। তুমি কখনও ধর্ম্মমতের ইতর ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ কর না। অথচ কুপ্রথার উপর কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নও। তোমার লেখা মর্ম্মস্পর্শী, অন্তস্তল পর্যন্ত প্রবেশ করে— character [চরিত্র] গুলির সঙ্গে এক হইয়া যাই। তোমার আর এক বিশেষত্ব এই যে তাদের সুখ দুঃখ পাঠকেরই। অনায়াসলব্ধ (facile pen), কোন কষ্টকল্পনা নাই।—character drawn from every-day life [দৈনন্দিন জীবন হইতে চরিত্রগুলি আহৃত]।

কিন্তু ভয়ে তোমার বই কাছে রাখি না—পাছে নেসা সম্বরণ করিতে না পারি।"

এই লেখাটুকু প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে—১৩৬৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপর শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা।

মনোজ গুপ্ত নামে একজন কলেজের ছাত্র শরৎচন্দ্রের কাছে এসেছে, খেয়াল হয়েছে অটোগ্রাফ নেবে। শরৎচন্দ্র আপত্তি করলেন না। যে-পাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সই দিয়েছেন, সেই পাতায়ই নিজের নাম সই করলেন।

মনোজ গুপ্ত বলল—একেক পাতায় একেকটা অটোগ্রাফ রাখবার ইচ্ছে ছিল।

শরৎচন্দ্র বললেন—আচার্যদেবের তলায় নাম লেখার মধ্যে বেশ একটা গৌরব

আছে, তার আকর্ষণ কাটাতে পারলাম না।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে 'স্যর' খেতাব দিয়েছে। তিনি ওই খেতাব নিয়েছেন। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি তাঁর (শরৎচন্দ্র) শ্রদ্ধাভক্তি কারও চেয়ে কম ছিল না। আচার্যদেবের গভীর দেশপ্রেম, স্বদেশীপ্রচারের জন্য তাঁর সারা জীবনের নিরলস প্রচেষ্টা, দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তাঁর জীবনব্যাপী গোপন দান, তাঁর ঋষিকল্প চরিত্র, তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা প্রভৃতির শতমুখে মুগ্ধকণ্ঠে তিনি প্রশংসা করতেন। কিন্তু কত-বার ব্যথিতকণ্ঠে তিনি বলেছেন "চাঁদেও কলঙ্ক রয়ে গেল। ওঁর উচিত ছিল স্যর টাইটেলটা ত্যাগ করা। ও'র মত অত বড় পেট্রিয়ট যে টাইটেলটা ছাড়লেন না এর ব্যথা আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না।"

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' ('দত্তা'র নাট্যরূপ); ১৯৩৫ সালে 'বিপ্রদাস'।

শ্রীঅরবিন্দ, ১৯৩৫ সালের মার্চে, লিখেছেন : "What is stamped on Saratchandra's work everywhere, is a large intelligence, an acute and accurate observation of men and things and a heart full of sympathy for sorrow and suffering. Too sensitive to be quite at ease with the world and also perhaps too clearsighted. Much fineness of mind and refinement of the vital nature."

"The latest of the leaders who..."— রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৫ সালের মার্চে, লিখেছেন— "has guided Bengali novels nearer to the spirit of modern world literature is Saratchandra Chatterji."

জীবনে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র কেবল প্রশংসাই পাননি, নিন্দিতও হয়েছেন। কালিদাস রায় লিখেছেন :

"তাঁর সাহিত্যসেবার বিরুদ্ধে এদেশে কত অভিযানই না হয়েছিল—চারদিক থেকে কত নিন্দাবাণই না বর্ষিত হয়েছিল! তাতে তিনি কোন বেদনা যে পান নি তা আমি বলছি না। তবে সকল ক্ষেত্রেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। মহাকালের ও মহামানবের বিচারের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় নিয়ে তিনি কখনও উষ্মা প্রকাশ করেন নি—উত্তর দেওয়ার জন্য অথবা আত্মসমর্থনের জন্য কখনও লেখনী ধারণ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর অনুরাগী ভক্তের তো অভাব ছিল না—তা সত্ত্বেও কখনও তাদের এ শ্রেণীর আক্রমণের জবাব দেবার জন্য, প্রত্যাঘাত করবার জন্য আদেশ বা অনুরোধ করেন নি। আমরা অনেক সময় বলেছি—"এই আক্রমণের কি আমরা একটা জবাব দেব?" তিনি উত্তর দিয়েছেন—"পাগল নাকি? জবাব দিয়ে তুমি ঐ আক্রমণটির ইমপর্ট্যান্স বাড়িয়ে আমারই অপমান করবে? এ সকল দোষারোপের কোন জবাব দিলে তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ

বিপ্রদাসের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার অংশ

থাকবে না। এরা একটু ব্যস্তবাগীশ, মহাকাল কবে বিচার করবেন, তার ভরসায় বসে থাকতে চায় না। এরা চায় এদের বিচারটাই মহাকাল মাথা পেতে নিন!"

যারা একদিন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল—তাদের অনেককেই তাঁর গৃহে বসে স্নেহ ও বান্ধবতা লাভ করতে দেখেছি। ক্ষমাশীল শরৎচন্দ্র সব ভুলে যেতেন। তিনি বলতেন—"কদিনের জীবন ভাই, এই স্বল্পায়তন জীবনে লোকের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ কি রাখতে আছে?" বিরুদ্ধবাদীরা আনুগত্য করলে তিনি বলতেন—"যে মানুষ অপরাধ করেছিল সে মানুষ তো আর নেই—রাগ করব কার ওপর? আর অপরাধটা আমারও তো কম হয় না।"

শরৎচন্দ্রের কাছে যাঁদের কৃতজ্ঞ থাকবার কথা এমনও কেউ কেউ তাঁর রচনার গ্লানি প্রচার করেছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলতেন—"দেখ, কৃতজ্ঞতা মানুষের একটা প্রধান অঙ্গ। কৃতজ্ঞতা বিধাতার বড় একটা দান। বিধাতা যাকে সকল দান থেকে বঞ্চিত করেছেন তাকে অত বড় দানটা কি করে দেবেন, বল।"

আমি বললাম—"যারা আপনার লেখার ওপর দশ বছর ধরে দাগা বুলিয়ে লিখতে শিখেছে, আর যা হোক তাদের উচিত নয় আপনাকে ব্যঙ্গ করা।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"আরে তুমি যে উল্টা বুঝলে। তারাই তো ব্যঙ্গ করবে—তাদের তো প্রচার করতে হবে যে ঋণী নই, পাছে ঋণ ধরা পড়ে।"

আমি বললাম—ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে।
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

শরৎচন্দ্র বললেন—"বাঃ বাঃ বেশ কথাটি তো। এ কার লেখা? এ তো রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের তো?"

আমি সম্মতি জানালে তিনি বললেন—"অনেক দুঃখেই লিখেছেন হে।"

বিরুদ্ধবাদীদের নিয়ে এর বেশী কথা তাঁর মুখে কখনও শুনি নি।"

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎবাবুকে একটা 'অনারারী ডিগ্রী—ডি. লিট' দেওয়া হয় আমি সেজন্য চেষ্টা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইরূপ সম্মান দিলেই সেটা সুশোভন হত, কিন্তু তা যখন হোল না তখন অন্তত বাংলার একটা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে তাঁর গুণের উপযুক্ত সম্মান করে সেইজন্যই আমি এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলাম।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণ কর্লেন।... "

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শরৎচন্দ্রকে 'ডি. লিট.' উপাধি দেবে। খবর পাওয়া গেল, এই উপলক্ষে কনভোকেশনের সময় শরৎচন্দ্র ঢাকায় আসবেন।

শরৎচন্দ্র ঢাকায় আসবেন শুনে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁকে সংবর্ধনা

করবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ব্যবস্থা করেছেন যে, শরৎচন্দ্র যেদিন ঢাকায় পোঁছবেন সেদিনই জগন্নাথ হলে ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা করা হবে। শরৎচন্দ্র রাজী হয়ে চিঠি লিখেছেন রমেশচন্দ্রকে এবং সমস্ত ব্যবস্থার ভার তাঁকেই দিয়েছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের আসবার ঠিক আগের দিন, খবর পাওয়া গেল—নারায়ণগঞ্জের একদল সাহিত্যিক স্থির করেছেন যে তিনি স্টীমার থেকে নামলেই তাঁকে নিয়ে গিয়ে একটা সভা করবেন। যদিও শরৎচন্দ্র নারায়ণগঞ্জের কাউকে কোনও কথা দেননি, কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বদ্ধমূল বিশ্বাস, তিনি নারায়ণগঞ্জের অনুরোধ এড়াতে পারবেন না। তাহলে এদিকে সব গোলমাল হয়ে যাবে। অতএব ওটা বন্ধ করা দরকার।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন অধ্যাপক একদল বাছাই ছাত্র নিয়ে নারায়ণগঞ্জ গেলেন। স্টীমার থেকেই শরৎচন্দ্রের চারদিকে ব্যূহ রচনা করে তাঁকে নামিয়ে মোটরগাড়িতে তুলে একেবারে ঢাকায় নিয়ে এলেন।

শরৎচন্দ্র ঢাকায় এসেই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রীকে বললেন—আজ থেকে তোমার স্বামীকে আমি বলব গুণ্ডা। কারণ ঠিক গুণ্ডার মতোই আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে।

তারপর থেকে শরৎচন্দ্র সত্যিই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে 'গুণ্ডা' বলে ডাকতেন।

১৯৩৬ সালে শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি. লিট.' উপাধি পেয়েছেন। 'ভারতবর্ষ', ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে, লিখেছে: "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে সম্মানিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতাস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় এখনও এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করেন নাই। ইহা বাস্তবিকই একান্ত পরিতাপের বিষয়।"

স্বাস্থ্য ভালো নয়। শরৎচন্দ্র সেবার ঢাকায় মোহিতলাল মজুমদারকে বলেছেন—মোহিত, আমি মৃত্যু কামনা করি, আমার আর এতটুকু বাঁচতে ইচ্ছা নেই।

অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন: "মুখুজ্যেমশাই ছিলেন শরৎচন্দ্রের ভগিনীপতি। জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনিলা দেবী—যাঁর ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য' বেরিয়েছিল—তাঁরই স্বামী। নাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বাড়ী গোবিন্দপুর, শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর প্রায় আধমাইল উত্তরে। অতি ভদ্র, সদালাপী, সরল মানুষ ছিলেন তিনি। শরৎচন্দ্র তাঁকে কত যে শ্রদ্ধা করতেন তা বলা যায় না। পক্ষান্তরে পঞ্চানন বাবুও 'শরৎ' বলতে অজ্ঞান হতেন। প্রত্যহ সকালে তিনি তাঁর শরতের বাড়ীতে এসে হাসি-তামাশায় অন্ততঃ দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে

যেতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রও তাঁর মুখুজ্যেমশাইয়ের বাড়ী গিয়ে দিদির আদর খেয়ে না এলে স্বস্তি বোধ করতেন না।...”

একটি খাতার মলাটের ভিতরপিঠ থেকে শরৎচন্দ্রের লেখা কয়েকটি লাইন অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার উদ্ধার করে এনেছেন :

“মুখুজ্যেমশাই মারা গেলেন
১০ই অঘ্রাণ ১৩৪০, রবিবার রাত্রি ৩॥
একটা বছর তিনি একান্তমনে মৃত্যুকে ডাকছিলেন
আজ প্রার্থনা তাঁর মঞ্জুর হোলো।
কি জানি আমার আবেদন কবে গ্রাহ্য হবে?”

‘রসচক্র’ নামে একটি সমিতির কথা মনে পড়ে। গোড়ার দিকে এই সমিতির কোনও সভাপতি ছিল না, শরৎচন্দ্র ‘রসচক্রে’র প্রথম সভাপতি। “রসচক্র প্রধানতঃ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। মৈত্রী মিলনই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্যের কথা ছিল গৌণ।” মৃত্যুর দেড় বছর আগে শরৎচন্দ্র একদিন ‘রসচক্রে’ বলেছেন—অনেক কিছুই লেখবার ইচ্ছে ছিল, মনে মনে কত যে প্লট তৈরী হয়ে আছে তা আর কি বলব। আজকালকার সাহিত্যিকদের মত তো আমার কলম দ্রুত চলে না যে তিনদিনে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলব। আমি বড় ঢিমে লেখক, প্রত্যেক লাইন ওজন করে করে কেটে কেটে লিখি। মনে প্রফুল্লতা না এলে, ইনস্পিরেশন না এলে কলম একেবারে এগোয় না। মনে ইচ্ছা থাকলে কি হবে, শরীর আর বয় না, সামর্থ্যে আর কুলোয় না, মনঃস্থির করতে পারি না। আর আমার দ্বারা কিছু হবে না হে। মৃত্যুর ডাক এসেছে, তার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছি। যথেষ্ট লিখেছি, আর না পারলেও দেশ আমাকে ক্ষমা করবে।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকের কথা।

শরীর বড় বেশী খারাপ হয়ে পড়েছে। অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার।

সামতাবেড়ের বাড়ি থেকে পালকিতে উঠলেন শরৎচন্দ্র। পিছু পিছু সুরেন্দ্রনাথ হেঁটে চললেন।

স্টেশনে এসে সুরেন্দ্রনাথ বললেন—তোমার সেকেণ্ড ক্লাশ। আমরা থার্ডেই যাব।

শরৎচন্দ্র আপত্তি করে বললেন—তা কি কখনও হয়? সবাই চলো ইণ্টারে—গোপালও। ওকে তফাত করে কটা পয়সাই বা বাঁচাবে।

গোপাল শরৎচন্দ্রের ভৃত্য।

ট্রেন এলো। সকলে সুস্থির হয়ে বসতে না বসতে একটি ছোকরা হইহই করে উঠল—ইস শরৎবাবু! এ কি-ই-ই চেহারা হয়েছে আপনার!

শরৎচন্দ্র অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

কিন্তু ছোকরাটি নাছোড়।

শরৎচন্দ্র তখন একটু হেসে বললেন—ওহে, আমার নিজের চেহারা দেখার জন্যে, নিদেনপক্ষে আমারও একখানা ভাঙা আরশি থাকা সম্ভব। ওরকম হইহই করার দরকার কি? মানুষের অসুখ হলে সে জানতে পারে। মাথায় হাতুড়ি ঠুকে তাকে জানিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না।

ছোকরা চুপ।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামল। একজন ডাক্তারবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছেন, শরৎবাবু?

শরৎবাবু বললেন—কেমন দেখছেন?

—আগের চেয়ে ইমপ্রুভড।

ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—দেখছ? ইনি জাত-ডাক্তার!

লজ্জা পেয়ে ছোকরাটি গাড়ি থেকে নেমে গেল।

যথাসময়ে বালিগঞ্জে নিজের বাড়িতে পৌঁছলেন শরৎচন্দ্র।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে বললেন—চলো, একটু ঘুরে আসি। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকলে আরও মন খারাপ হয়।

ঘোরা মানে কিছু টাকার শ্রাদ্ধ। অদরকারী জিনিস কেনা। বারণ করলে শরৎচন্দ্র শোনেন না। সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বিস্তর খুঁটিনাটি জিনিস কিনলেন। একটা বিলিতী স্টীলের কুড়ুল পর্যন্ত।

কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে আটটায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র আর কুমুদশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এলেন।

—ব্যাপার কি শরৎবাবু? আবার কি বাধিয়ে বসলেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—এবার ম্যালেরিয়া নয়, উদরী।

—কেন? কী খাচ্ছিলেন?

—তপসে মাছ।

—তাই! ডাক্তারদের না পাঠিয়ে নিজে উদরসাৎ করছিলেন? হিঁদুরা তাই তো ভোগরাগের ব্যবসা করে খেত সেকালে। দেখি, জামাটা খুলে ফেলুন।

এদিক-ওদিক টিপে-থাবড়ে বললেন—কিংকিংস।

বলেই দুজন ডাক্তার উধাও হয়ে গেলেন।

এক্সরে করা হল।

মাদ্রাজে, ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর, মেডিক্যাল কনফারেন্স আরম্ভ হবে। দিনকয়েকের জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র ও কুমুদশঙ্কর রায় সেখানে যাবেন।

মাদ্রাজ যাওয়ার আগে একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ডাক্তারদের জমায়ত হল।

শরৎচন্দ্র ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে বললেন—যদি কেউ অপারেশন করেন তো আপনাকেই করতে হবে। আমি যদি মরি তো আপনার হাতেই মরতে চাই।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র হাসলেন। বললেন—তবে শুয়ে পড়ুন। কাজটা সেরে দিয়ে চলে যাই।

বলে নতুন কেনা বিলিতী স্টীলের কুড়ুলখানা তুলে নিয়ে ডাক্তার বিধান-চন্দ্র বললেন—শুয়ে পড়ুন। কাজটা শেষ করে দিয়ে যাই।

সকলে হেসে উঠলেন।

দিনকয়েকের জন্য ডাক্তারবাবুরা মাদ্রাজ চলে গেলেন।

১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর। শরৎচন্দ্র গভীর রাত্রে সুরেন্দ্রনাথকে বললেন—শোনো একটা গান : শেষ পারাণির কুড়ি, আমি কণ্ঠে নিলাম গান। আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব—তাই তোমায় গান শোনাচ্ছি।

ডাক্তার ম্যাকে সাহেবকে নিয়ে আসা হল একদিন। তিনি পরীক্ষা করে বললেন—বাড়ি থেকে এ'র চিকিৎসা চলতেই পারে না। তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলা দরকার।

১৯৩৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্র একটা সাহেবী নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। গদির উপর চিত হয়ে শুয়ে শরৎচন্দ্র পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। তাড়াতাড়ি একজন নার্স এসে মুখ থেকে সিগারেটটি টেনে নিয়ে মিহি গলায় বললেন—দিস ইজ নট অ্যালাউড হিয়া—

দিনকয়েকের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ফিরে এলেন ১৯৩৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর। সেদিন বিকেলেই শরৎচন্দ্রকে দেখতে গেলেন।

সাদা খাটে সাদা বিছানায় শরৎচন্দ্র শুয়ে আছেন। উমাপ্রসাদকে দেখেই বললেন—তুমি এসেছ! এবার চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা হবে।

উমাপ্রসাদ কিছু বলবার আগেই নার্স এসে হাজির। হাতে গ্লুকোজ-জল-ভরা গেলাস।

শরৎচন্দ্র বললেন—এখন খাব না। পরে দিও।

নার্স শুনলেন না। নির্মম ভাষাভঙ্গিতে বললেন—খাবার সময় হয়েছে, খেতেই হবে।

শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

নার্সের হাত থেকে গেলাসটা চেয়ে নিলেন উমাপ্রসাদ। বললেন—আপনি দয়া করে একটু বাইরে যান।

নার্স রাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

উমাপ্রসাদ শরৎচন্দ্রের হাত ধরলেন। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে

লাগলেন। নিদারুণ রাগে শরৎচন্দ্রের ক্লান্ত শরীর কাঁপছে!

উমাপ্রসাদ আস্তে আস্তে বললেন—জলটুকু খেয়ে নিন।

শরৎচন্দ্র তাকালেন উমাপ্রসাদের মুখের দিকে। তারপর শান্ত গলায় বললেন—বেশ। খাব আমি। কিন্তু আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো। নইলে আমি নিজে চলে যাব।

উমাপ্রসাদ বললেন—সব দেখলাম তো আমি নিজের চোখে। এখানে থাকা আপনার সম্ভব নয়, এসেই বুঝেছি। কালই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে।

পরদিন পার্ক নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হল শরৎচন্দ্রকে। বাঙালী নার্সিংহোম।

এখানে একদিন ভাগলপুরের গঙ্গার গল্প করলেন। সাঁতার কেটে বর্ষার ভরানদী পারাপারের গল্প।

উমাপ্রসাদ বললেন—সেরে উঠুন, এবার আপনার সঙ্গে যাব সেখানে।

শরৎচন্দ্র হেসে উঠলেন। বললেন—ওরে, তোর আশা তো কম নয় রে! গঙ্গায় যাব নিশ্চয়, সঙ্গেও থাকবি। কিন্তু এ যে আমার শেষ যাত্রা।

উমাপ্রসাদ বললেন—চুপ করুন। বেশী কথা বলা নিষেধ।

পার্ক নার্সিংহোমে ডাক্তার বিধানচন্দ্র একদিন বিকেলের দিকে সুরেন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকে বললেন—শরৎবাবুর অপারেশন না হলে তিনি পরশু মারা যাবেন। অপারেশন করা চাই, কি বলেন?

মনে রাখা ভালো, ডাক্তার বিধানচন্দ্র কিংবা কুমুদশঙ্কর রায় কোনোদিন শরৎচন্দ্রের কাছে একটি পয়সাও ফী নেননি।

অপারেশন হল ১৯৩৮ সালের ১২ জানুআরি (বুধবার)। অপারেশন করলেন ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ভারতবর্ষ', ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে, লিখেছে :

"অন্তিম ঘনাইয়া আসিল। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র কোন কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, আগামী মাসের এই তারিখে আমাকে স্মরণ ক'রো ভাই! তিনি জানিতেন মৃত্যু নিশ্চিত। এমন অবস্থা হইল যে, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিবার শক্তিও আর নাই। অবশেষে চিকিৎসকগণ তাঁহার উদরের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া (জুজুনোষ্টমি) একটি রবারের নল পরাইয়া তাহারই সাহায্যে তরল খাদ্যবস্তু, কমলালেবুর রস, গ্লুকোজ ইত্যাদি প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন। খানিকটা সুস্থবোধ করিতেই শরৎচন্দ্রের সেই রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে হাসি দেখা গেল। হাসিয়া তিনি সুরেনবাবুর সহিত পরিহাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল, শরৎচন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থবোধ করিতেছেন। কাগজে কাগজে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র বঙ্গদেশে ও কলিকাতার

সকল সমাজের লোকের নিকট যে অতিশয় প্রিয় ছিলেন এই রোগের ভিতরেও তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। কোন্ এক ব্যক্তি ভুল সংবাদ শুনিয়া একখানা সংবাদপত্রের আপিসে গিয়া জানায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সেই কাগজখানার একটি 'বিশিষ্ট সংখ্যা' দুই ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জনসাধারণ এই আকস্মিক দুঃসংবাদে বিমূঢ় স্তম্ভিত। দেখিতে দেখিতে স্কুল, কলেজ, দোকানপাট, সাধারণ ও জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল, সংবাদটি ভুল। শরৎচন্দ্র যে সকলের কত প্রিয়, কত বড় আত্মীয়, জনসাধারণের অন্তরে তাঁহার মতো সাহিত্যিকের যে কতখানি প্রতিষ্ঠা তাহা উপরের ঘটনা হইতে ভাল করিয়া জানা যায়।

কিন্তু প্রদীপ নিভিবার আগে এমনি করিয়াই হয়ত চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। মাত্র তিনটি দিন তাঁহার অবস্থা মন্দের দিকে যায় নাই এই পর্যন্ত। নার্সিংহোমের বাহিরে জনসাধারণ কিছু আশ্বস্ত হইল বটে, সংবাদপত্রগুলিও দেশবাসীর উৎকণ্ঠা কতক পরিমাণে শান্ত করিল ইহাও সত্য, কিন্তু চিকিৎসকগণ তেমনি ম্লানমুখেই রহিয়া গেলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন যে রাহু রোগীর অন্ত্রস্থলে বাসা বাঁধিয়াছে সে অল্প অল্প করিয়া শরৎচন্দ্রকে গ্রাস করিবেই। নল বসাইয়া পাকস্থলীর ভিতরে খাদ্যবস্তু প্রবেশ করানো কতদিন ধরিয়া চলিতে পারে। ক্যান্সর নিরাময় করিবার কোনো ঔষধই আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, কোনো শাস্ত্রেই ইহার প্রতিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র। শুক্রবার রাতটাও একরূপ করিয়া কাটিয়া গেল। কিন্তু শনিবার সকাল হইতেই ঝড় উঠিল। ভিতরের অশান্ত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া পাক খাইয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষীণপ্রাণ রোগী কাতরোক্তি করিতে থাকেন। তখন সেই কণ্ঠে ভাষা কিছু নাই, কেবল আছে শব্দ। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পেট ফুলিয়া উঠে, অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহাকে অতিশয় কাতর দেখা যায়। যে সংযম ও সহনশীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ, এই নিদারুণ অন্তিমকালে তাঁহার সেই শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লয়। শনিবার রাত্রে তিনি আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। অত্যধিক যন্ত্রণাও তাঁহার মরণের অন্যতম কারণ। চিকিৎসকগণ চঞ্চল হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে থাকেন।

কিন্তু যন্ত্রণা বাড়িয়াই চলিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শরৎচন্দ্রের কাতর আর্ত্তনাদ শুনা গেল।..."

শরৎচন্দ্রের মুখের শেষ কথা—আমাকে—আমাকে দাও, আমাকে দাও।

অন্তিমকালে কার কাছে তিনি কী চেয়েছেন কে জানে।

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুআরি, ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ সালের ২৬ জানুআরি, 'শরৎচন্দ্র' নামে একটি চৌপদী লিখেছেন :

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'॥"

১৯৩৮ সালের মার্চে 'শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ' নামে একখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। "বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র ছাত্রগণের অনুরোধে বিভিন্ন কলেজে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি একত্রিত করে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল।"

১৯৩৮ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলার গল্প'; ১৯৩৮ সালের জুনে 'শুভদা'।

শরৎচন্দ্র শেষকালে সুরেন্দ্রনাথকে বলতেন—আমাকে 'শেষের পরিচয়'টা শেষ করার সময়টুকু করে দাও। আমি ছাড়া এর শেষ আর কেউ করতে পারবে না।

কিন্তু এই উপন্যাসখানা শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি, পনর পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে রেখে গেছেন; বাকি অংশ লিখেছেন রাধারাণী দেবী। 'শেষের পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৯ সালে।

১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী'। ইতিপূর্বে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কিন্তু সাময়িকপত্রে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের অনেক রচনার সংগ্রহ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত। ব্রজেন্দ্রনাথ নিবেদন করেছেন :

"বাংলা দেশে রবির আবির্ভাবের পনর বৎসর পরে শরৎচন্দ্রের উদয়, এবং রবি অস্তমিত হইবার সাড়ে চার বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন; অর্থাৎ শরৎ চন্দ্রের যুগ বৃহত্তর রবীন্দ্র-যুগেরই সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও শরৎ চন্দ্রের সাধারণজনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। শরৎ চন্দ্রের গল্প-বলার ভঙ্গীতে ও ভাষায় অপূর্ব্ব যাদু ছিল। তিনি কথাসাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

কিন্তু সেইখানেই তাঁহার পরিচয়ের শেষ নয়। তিনি ছিলেন মনীষারও অধিকারী, তাঁহার মননশীলতার পরিচয় তাঁহার লিখিত 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য', 'তরুণের বিদ্রোহ' পুস্তকে ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে সুপরিস্ফুট। কেবল কথা-সাহিত্যিকরূপে নহে, প্রবন্ধকাররূপেও তিনি বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবী করিতে পারেন।"

অনেক আগেই বলা উচিত ছিল, শরৎচন্দ্র তিনখানা বারোয়ারি উপন্যাসের অন্যতম লেখক : 'বারোয়ারি উপন্যাস'; 'রসচক্র'; 'ভালমন্দ'।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের নাম সোনার অক্ষরে জীবন্ত হয়ে আছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "বাঙালীর কাছে তাঁর উপাধি নিষ্প্রয়োজন—কুলপরিচয় বাহুল্য, তিনি বর্ত্তমান থাকতেই তাঁর নামের শ্রী বাদ দিয়েছিল বাঙালী—তিনি সর্ব্ববাহুল্যবর্জ্জিত আত্মশক্তির গরিমায় মণ্ডিত হয়ে শরৎচন্দ্র নামেই বাঙালীর হৃদয়ে আসন লাভ করেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটা যুগ।"

স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন :

"একদিন শরৎচন্দ্র আমাদের নিকট তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্র বলেন, তিনি গরীবের ছেলে ছিলেন, বই কিনিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না, সমপাঠিদের নিকট হইতে ধার করিয়া বই আনিয়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিয়া তাহা ফিরাইয়া দিতেন, যেন সে বই আর চাহিতে না হয়। তাহাতে তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ম হইয়াছিল। তাহার ফলে যে দৃশ্য তিনি একবার দেখিতেন, যে চরিত্র একবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাহা মনের ভিতর পুঁজি করিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

কিন্তু ইহাই শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র কারণ নহে। ভাষার উপর তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার কখন কখন দরকার হয় বটে; কিন্তু যে ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করে সেই ভাষায় তিনি অপরাজেয় ছিলেন। এণ্ডারসন সাহেব বিলাতের 'টাইমস পত্রিকার' দেড় কলম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "ছোটবুলী" লিখায় শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঠকের উপর তিনি ইন্দ্রজালের মত প্রভাব বিস্তার করিতেন। শরৎচন্দ্রের লেখা চন্দ্রকিরণের মতই স্নিগ্ধ শীতল ছিল। তাহার ভিতর মদিরা ছিল না, ঘরের কথার মতই তাহা শীতল ছিল।..." ('বাতায়ন', শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, পুনর্মুদ্রিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১১ মার্চ ১৯৩৮, পৃ. ৩৯)

কিন্তু শরৎচন্দ্র কি কেবল একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক? না। সুভাষচন্দ্র বসু যথার্থ বলেছেন : "একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্ব্বোপরি আদর্শ মানব।"

সাহিত্যের চেয়ে মনুষ্যত্বকে শরৎচন্দ্র অনেক বড় মনে করেছেন। বলেছেন—সাহিত্যিক বড় হও না হও, মানুষ বড় হও!

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তর কথা ও কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। কিছু কথা ও কাহিনী শুনে রাখা ভালো।



শরৎচন্দ্রের সঙ্গে
'ষোড়শী'র নায়িকার সাজে চারুশীলা



শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'বিজয়া'র রাসবিহারীর সাজে শিশিরকুমার ভাদুড়ী

॥ এক ॥

'কাণা' নামে শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় কুকুর ছিল। কাণার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র ইংরেজীতে একটি কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতার দুটি লাইন তুলে দিচ্ছি :

"Poor Kana, thou art dead
Being long unfed!"

কিন্তু ভেলুর সঙ্গে কাণা কিংবা আর কারও তুলনা হয় না। সকলের উপরে ভেলু। বর্মায় নগদ আট আনা পয়সা দিয়ে ওকে কেনা হয়েছে। শরৎচন্দ্র ভেলুকে পরম যত্ন করেছেন।

আপিস থেকে কিছুকালের ছুটি নিয়ে ১৯১৪ সালে শরৎচন্দ্র সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছেন, ভেলুকেও সঙ্গে এনেছেন। মাসকয়েক বাদে শরৎচন্দ্র একাই রেঙ্গুন চলে গেলেন। কিছুদিন পরে ভেলুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর রেঙ্গুন যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। জাহাজে ভেলুর ভাড়া লাগে।

১৯১৬ সালে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এসেছেন শরৎচন্দ্র। বাসা নিয়েছেন বাজেশিবপুরে।

বাজেশিবপুর থেকে শরৎচন্দ্র, ১৯১৯ সালের ১৪ অগস্ট, লিখেছেন : "দিন কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতে আচ্ছা ক'রে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালাল। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ! তাকেই আমি আমার 'ভেলু'র কবল থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। ভয়ে কাউকে ও কথা বলি নি, শুকিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে আবার যেন মনে হচ্চে ব্যথা হচ্চে।"

বিভূতিভূষণ ভট্টের মতে ভেলু একটা বিশ্রী কালো কুকুর। অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন : "ভেলু ছিল শরৎচন্দ্রের বড় পেয়ারের কুকুর। বেশ গোলগাল চেহারা। সাদায় কালোয় মেশান রং। কুকুরটি ছিল ভাল কিন্তু ভাল মানুষ নয়। প্রভু ছাড়া আর কারুর এমন কি প্রভু পত্নীরও—খাতির সে রাখতো না। শরৎচন্দ্র বসতেন আরাম কেদারায়, আর পায়ের নীচে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ভেলু থাকতো শুয়ে। পদযুগলের উপর ছিল তার সম্পূর্ণ অধিকার। পদধূলি নেবার ইচ্ছায় তার অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে সে মেজাজ হারিয়ে ফেলতো। প্রভু বাহিরে থাকলে সে বিমর্ষ হয়েই থাকত এবং আহারেও রুচি

থাকত না।”

বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে অনেকেই ভেলুর তাড়া খেয়েছেন। জলধর সেন বলেছেন : "যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করত, শরৎ-দর্শনপ্রার্থীবৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থে দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন। ভেলুর গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই বলতেন—'এই ভেলু!' আর অমনি মেষশাবকের মত দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসত। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালবাসতেন, তা আর বলতে পারি নে।”

রবিবার। জলধর সেনের চিঠি নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন মণীন্দ্রনাথ রায়। প্রথম দেখা। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নানারকম কল্পনা করতে করতে মণীন্দ্রনাথ বাজেশিবপুরে এলেন। মণীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বড় রাস্তা থেকে একটা সরু গলি দিয়ে গেলেই এই ছোট্ট বাড়ীটি। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই দরজা। তখন বোধ করি বেলা ৩টা—দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে কুকুরের ভীষণ ঘেউ ঘেউ শব্দ এলো—একজন চাকর দরজা খুলে দিলে—দেখি এক ভীষণাকার দেশী কুকুর—দেখলেই আতঙ্ক হয়। আমি ভয়ে এগোলাম না—একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমায় যেন কত পরিচিতের মতন বল্লেন, "তুমি ভেতরে এসো. ভেলো কিছু বলবে না. ও নতুন লোক দেখলেই অমনি করে।" বুঝলাম কুকুরটির নাম ভেলো। আমি কোনোরকমে ভয়ে ভয়ে ঘরের ভিতর গেলাম। কার্পেট পাতা—কোণে একটি বড় ফোল্ডিং টেবিল—দেয়ালের এক পাশে ছোট একটি ডেসক্। অনুমানে বুঝলাম ইনিই সেই সাহিত্যের যাদুকর।”

মণীন্দ্রনাথকে সামনে বসিয়ে শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে কথা-বার্তা বলতে লাগলেন। মণীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "ভেলো ইতিমধ্যে কোন সময় শরৎবাবুর ঠিক ধারটিতে এসে একেবারে কোলের কাছে ঘেঁসে বসেছে—যেন সে তাঁর কতই না আপনার জন। শরৎবাবু ভেলোর পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে আমায় বল্লেন, "এটি আমার বড় প্রিয়।" তারপর ভেলোকে সে কত আদর—তার মুখে মুখ দিয়ে কতই না কথা—সে আদরে আধ আধ ভাষা বোঝে শুধু ভেলো ও তার প্রিয় প্রভুটি।”

বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে সুধীরচন্দ্র সরকার একদিন ভেলুর কবলে পড়েছেন। মজার ঘটনা ঘটেছে বটে সেদিন। সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন : "আমাকে দেখে শরৎবাবুর প্রিয় কুকুর ভেলু এমন তেড়ে এল যে আমি প্রাণ-ভয়ে চেয়ারটাকে তক্তাপোষের উপর তুলে হাত-পা গুটিয়ে চেয়ারের উপর বসে আছি। এদিকে চৌকির নীচে ভেলু প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে চলেছে। খালি মনে হচ্ছে—এই বুঝি কামড়ালো। ভেলু যে পরিমাণ চিৎকার করছে,

আমি তার থেকেও গলাটা আরও একটু চড়িয়ে শরৎবাবুকে ডেকে চলেছি। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ভেলুকে নিরস্ত করে আমায় আশ্বস্ত করলেন।"

ভেলু তো দূরের কথা, রাস্তার কুকুরের উপরেও শরৎচন্দ্রের মায়ামমতার অন্ত নেই। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "পথের যত সব দেশী কুকুর—যাদের প্রতি কেউ কোনো দরদ প্রকাশ করে না—যারা নিরাশ্রয় যারা তাহাদের নিজেদের আহার্য নিজেরাই সন্ধান করিয়া লয়—তাহাদের প্রতি শরতের একটা বিশেষ আন্তরিক করুণা ছিল।"

শরৎচন্দ্র প্রথমবার ঢাকা গিয়েছেন ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে।

দিনকয়েক ঢাকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থেকেছেন শরৎচন্দ্র।

চারুচন্দ্রের বাড়িতে তখন দুটি কুকুর—একটি দেশী, আরেকটি বিলিতী। দেশী কুকুরটার দিকে কারও কোনও নজর নেই, পাঁচজনের পাতে যা পড়ে থাকে তাই তার জন্য বরাদ্দ। কিন্তু বিলিতী কুকুরটার খুব আদর-যত্ন, সময়-মতো তাকে নাওয়ানো-খাওয়ানোর নিপুণ ব্যবস্থা।

শরৎচন্দ্র যতদিন ঢাকায় চারুচন্দ্রের বাড়িতে থেকেছেন, প্রত্যহ খাওয়ার পর তিনি পাতের ভালো ভালো জিনিসগুলি নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওই দেশী কুকুরটাকে খাইয়েছেন। দেশী কুকুরটার উপর তাঁর এত পক্ষপাতিত্ব কেন?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছেন—ওকে তো তোমরা কেউ দ্যাখো না—ওর উপর তোমাদের অযত্ন আর অবহেলা আছে বলেই আমি ওকে ভালোবাসি। বিলিতী কুকুরটাকে তো তোমরা যত্ন-আদর করছই। সে-আদরের উপর আবার আদর কেন?

দেশী কুকুরটা খুব সবল আর তেজী; তার প্রতাপে বাড়ির বাগানের মধ্যে গরু-ছাগল সহজে ঢুকতে পারে না।

একদিন দুপুরবেলা। বাগানের উপরদিকের বারান্দায় শরৎচন্দ্র বসে আছেন। চারুচন্দ্রও আছেন কাছে।

হঠাৎ একটা গরু বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দেশী কুকুরটা চিৎকার করতে আরম্ভ করল, তারপর ছুটে গিয়ে গরুটাকে কামড়ে দিল। গরুটি পালিয়ে গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

দেশী কুকুরটা ফিরে এসে বারান্দায় উঠল। চারুচন্দ্র ওকে বললেন—ভারি পাজী হয়েছিস।

দেশী কুকুরটা কান গুটিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

শরৎচন্দ্র ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন—চারু, তোমার ওকে বকা অত্যন্ত অন্যায়। ওই তো তোমার বাগানরক্ষকের কাজ করছে।

চারু বললেন—কিন্তু ও যে গরুটাকে কামড়ে দিলে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তা অন্যায়ই বা কি করেছে—কামড়ে একটু মাংস নেবার চেষ্টা করেছিল বই তো নয়।

বাগানের মালী একদিন কী কারণে বিরক্ত হয়ে তার জল আনার বাঁক দিয়ে দেশী কুকুরটাকে এক ঘা মেরেছে। শরৎচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন। মালীকে খুব তিরস্কার করেছেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়।

ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসবার সময়ে শরৎচন্দ্র ওই মালী বাদে বাড়ির সকল ভৃত্যকে বকশিশ দিয়েছেন। বলেছেন—ওকে আমি এক পয়সাও দেব না। কুকুরকে যে মারে তার উপর আমার কোনও সহানুভূতি নেই।

শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার ঢাকা গিয়েছেন ১৯৩৬ সালে। সেবার একটা সভায় যাওয়ার জন্য মোটরগাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। উঠবার আগের মুহূর্তে শরৎচন্দ্র ড্রাইভারকে বললেন—দ্যাখো, যদি রাস্তায় কুকুর চাপা দাও তো আমি গাড়ি থেকে নেমে যাব—সাবধানে চালিও।

যাঁদের বাড়িতে পোষা জীবজন্তু অযত্ন পায় তাঁদের উপর শরৎচন্দ্রের অশ্রদ্ধার অন্ত নেই।

গিরিজামোহন সান্যালের সংগে শরৎচন্দ্র একবার কোন শহরের একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। আগেই গিরিজামোহনের মুখে শরৎচন্দ্র শুনেছেন ভদ্রলোক খুব সজ্জন, সহৃদয়।

সেই বাড়িতে পেঁাছে রাত্রে খেতে বসে শরৎচন্দ্র বললেন—গিরিজা, তুমি বলেছিলে এরা খুব সজ্জন সহৃদয় লোক। মিথ্যা কথা বললে কেন? যাদের বাড়ির পোষা কুকুরের এমন দশা, পেট ভরে খেতে পায় না, তারা কখনও সজ্জন হতে পারে? না, আমি এক্ষুনি এ বাড়ি থেকে চলে যাব। তুমি আজ রাত্রে না হোক—কাল সকালে আমাকে হোটেলে নিয়ে যেও।

বলে তিনি একে একে পাতের সমস্ত লুচিমিষ্টি কুকুরটির মুখে তুলে দিয়ে বললেন—আচ্ছা, দ্যাখো দেখি জীবটা কতকাল খেতে পায়নি!

একজন বড়মানুষের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের নেমন্তন্ন হয়েছে। এখানেও কুকুর নিয়ে কাহিনী আছে। কাহিনীটি শরৎচন্দ্রের মুখেই শোনা ভালো :

"প্রকান্ড বাড়ী তাঁদের। মার্বেল পাথরের মেজে; সেই মেজের ওপর জুত-সই একটি গালচের আসন পাতা—ত্রুটি নেই কিছুরই...আর যা খাবার দিয়েছে—তা দেখেই মনে হয় আমি যেন একটা রাক্ষস।

দেখেই আমার মনে মনে রাগ হল। খাচ্ছি আর ভাবছি, কি করি; হঠাৎ দেখি দূরে একদল কুকুর—বেজায় রোগা চেহারা। কোনো জন্মে ভাল করে খেতে পায়নি তারা।

গৃহস্বামীকে বললাম,—মশাই, একটী বড় গামলা-টামলা গোছের কিছু

দিতে পারেন?

তিনি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলেন—হাত ধোবেন বুঝি?

বললাম—আনুন তো!

গামলাতে ভাত-ডাল, মাছ-তরকারি, মাংস-মিষ্টি, ক্ষীর-সর যা কিছু ছিল—সব মেখে, দুহাতে গামলা নিয়ে ছুট—একেবারে কুকুরগুলোর কাছে!

উঃ, কুকুরগুলো সত্যিই খেয়ে বাঁচল!...

বাড়ীর লোকেদের মুখে আর কথা ফোটে না। কর্তা শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন—ছেলেপুলেরাও তো খেতে পারতো!

বললুম—মশাই তাদের জন্যে ভাবনা কি? তারা তো রোজই খায়; কিন্তু কুকুরগুলো আজ খেয়ে বাঁচল।"

স্টীমারে বেড়াতে গিয়েছেন শরৎচন্দ্র। স্টীমারের নাম—ভিনাস।

কাহালগাঁয়ে স্টীমার থামল। শরৎচন্দ্রের চোখে পড়ল, একদল কুকুর ছুটে আসছে।

স্টীমার থেকে নেমে পড়লেন শরৎচন্দ্র।

স্টীমারঘাটের কাছেই একটা ছোটো দোকান। দোকানের সামনে মাঠ। বারো-তেরো বছরের একটি ছেলেকেও পাওয়া গেল। দোকানে চিড়েদই আছে।

শরৎচন্দ্র মাঠে বসলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি চিড়েদই পরিবেশন করতে লাগল—পনর-কুড়িটি কুকুর মনের আনন্দে ভোজ খেল।

ছোকরার মোট মজুরি বাদে কিছু খুচরো পয়সা দোকানীর কাছে শরৎচন্দ্রের পাওনা হয়েছে। শরৎচন্দ্র তা নিলেন না। বললেন—দেনে নেহি হোগা, উহা তুমহারা নাফামে গিয়া।

আবার গিয়ে স্টীমারে উঠলেন শরৎচন্দ্র।

চাকর-বাকরের সেবা ভেলু নেয় না। অতএব প্রভু শরৎচন্দ্রের উপরেই ভেলুর সেবার ভার। কিন্তু সেজন্য ভেলু প্রভুকে রেহাই দেয়নি, বহুবার শরৎচন্দ্রকে কামড়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:

"শরৎ ছাড়া আর কাহাকেও তাহার (ভেলু) গুণে মুগ্ধ হইতে বড় দেখি নাই। ঐ কুকুরটি ছিল, বাড়ির লোকের, পাড়ার লোকের এবং শরতের বন্ধু-বান্ধবদের দুই চক্ষের বিষ।

বিরুদ্ধতা-বোধ যখন এমনি করিয়া বিরাটের কোঠায় উঠে তখন তার বিপক্ষে সাজসজ্জাও হয় অমিত। তাই ভেলির প্রশংসা, তার প্রভুর মুখে সকল সময়ে সপ্তমে চড়িয়া থাকিত। দয়িতের জন্য হাঁ-কে না করিতে, নিছক কল্পনাকে হুবহু সত্য বলিয়া চালাইতে তাহার মালিকের বোধ করি কোন দ্বিধা-বাধা ছিল না।

বহুমূল্য কার্পেটকে খণ্ড খণ্ড করিলে তখন তাহার দাম হইত, 'ও কিছু না'। নূতন বই-এর পাণ্ডুলিপি ছিঁড়িলে ভেলির সাহিত্য-বৈরাগ্যের কথা মনে করিয়া রাজা শুদ্ধোদনের মত শরতের চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিত!

তাহার চরণ-চুম্বনে ফাউন্টেন পেনের নিবটি লাঙ্গলের ফালের আকার ধারণ করিলে শরৎ খুশী হইয়া দেখিতেন, তাহলে ওর গায়ে সত্যই একটু শক্তি লেগেছে!

ভেলির কুৎসিত ল্যাজটির নিন্দা করিলে—শরতের সংসার-বৈরাগ্য ঘটিত—লেজের জন্য ও কি দায়ী?"

'মালিনী' না কি একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের মে মাসে, কুমিল্লায় একদিন বলেছেন—হ্যাঁ। ভেলু নষ্ট করে ফেলেছিল। আমি আলগা কাগজে লিখি; সেদিন লিখবার ঘরের দরজাটা খোলা রেখেই পায়খানায় গিয়েছিলাম। ভেলু বই ছিঁড়ত না, আলগা কাগজ ছিঁড়ত। পায়খানা থেকে এসে দেখি, একতাল কাগজ নিয়ে ভেলু ছুটোছুটি করছে,—ছিঁড়ে কামড়ে ন্যাপটে সব শেষ করে দিয়েছে। এক বছরের পরিশ্রমই গেল।

শরৎচন্দ্র একদিন দুঃখ করে মণীন্দ্রনাথ রায়কে বলেছেন—মণি, ভেলো সর্বনাশ করেছে—একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ভেলো একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে—একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কী বা বলব ওকে—ও বোধ হয় বুঝতে পারেনি, বুঝলে কখনোই এ-কাজ করত না।

ভেলুর উপর শরৎচন্দ্রের অগাধ ভালোবাসা। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র ভেলুকে কি-রকম ভালোবাসতেন তারও একটা গল্প বলি। একদিন কোন ভক্ত এক চাঙারি প্রথম শ্রেণীর সন্দেশ নিয়ে গিয়ে তাঁকে উপহার দিলেন। ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সামনে সন্দেশগুলি রাখলেন, ভেলু ছিল তখন তাঁর পাশে বসে। সন্দেশ দেখে ভেলু রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠল। এবং শরৎচন্দ্রও ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভেলুর উৎসাহিত মুখে এক-একটি সন্দেশ তুলে দিতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, চাঙারি একেবারে খালি! যে ভদ্রলোক এত সাধে ভেট নিয়ে গিয়েছিলেন, সন্দেশের এই অপূর্ব পরিণাম দেখে তাঁর মনের অবস্থা কি-রকম হল, সেকথা আমরা শুনিনি।"

একজন বৈষ্ণবঠাকুর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

শরৎচন্দ্র এলেন বাইরের ঘরে। তাঁর পরনে মটকার কাপড়, খালি গা, গলায় তুলসীর মালা।

বৈষ্ণবঠাকুরকে দেখে ভেলু আওয়াজ করে উঠল—গ্-র্-র্-র্...

ভেলুর কাছে বসে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন শরৎচন্দ্র। গলার তুলসীর মালা ভেলুর নাকের কাছে ঝুলছে, লোভ সামলাতে না পেরে

ভেলু লম্বা জিভ বের করে মালার স্বাদ নিতে লাগল।

বৈষ্ণবঠাকুর আর্তনাদ করে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র হেসে তাঁর দিকে তাকালেন। বললেন—আপনাদের জীবপ্রেম বুঝি কুকুর পর্যন্ত পেঁাছয় না?

ট্যাক্সবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ট্যাক্স নিতে এসেছেন। বাইরের ঘরে ট্যাক্সবাবু তল্পিতল্পা নিয়ে বসলেন। ভেলু এক কোণে আরামে শুয়ে আছে; ট্যাক্সবাবুকে দেখে সে সন্তুষ্ট হয়নি।

ট্যাক্সের টাকা দিয়ে শরৎচন্দ্র বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

বাইরে থেকে কেউ কোনও জিনিস মনিবের বাড়িতে নিয়ে এলে ভেলুর আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়ির জিনিসে কেউ হাত দেবে? ভেলুর পছন্দ নয়। ট্যাক্সবাবুর কাজ শেষ হয়েছে, নিজের টাকার তল্পির দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ভেলু ভীষণ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অগত্যা ট্যাক্সবাবু ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হল কারণ একটু নড়লেই ভেলু গোঁ-গোঁ করে।

দু-তিনঘণ্টা বাদে শরৎচন্দ্র স্নানাহার সেরে এসে দেখেন ট্যাক্সবাবু দেয়ালের ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। যা হোক, শরৎচন্দ্র এসে পড়লেন বলে ট্যাক্সবাবু ভেলুর হাত থেকে নিস্তার পেলেন।

ভেলুকে নিয়ে শরৎচন্দ্র বহুদিন 'যমুনা' পত্রিকার অফিসে এসেছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "ঐ ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেত না,—কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড় বলেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ হয় সেটা জানত। সে কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এবং তার এই সাংঘাতিক আদর থেকে শরৎচন্দ্রও নিস্তার পেতেন না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকারের ছিল ভীষণ কুকুরাতঙ্ক, ভেলু যদি ঘরে ঢুকল সুধীর অমনি এক লাফে উঠে বসল টেবিলের উপরে! ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিল না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ আপত্তি ছিল ভেলুকে বাঁধতে—আহা, অবোলা জীব, ওর যে দুঃখ হবে! হোটেল থেকে ভেলুর জন্যে আসত বড় বড় ঘৃতপক্ক চপ, ফাউল কাটলেট!"

শরৎচন্দ্রের কাছে ভেলু বিস্তর চপ, কাটলেট ও রাজভোগ খেয়েছে।

কালিদাস রায় একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনার কাছে যা সুখাদ্য, ভেলির কাছে তাই সুখাদ্য হবে এটা মনে করেন কেন? ওর হয়তো পচা মাংস, মাছের কাঁটা ইত্যাদিই রাজভোগ। চপ কাটলেট সন্দেশের মর্যাদা ও কি বুঝবে?

শরৎচন্দ্র বললেন—ঠাকুরকে তোমরা কি খেতে দাও? ঠাকুর কি খাদ্য ভালোবাসেন তা কি তোমরা জানো? ঠাকুর কি তোমাদের তা বলেছেন? তিনি কি খান না খান সেকথা ছেড়েই দিলাম। তোমার কাছে যা উৎকৃষ্ট খাদ্য তাই তো তুমি ঠাকুরকে দাও। কুকুরকে যদি ঘেন্না না করতে—তবে বলতাম ঠাকুর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা—তাঁর সৃষ্ট জীব কুকুর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। কুকুর তো মুখ ফুটে বলতে পারে না। আমার যা প্রিয় খাদ্য তাই ওকে দিয়ে তৃপ্তি পাই। আমার মনে হয় ভেলি সুখাদ্যগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে। তা না করলে সে-ও তো আগ্রহের সঙ্গে ওগুলো খেত না।

'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল ভেলুকে খাতির করতেন। সকলের জন্য চা আর জলখাবারের ব্যবস্থা। ভেলুও বাদ পড়ত না। শরৎচন্দ্র যেমন বলতেন ভেলুর জন্য তেমনি খাবার আসত।

একদিন শরৎচন্দ্র নিজের পেয়ালা থেকে পিরিচে চা ঢেলে ভেলুকে দিয়েছেন।

সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি চা খাই, ও আমার পানে যে-চোখে চেয়ে থাকে, দেখে মমতা হয়। বুঝি, ও একটু চায়। কাজেই যখনই আমি চা খাই, ওকে পিরিচে ঢেলে খানিকটা দিই।

ফণীন্দ্রনাথ বললেন—বাঃ, তা কেন বলেননি আমাকে। ওর জন্যেও এক পেয়ালা আনাই তাহলে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আজ আর থাক। এই থাক। পরে ওর জন্যেও এক পেয়ালা করে আনিও, ফণী!

একদিন শরৎচন্দ্র এসে বিরক্তমুখে হেমেন্দ্রকুমার রায়কে বললেন—নাঃ, শিবপুরের বাস ওঠাতে হল দেখছি।

—কেন শরৎদা, কী হল?

—আরে ভাই, বলো কেন, ভেলুর জন্যে আমার নামে আদালতে নালিশ হয়েছে. পাড়ার লোকগুলো পাজির পা-ঝাড়া!

—সে কি, ভেলু কি করেছে?

—কিছুই করেনি ভাই, কিছুই করেনি। একটা গয়লা যাচ্ছিল পাড়া দিয়ে, তাকে দেখে ভেলুর পছন্দ হয়নি। তাই সে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ডিম থেকে শুধু ইঞ্চি চারেক মাংস খুবলে তুলে নিয়েছে।

—অ্যাঃ, বলেন কি, ইঞ্চি চারেক মাংস?

—হ্যাঁ, মোটে এক খাবল মাংস আর কি! এই সামান্য অপরাধেই আমার ওপরে হুকুম হয়েছে, ভেলুর মুখে 'মাজল্' পরিয়ে রাখতে হবে! ভেলুর কী যে কষ্ট হবে, ভেবে দেখ দেখি!

শৈলেশনাথ বিশী একদিন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন।

পবিত্র আগেই শৈলেশকে সাবধান করে দিয়েছেন—শরৎদার ঘরে ঢুকতেই একটা লোমশূন্য কুকুর তোমাকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে আসবে, চাই কি এক কামড় দিতেও পারে, তুমি একেবারে 'নট ইজ দি নড়ন-চড়ন' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এইভাবে দ্বারদেবতাকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারো, তবেই মন্দিরে ঢুকে দেবদর্শন হবে। কিন্তু সাবধান! ভুলেও যেন কুকুরের নিন্দা কোরো না, তাহলে শরৎদা জীবনেও তোমার মুখ দেখবেন না।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ভেলু ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। ঘেউ ঘেউ করে শৈলেশের চারদিকে ঘুরে তাঁকে শুঁকতে লাগল। তারপর গেল শরৎচন্দ্রের কাছে।

তিনি তখন ভেলুকে বললেন—ওকে আসতে দাও, কিছু বোলো না।

ভেলু চুপ করল না, গরগর করতে লাগল।

শৈলেশ বসলেন।

শরৎচন্দ্র তখন সবিস্তারে ভেলুর গুণবর্ণনা আরম্ভ করলেন—এই যে ভেলুকে দেখছ, এর মতো একটি শান্তশিষ্ট কুকুর আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে কিনা একটু এ-রকম করে। একবার কী হয়েছিল জানো? রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল, ভেলু একতলার ছাদ থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে ঘ্যাঁক করে কামড়ে তার পায়ের এক খাবলা মাংস তুলে নিলে। তখন আমি কী করি, লোকটাকে ডেকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় করলাম। তারপর ভেলুকে পাঠালাম ট্রপিকালে—তার মুখের লালা পরীক্ষা করাতে। তাতে ভেলু পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এলো। কিছু ভেবো না, ও যদি তোমাকে কামড়েও দেয়, জলাতঙ্ক রোগ হওয়ার তোমার ভয় নেই।

তারপর চা এলো।

ভেলুর গায়ে যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি পোকা; চায়ের পেয়ালার কাছে গিয়ে ভেলু গা ঝাড়তে লাগল; পেয়ালাতেও হয়তো পোকা পড়ল।

কিন্তু উপায় নেই। পবিত্র আগেই শৈলেশকে বলে দিয়েছেন—ও চা যদি না খাও, দাদা জীবনে তোমার মুখ দেখবেন না।

দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটেছে—ভেলুর ঘেউঘেউ, ভেলুর গা ঝাড়া, ভেলুর গায়ের পোকাসমেত চা খাওয়া।

এই ভেলুর মুখে, বিভূতিভূষণ ভট্টের চোখের সামনে, শরৎচন্দ্র একদিন চুমু খেয়েছেন!

শরৎচন্দ্র কিছুদিন সপরিবারে কাশীতে কাটিয়েছেন, ভেলুও শরৎচন্দ্রের সঙ্গী হয়েছে। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "শরৎবাবুর প্রিয় কুকুরটিও

সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে কত কথাই তিনি শুনাইলেন। সে কি খায়, কি ভালবাসে, কিসে রাগিয়া উঠে, তাঁহার কোন্ কোন্ লেখা আচড়াইয়া কামড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে সমস্তই আমাদিগকে শুনাইলেন—যে দিন আমরা কয়েকজন তাঁহার বাসা-বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।”

কাশীতে শরৎচন্দ্রকে ঘিরে আসর জমে উঠেছে। শরৎচন্দ্র একদিন বললেন—কাশীতে এলে বামুন খাওয়াতে হয় না হে?

তারপর? শৈলেশনাথ বিশী লিখেছেন : “আমরা বললাম, হাঁ, ব্যবস্থা করে ফেলুন। কারণ আমরা জানতুম সেদিন একটা বড় রকম ভোজের ব্যবস্থা হবে--আমরাও ভাগ পাবো। শরৎদা বললেন, “আমি কি ঠিক করেছি জান, আমি কুকুর খাওয়াবো। দ্যাখো কাশীতে কুকুরের ভারী দুঃখ। অমনিই তো এটা বামনাইপনার জায়গা, শুচি-অশুচি নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি। কুকুরদের দেখলেই অশুচি, স্পর্শ করলেই স্নান করতে হয়। ওরা এখানে না খেয়েই মরে যাচ্ছে। ভেবে দেখলুম, ওরাই সবচেয়ে দুঃখী, ওদেরই খাওয়ান যাক।” তারপর আমাদের উপর ভার পড়লো, রাস্তার কোন্ মোড়ে কুকুর বেশী জমায়েত হয় তার খোঁজ করা। আমরা বললুম, নেমন্তন্ন তো করা যাবে না। দাদা বললেন, সে ভার আমি নিলুম। হলোও তাই। মণে মণে লুচি ও বঁদে এলো। আমরা রাস্তায় মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের খোঁজ করতে লাগলুম। দাদার কড়া হুকুম—কুকুরদের খাওয়া না হলে কোন মানুষ বা ভিখিরি কেউ খেতে পারবে না। যা বলা তাই করা।”

শেষ বয়সে ভেলু বাড়িতে ‘টেপী’ নামে একটি সঙ্গিনী পেয়েছে। টেপী নতুন এসেছে বাড়িতে। টেপীর শরীরে বোধহয় বিলিতী কুকুরের রক্ত আছে। টেপীর কাছে ভেলুকে আশী বছরের বুড়ো দেখায়।

টেপীর দাপাদাপির অন্ত নেই। চোখের পলকে ভেলুর খাবার খেয়ে যায়। ভেলু তখন নিঃশব্দে শরৎচন্দ্রের ইজিচেয়ারের নীচে বসল!

টেপী বেশী ছুটোছুটি করলে শরৎচন্দ্র চাকরকে ডেকে বলতেন—ভোলা, ভোলা, টেপীটাকে বাঁধ, সে আমাকে আর ভেলিকে সমানে জ্বালাতন করছে!

ভেলুর একবার ডিসটেম্পার রোগ হল। খুব কঠিন রোগ। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

“শরৎ তখন নিরুপায় হইয়া তাহাকে বেলগেছের হাসপাতালে দিয়া আসেন। কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে সে কাহাকেও আর আস্ত রাখে নাই। অতএব, ফেরৎ আনিবার অনুরোধ করিয়া ডাক্তার পত্র দিলেন।

এই সময়ে শরৎ আমাকে ঘন ঘন জরুরি পত্র দিতে থাকেন, একবার এসো।

গিয়া দেখি, তাঁর দিন আর কাটিতে চাহে না; লেখাপড়া তো একেবারে ঘুচিয়া গেছে; সমস্ত দিন একটা উদ্বেগেই কাটে;—যদি ভেলি না বাঁচে!

কিন্তু সেবারও ভেলি চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যায় নাই। হোমিওপ্যাথির বই কিনিয়া দুইজনে তাহার উপর পাণ্ডিত্য করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে তাহার ভাষার ব্যুৎপত্তি আমাদের কাছে ধরা পড়ে। আমাদের সকল কথাবার্ত্তা সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিত। হয়তো কাছেই শুইয়া আছে, আমাদের নানা কথার মধ্যে যেমন বলা গেল, ওষুধ দেবার সময় হয়েছে—অমনি ভেলির কাণ উঁচু হইয়া উঠিল এবং নিমেষে সে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। এইরূপ এক আধ বার নহে, বহুবার ঘটিয়াছে। অবশেষে আমরা ইংরাজিতে কথা কহিয়া তাহাকে জব্দ করিলাম।"

এই সময়েই সুরেন্দ্রনাথ একদিন শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, বলো তো, এই ভেলি তোমার মনের কতখানি জুড়ে আছে?

দুচোখ বন্ধ করে শরৎচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলতে লাগলেন—সে যে কতখানি তা আমি ভেবে ঠিক করে উঠতে পারিনে! ভেলি আমার নেই! একথা মনে আনতেও ভয় করে। বহুদিন থেকে সে আমার নিঃসঙ্গের সঙ্গী—প্রবাসের বন্ধু। ভেলির কাছ থেকে অনেক পেয়েছি, অনেক শিখেছি! তাকে জানতে-বুঝতে যে কষ্টস্বীকার করেছি—তাতে আমার মনের অন্যকে বোঝার শক্তিটা খুলে গেছে, বেড়ে গেছে। জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছি, তার অনেক সময় ভেলি আমার লঘু করে দিয়েছে। দুঃখের দিনে তাকে অবলম্বন করে আমাদের সময় সুখেই কেটে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র আবার বলতে লাগলেন—সে অপরিমিত—তার লেখাজোখা, গণনা সংখ্যা নেই। কিন্তু একদিনের জন্য আমি তাকে অনাদর করিনি—সেও আমাকে অবহেলা করেনি। আর কি বলব? বলা যায় না সব কথা।

প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন ডাক্তারবাবুর কাছে ভেলু কিন্তু খুব জব্দ হয়েছে।

এই ডাক্তারবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এলেই ভেলু, যেমন তার স্বভাব, তাড়া করে আসে। ডাক্তারবাবু একদিন, কী খেয়াল হল, পকেট থেকে স্টেথিসকোপটা বের করে ভেলুর দিকে মেলে ধরলেন। স্টেথিসকোপ দেখে ভেলুর মুখ শুকিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেলু পালিয়ে গেল, চোখের পলকে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার ছাদের উপর উঠে বাইরের ঘরের দিকে মুখ করে বিষম চিৎকার লাগাল—ভেউ ভেউ ভেউ ভেউ!

তারপর থেকে এই ডাক্তারবাবুকে দেখলেই ভেলু নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াত। আর ডাক্তারবাবু পকেটের দিকে হাত বাড়ালেই ভেলু দৌড় মেরে ছাদে উঠে বীরবিক্রমে চিৎকার করত—ভেউ ভেউ ভেউ ভেউ!

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "ভেলির বংশপরিচয় সুবিধাজনক

নয়। পথে-ঘাটে যে সকল সরমার অপত্য বেওয়ারিশ ঘুরে বেড়ায়, চলিত কথায় যাদের বলে 'নেড়ী-কুত্তা'—ভেলি তাদেরই একজন। শুধু অপরিমিত মাংস খেয়ে খেয়ে এবং শরৎচন্দ্রের কাছে অসঙ্গত আদর পেয়ে পেয়ে সে যেমন হয়ে উঠেছে মোটা, তেমনি রাগী। আমি একদিনও তাকে ঠান্ডা মেজাজে দেখি নি। ভেলির ধারণা, শরতের বাড়িতে যারা বাস না করে, তারা সকলেই তার শত্রু। তাই বাইরে থেকে কেউ এলেই প্রথমে সে দন্তাস্ফালন করে, তারপর তেড়ে যায়। এ বিষয়ে তার ভদ্র-অভদ্র বাছবিচার নেই।"

১৯১৯ সাল কিংবা ১৯২০ সালের কথা। উপেন্দ্রনাথ তখন ভাগলপুরে ওকালতি করেন। দিনকয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছেন। একদিন সকালবেলা বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

বাইরের ঘরে বসে শরৎচন্দ্র একখানা বই পড়ছেন। হাতে আলবোলার নল। পায়ের কাছে ভেলু শুয়ে আছে।

উপেন্দ্রনাথকে দেখে ভেলু গুরগুর আওয়াজ করতে লাগল। শরৎচন্দ্র মুখ তুলে তাকালেন। খুশি হয়ে বললেন—আরে, এস, এস উপীন। কবে এলে?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—যেতেই তো চাই। কিন্তু যাওয়ার পথে তোমার ভেলি বিষম বাধা।

ভেলুর গায়ে হাত দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—খবরদার ভেলি, দুষ্টুমি করিস নে। কামড়াতে নেই রে। মামা। কামড়াতে নেই।

ভেলুর গুরগুর আওয়াজ কমে আসতে লাগল।

শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন উপেন্দ্রনাথ। বললেন—শুনতে পাই, ভেলি তার বাবাকে দু-দুবার কামড়েছে। সুতরাং তোমার মামাকে যদি একবার কামড়ায় তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না।

শরৎচন্দ্র স্মিতমুখে বললেন—দুবার নয়, চারবার।

তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—সেকথা মিছে বলোনি। রাগ হলে মামার চামড়ায় দাঁত বসাতে ভেলি একমুহূর্তও ইতস্তত করবে না।

উপেন্দ্রনাথ বললেন—আর রাগ তার অনেক সময়ে বিনা প্ররোচনাতেও হয়।

শরৎচন্দ্র হেসে ফেললেন। বললেন—তা হয়।

বহুদূর থেকে দুজন ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধানিবেদন করতে বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়ির ভেতর থেকে শরৎচন্দ্র এলেন। গম্ভীরমুখে বসলেন ইজিচেয়ারে। দূরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি মহা-ভাবনায় ডুবে আছেন। শুকনো গলায় বললেন—কাল সারারাত ঘুমোয়নি।

দুজন ভদ্রলোক চুপ।

আবার শরৎচন্দ্র বললেন—বোধ হয় মশার জন্যে ঘুমোতে পারছে না মনে

করে মাঝরাতে উঠে মশারি ফেলে দিলাম...কিন্তু মশারির ভেতর শুয়ে আরও ছটফট করতে লাগল।

—কারুর বুঝি অসুখ করেছে?

শরৎচন্দ্র বললেন—অসুখ...হাঁ...মানে...পেট গরম হয়েছিল...খানকতক পরোটা খেয়েছিল...ঘি-টা বোধ হয় ভালো ছিল না।

ভেলুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—ভেলির জন্যে যে কী দুর্ভাবনায় পড়ি মাঝে মাঝে...

শেষ পর্যন্ত ভেলু এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তাকে বেলগেছে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে হল। শরৎচন্দ্র নিজে গিয়ে ভেলুকে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকদিন ভেলুকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন। উত্তরকালে জলধর সেন লিখেছেন: "সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাড়ীতে যত রকমের চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করলেন। দুহাতে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন—পাঠিয়ে দিলেন না।...শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নান আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে থাকতে দেয়ার আদেশ থাকত, তাহলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জর পার্শ্বেই বসে থাকতেন।"

এইসময়ে কিংবা তার আগে একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

হাসপাতালে ঢুকতে ঢুকতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন—এখানে কে আছে শরৎদা!

মুখ ভার করে শরৎচন্দ্র কাতরকণ্ঠে বললেন—কী যে হয়েছে ভেলির, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না...খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিল...বাধ্য হয়েই হাসপাতালে দিয়েছি...এ-কদিন রাত্তিরে এতটুকুও ঘুমুতে পারিনি।

ভেলুর ওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। উঠোন থেকে কয়েকটা ধাপ, তার উপর বারান্দার ধারে ভেলুর ওয়ার্ড।

হঠাৎ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কানের কাছে মুখ এনে শরৎচন্দ্র চুপে চুপে বললেন—আস্তে এসো, যেন পায়ের শব্দ না হয়।

শরৎচন্দ্র জুতো খুলে পা টিপে টিপে ধাপগুলোর উপর দিয়ে বারান্দায় উঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সঙ্কেত করলেন—কথা বোলো না!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ।

কিছুক্ষণ চুপ করে সেই ঘরের দিকে চেয়ে থেকে শরৎচন্দ্র পা টিপে টিপে

অতি সন্তর্পণে ফিরে এলেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন—ঘুমুচ্ছে, আহা! হয়তো দুদিনের পর আজ একটু ঘুমুচ্ছে! আমার একটু সাড়া পেলেই উঠে পড়ত! শব্দ কোরো না...আস্তে আস্তে চলো...

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে শরৎচন্দ্র ফিরে চললেন। এক পা করে এগিয়ে চলেন আর ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চেয়ে দেখেন।

পা টিপে টিপে গেট পর্যন্ত এলেন। গেটের বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বললেন—আর ভয় নেই, এবার কথা বলতে পারো। ওখানে একটু কথা বললে আর নিস্তার ছিল! ও নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে উঠে বসত!

তারপর হঠাৎ কী ভেবে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—হাঁ হে! তুমি এই হাসপাতালের খবর কিছু জানো? এরা নিশ্চয়ই রুগীদের খুব যত্ন করে, না? কী বলো? কথা বলছ না যে? এরা নিশ্চয়ই খুব যত্ন করে, কী বলো?

এ-বিষয়ে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কিছুই জানেন না। তবু বললেন—নিশ্চয়ই, যত্ন করবে বইকি!

ট্রামে উঠলেন দুজনে। চুপ করে বসে রইলেন শরৎচন্দ্র। মুখ অন্ধকার। হঠাৎ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—যত্ন এরা করে নিশ্চয়ই! কী বলো?

শরৎচন্দ্রের চোখ ছলছল করতে লাগল।

১৯২৫ সালের ১০ ও ১১ এপ্রিল ঢাকা জেলার মুনশীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হল. শরৎচন্দ্র সেখানে সাহিত্যশাখার সভাপতি। অসুস্থ ভেলুকে হাসপাতালে রেখে শরৎচন্দ্রকে মুনশীগঞ্জে যেতে হল, মুনশীগঞ্জ থেকে ঢাকা. ঢাকা থেকে বাড়িতে ফিরে এলেন ১৯২৫ সালের ১৬ এপ্রিল। খবর পেলেন, ভেলু ভালো আছে। সেদিন হাসপাতাল থেকে ভেলুকে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

শরৎচন্দ্র. ১৯২৫ সালের ২১ এপ্রিল, ঢাকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন :

"তোমার হয়ত মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে একটা মৃতপ্রায় বাছুর। তারপরেই একটা জবাই-করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন? তুমি বল্‌লে, একটা গোধাও ত ছিল. আমি বললাম কই, আমি ত তা দেখি নি।

তারপর তোমরা ষ্টেশন থেকে চ'লে গেলে, গাড়ী ছাড়বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে একপাল শকুন আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে—মন যে আমার কি খারাপ হয়েই গেল তা লেখা যায় না। ইংরাজিতে যাকে বলে সুপারস্টিশন সে আমার নেই. কিন্তু তিন্ তিন্‌টে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্ত্তের শান্তি দিলে না।

বাড়ী এসে শুন্‌লাম ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।"

কিন্তু বাড়িতে এসেই ভেলু অত্যন্ত সুস্থ হয়ে পড়ল। সাতদিন সাতরাত শরৎচন্দ্র খাননি, ঘুমোননি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ১৯২৫ সালের ২৩ এপ্রিল, সকাল ছটায় ভেলু মারা গেল। সকাল সাড়ে নটায় বাজেশিবপুরে ভেলুর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হল। বাগানে।

একটি খাতার মলাটের ভিতরপিঠ থেকে শরৎচন্দ্রের লেখা কয়েকটি লাইন অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার উদ্ধার করে এনেছেন :

"ভেলু

দেহ ত্যাগের দিন—
১০ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩২,
সকাল ৬টা—২৩শে এপ্রিল, ১৯২৫
সমাধি—বেলা ৯॥
বাজে শিবপুর। হাওড়া
রাত্রি দিনের সঙ্গী
আমার পরম স্নেহের বস্তু"

বিকেলের দিকে শৈলেশনাথ বিশী এলেন। শরৎচন্দ্রকে বললেন—দাদা, স্নানাহার—

শরৎচন্দ্র বললেন—ওসব কিছুই হয়নি।

—দাদা, তাহলে তার শেষের কাজ?

শরৎচন্দ্র বললেন—তা হয়েছে, আমি নিজের হাতে বাগানে তাকে কবর দিয়েছি। এখন তোমরা বলো তো, ওর একটা স্মারক স্মৃতিস্তম্ভ কেমন হলে ভালো হয়?

—দাদা, রেসের ঘোড়া মরলে, সেই ঘোড়ার মতন স্ট্যাচু তার কবরের উপর গড়ে দেয়। এও তাই হবে। ভেলুর একটা মার্বেল স্ট্যাচু গড়ে দিন।

শৈলেশের চোখে পড়ল, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বউদি চোখ মুছছেন। শরৎচন্দ্র বললেন—ওরা বলছে, শ্বেতপাথরের পাদপীঠের উপর একটা মার্বেলের তুলসীমঞ্চ থাকবে।

শৈলেশ বললেন—খুব উত্তম পরিকল্পনা।

কারও খাওয়া হয়নি, বিকেল গড়িয়ে গেছে, বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। শৈলেশ অতএব শরৎচন্দ্রকে বললেন—দাদা, একবার ভেলুর কবরটা দেখতে চাই।

শরৎচন্দ্র বললেন—আজকে ভেলুর কত কথাই না মনে হচ্ছে। ও আমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারত না। রোজ রাতে ও আমার সাথে লুচি খেত, আমার কাছে না শুলে ওর ঘুম হত না, বাইরে থেকে মশারি ধরে টানাটানি করত, এইভাবে কত দামী মশারি যে আমার ছিঁড়ে দিয়েছে,

তা বলবার নয়। আজ রাতে আমি যে কী করে খাব তা ভেবে পাচ্ছি না। ও পশু ছিল বটে, তবে মানুষের বুদ্ধিকে হার মানিয়ে দিত। ও যতদিন ছিল, বাড়িতে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল না।' এবার হয়তো চোর-ডাকাতের হাতেই প্রাণটা যাবে।

শৈলেশ বললেন—দাদা, ওসব এখন ভাববেন না। পরে ধীরেসুস্থে ভেবে যা হয় করা যাবে।

শরৎচন্দ্র চাকরকে ডাকলেন। শৈলেশকে বাগানে নিয়ে যেতে বললেন।

বাগানে গিয়ে ভেলুর কবর দেখে ফিরে এলেন শৈলেশ। শরৎচন্দ্র বললেন—নিজ হাতে কোদাল দিয়ে এক কোমর মাটি খুঁড়ে ওকে কবর দিয়েছি। আমার গা ব্যথা হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে জলধর সেন সেদিনই বাজেশিবপুরে চলে এসেছেন। দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে জলধর সেনকে জড়িয়ে ধরে শরৎচন্দ্র কেঁদে উঠলেন—দাদা, আমার ভেলু আর নেই।

শরৎচন্দ্র, ১৯২৫ সালের ২৭ এপ্রিল, লিখেছেন : "সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এত বড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয় তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল।"

শরৎচন্দ্র, ১৯২৫ সালের ২৮ এপ্রিল, লিখেছেন :

"ভেলু বেঁচে নেই।...শেষদিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর করে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা করেও ওষুধ তার পেটে গেল না; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোরবেলায় সে কান্না তার থামল।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে, তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগল—'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা।' তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্ব্বে এত ব্যথা আমি আর পাইনি।"

মণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন : "সেদিন কিসের একটা ছুটি ছিল। আমি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম, তিনি মেঝেতে শুয়ে আছেন, অত্যন্ত বিষণ্ণ। জিজ্ঞাসা করতে বললেন—'ভেলো আজ তিনদিন মারা গেছে।' প্রিয়তমের বিয়োগেও বোধ করি এত কাতর হতে দেখা যায় না, যা তাঁকে সেদিন দেখলাম—বল্লেন, 'মণি, আমি যে একে হারিয়ে কত ব্যথা পেয়েছি, তা কেউই বুঝতে পারবে না—ভেলো যে আমার কত প্রিয় ছিল তাও কেউ জানে না।'..."

উত্তরকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলাম, এ-জীবনে তা আর ভুলব বলে মনে হয় না।"

ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র আরও কয়েকটি কুকুর পুষেছেন। কিন্তু ভেলুর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। স্বয়ং শরৎচন্দ্র বলেছেন : "ও (ভেলু) আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, ওর আগে পরে অনেক কেউ এলো গেলো। *কিন্তু ও যেন মাঝের মাণিকটি!"*

ভেলুর মৃত্যুর অনেকদিন পরের কথা। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সামতা-বেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"ভেলি নাই!

শরতের নূতন বাড়ীর প্রশস্ত বারান্দার রং করা মেজে জুড়িয়া পড়িয়া আছে হলদে কালো সাদা পাটকিলে রং-এর কুকুরের দল! আগন্তুক দেখিয়া তাহারা সাড়াও দেয় না, এবং উজ্জ্বল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্নও করে না, এতদিন ছিলে কোথায়?

কাকাতুয়াটা দাঁড়ে বসিয়া মৌন মুখে চাহিয়া দেখে; চন্দনার কলকাকলিতে মুখর কেবল পূর্ব্ব দিকটা।

শরৎ হাতকাটা জামা পরিয়া শীতের দুপুরে গোলাপবাগানে দাঁড়াইয়া পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত রূপনারাণের উপর নৌকার আনাগোনা দেখিতেছেন।...

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শরৎ বলিলেন, অনেকদিন পরে এলে!

দুইজনের চক্ষুই অশ্রু-সজল; হৃদয় ব্যথাতুর!...

ভেলির নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই!

এই দেখ, অতিথ আমার, কত বড় কুকুর! আর এই যে দেখচ বর...ওকে তুমি সেই এতটুকু দেখেছিলে, না? ঠিক ঠিক! আর বুলি? বুলি আমার ভারি ঝগড়াটে!

উপরে শৃঙ্খলিত টেপীর খেউ খেউ!

তারপর?

ইজিচেয়ারের উপর শুইয়া পড়িয়া আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি শরৎ একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দিন চলে যাচ্ছে!

যেন সমস্ত নিস্তব্ধতাকে ব্যাপিয়া শুধু একটি কথাই শুনিলাম :—

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী।"

ভেলুর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। কিন্তু ভেলুর কথা উঠলে দেওঘরের একটি অতিথির কথাও এসে পড়ে।

হাওয়া-বদলের জন্য শরৎচন্দ্র দেওঘরে এসেছেন। একদিন সন্ধ্যার আগে একা-একা বেড়াতে বেরিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর একা রইলেন না। অন্ধকার হয়ে এসেছে, হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখলেন একটি কুকুর।

শরৎচন্দ্র বললেন—কি রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি?

দূরে দাঁড়িয়ে কুকুরটি লেজ নাড়তে লাগল।

শরৎচন্দ্র বললেন—তবে আয় আমার সঙ্গে।

কুকুরটার বয়স হয়েছে, পিঠের লোম উঠে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে চলে। বাড়িতে এসে গেট খুলে দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি।

সে বাইরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

আলো নিয়ে চাকর এল, শরৎচন্দ্র তাকে গেট বন্ধ করে দিতে বারণ করলেন, বললেন—না, খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে খেতে দিস।

কিন্তু সে এল না। কোথায় গেল, কে জানে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই শরৎচন্দ্র দেখলেন কালকের সেই অতিথি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন?

শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই অতিথি লেজ নাড়তে লাগল। শরৎচন্দ্র বললেন—আজ তুই খেয়ে যাবি,—না খেয়ে যাসনে। বুঝলি?

সে ঘন ঘন লেজ নাড়ল।

রাত্রে শরৎচন্দ্র চাকরের মুখে শুনলেন সেই কুকুরটা আজ এসে বাইরের বারান্দার নিচে উঠোনে বসে আছে। শরৎচন্দ্র বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলেন—ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

কিন্তু এককথায় কাজ হয়নি। বাড়তি খাবার বাগানের মালি-বৌ নিয়ে যেত, একটা রাস্তার কুকুর তার পাওনায় ভাগ বসাতে এসেছে, মালি-বৌ সহ্য করেনি, একদিন অতিথিকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, আবার অতিথিকে ডেকে আনা হল, আবার সে বারান্দার নিচে উঠোনের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে জায়গা করে নিল। অতিথি আর মালি-বৌকে ভয় পায় না। বিকেল হলে অতিথি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে উপরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে—শরৎচন্দ্রের বেড়াতে যাবার সময় হল যে!

দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে গেল। সেদিন দুপুরের ট্রেনে যেতে হবে, সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি সুরু হয়েছে। গেটের বাইরে সারি-সারি গাড়ি, মালপত্র বোঝাই হচ্ছে, কুলিরা ছুটোছুটি করছে, অতিথিও খুব ব্যস্ত হয়ে কুলিদের সঙ্গে ছুটোছুটি করতে লাগল।

স্টেশন দূরে নয়। গাড়ি থেকে স্টেশনে নামতে গিয়ে শরৎচন্দ্র দেখলেন অতিথিও স্টেশনে এসেছে।

—কি রে, এখানেও এসেছিস?

সে লেজ নাড়ল। হয়তো লেজ নেড়ে জবাব দিলে। সেই জবাবের কী অর্থ কে জানে।

শরৎচন্দ্র অতিথিকে ভোলেননি। বিদায়মূহূর্তে অতিথির কথাই তাঁর মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি সোনার অক্ষরে লিখে রেখে গেছেন: "টিকিট কেনা হলো, মাল-পত্র তোলা হলো, বন্ধু এসে খবর দিলেন—ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকসিস পেলে সবাই, পেলে না কেবল অতিথ। গরম বাতাসে ধূলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে; যাবার আগে তারই মধ্যে দিয়ে ঝাপ্‌সা দেখতে পেলাম—ষ্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথ। ট্রেন ছেড়ে দিলে। বাড়ী ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলি মনে হতে লাগলো অতিথ আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ীর লোহার গেট বন্ধ,—ঢোকবার যো নেই। হয়ত, পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাট্‌বে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা,—তার পরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।"

[illegible] আর আর পাখী এসে [illegible], [illegible] । [illegible]

[illegible] [redacted]

[illegible] ।

[illegible] পাখী [illegible] । [illegible] ?[illegible]

[illegible] — কি [illegible] কি ।

[illegible] [redacted] [illegible]

[illegible] । [illegible]

[illegible] । [illegible] [redacted] [illegible] । [redacted] [illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] [redacted]
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সমাপ্ত

শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[illegible]

দুই

হাওড়া টাউনহলে, ১৯২৮ সালের ২৭ অগস্ট, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নবনির্বাচিত ও মনোনীত কমিশনারদের দ্বিতীয় সাধারণ সভার অধিবেশন হয়েছে। এই সভায় 'জীবজন্তুর প্রতি নির্য্যাতন নিবারণকল্পে যে কমিটি নির্ব্বাচিত হয়, তাহার মধ্যে তিনজন বাহিরের লোকও নেওয়া হয়। তন্মধ্যে হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হাওড়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।'

মণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন : "একদিন আমায় বল্লেন, "মণি, তোমার বাবাকে বলে আমায় একটা সি-এস-পি-সি-এ-র ইনস্পেক্টর করে দিতে পারো?" তিনি যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে এ অনুরোধ করেছিলেন যে আমি সে সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি করিনি—চাকরিও হোতো—শুধু ঐ ইউনিফর্ম পরার ব্যাপারে সে সাধ তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। অন্তরে এই সব অবলা প্রাণীদের জন্যে এত ব্যথা, এত বেদনা না পেলে এত বড় দরদের দরদী হয় না। এই সেদিনের কথা, বোধ করি দিন পনর কুড়ি আগে, আমার বাড়ী থেকে রাত্রে তাঁকে হাওড়া ষ্টেশনে পেঁছে দেবার সময়—আমি নিজেই মটর চালাচ্ছিলাম, গাড়ীতে শরৎবাবু ও বারীনদা (শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ) ছিলেন; ট্রেন ধরার সময় অল্প থাকাতে—একটু জোরেই গাড়ী চালাচ্ছিলাম, শরৎবাবু ভয়ে ব্যাকুল হয়ে আমায় বল্লেন—"মণি, দেখো যেন কুকুর-বেড়াল চাপা দিয়ে মেরো না—মানুষ চাপা দাও, আমি দুঃখ পাব না। কিন্তু ওদের বাঁচিয়ে যেও।" (মণীন্দ্রনাথ রায় : শরৎ-পরিচয়, 'নবশক্তি', ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩১, পৃ. ১৩)

শরৎচন্দ্রের গাড়িতে সেদিন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনও আরোহী নেই। খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছে কালী। বাড়ির কাছাকাছি এসে দুজন মহিলাকে প্রায় চাপা দিয়েছিল আর কি।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—কালী, তোমার বাবুর মানা আছে কুকুর চাপা দিতে। কিন্তু মানুষের মধ্যেও সেই কুকুরের মতো জীবের বাসা আছে। লক্ষ্মী বাপধন, মানুষ চাপা দিও না। বিশেষ করে নিরীহ নারীজাতি।

কালী মুখ টিপে হাসল। বলল—কুকুর চাপা দিলে চাকরির দফা তক্ষুনি রফা। মানুষ চাপা দিলে ছাড়া পেলেও পেতে পারি।

শরৎচন্দ্র, ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল, লিখেছেন : "হাবড়া সহরেও সি-এস-পি-সি-এ আছে এবং আমি তার চেয়ারম্যান।" হ্যাঁ, কিছুকাল শরৎচন্দ্র হাওড়া পশুক্লেশনিবারণী সমিতির চেয়ারম্যান থেকেছেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "জীবজন্তুর প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রাণের টান ছিল চিরদিনই। খুব ছেলেবেলাতেও তিনি বাক্সে করে নানারকম ফড়িং পুষতেন, পরিচর্য্যা করতেন নিজের হাতে। কোন বাড়ীর উঁচু আলিসা দিয়ে একটা মালিকহীন বিড়ালকে চলা-ফেরা করতে দেখলে তিনি দুর্ভাবনায় পড়তেন,—যদি সে পড়ে যায়! পাখী, ছাগল ও বানর প্রভৃতি সব জীবকেই তিনি সমান যত্নাদর বিলিয়ে গেছেন। তাঁর পোষা দেশী কুকুর "ভেলু" তো প্রায় অমর হয়ে উঠেছে! "যুবরাজ", "বংশীবদন" প্রভৃতি আদরের ডাকে তিনি তাকে ডাকতেন।"

শরৎচন্দ্র বাজেশিবপুরে, শৈলেশ বিশী দেখেছেন, 'বেটু' নামে একটা টিয়াপাখি পুষেছেন।

বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস, শৈলেশ বিশী একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন, চোখে পড়ল পাকা পেয়ারায় গাছ ভর্তি।

লোভ সামলাতে না পেরে শৈলেশ দুটি পেয়ারা পেড়ে নিলেন। একটি রাখলেন পকেটে। আরেকটি খেতে আরম্ভ করে দিলেন।

শৈলেশকে পেয়ারা খেতে দেখে শরৎচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে গম্ভীরভাবে বললেন—সব পেয়ারা পেড়ে ফেলো।

পেয়ারা পাড়া হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র তখন হুকুম দিলেন—সব পেয়ারা পাড়ায় বিলিয়ে দাও।

শৈলেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি না বলে কেন পেয়ারা পাড়লে, না হয় সব পেয়ারা তুমিই নিয়ে যাও।

শৈলেশ বললেন—এ-রকম অবিচার আমার উপর কেন করছেন, আমার যে কী অপরাধ তা তো বুঝতে পারলাম না।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাহলে এসো, দেখবে এসো।

ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন শৈলেশকে। দেখা গেল, তাকের উপর চার-পাঁচটা ছোট ছোট কাঁসার বাটি; বাটিতে বাটিতে সাজানো আছে বেদানার দানা, আনারসের টুকরো, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস।

শরৎচন্দ্র বললেন—এসব বেটুর খাবার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেটু এসব খায়। বেটুর খাওয়ার আগে এ-বাড়ির ফল কেউ খেতে পারে না। তুমি যখন তার

আগে ফল খেয়েছ তখন এগুলো পাড়ায় সব বিলিয়ে দিকগে।

কথা শুনে শৈলেশ আধ-খাওয়া পেয়ারা আর পকেটের আস্ত পেয়ারা জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

শরৎচন্দ্র বেটুর কাছে গিয়ে 'বাবা বেটু! বাবা বেটু!" বলে গায়ে হাত বুলিয়ে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে, মাথাটি গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে আদর করে তাকে আস্তে আস্তে সব ফল খাওয়ালেন।

হরিচরণ মিত্র বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং ভক্ত। অনেকের কাছে 'ভূতনাথ' নামে তিনি পরিচিত। একটা ছুটির দিন তিনি হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে নেমন্তন্ন করলেন; কথা রইল সকাল সাতটা নাগাদ পেঁছিতে হবে, তাহলে সমস্ত দিনের বেশীর ভাগ সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কাটানো যাবে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। শরৎচন্দ্র এই নিমন্ত্রণের কথা জানিতেন, তাই ভূতনাথবাবু একেবারে আমাকে শরৎচন্দ্রের বসিবার ঘরেই লইয়া গেলেন। একটা মাঝারি টেবিলের তিনধারে তাঁহার নিজের বসিবার চেয়ার ছাড়া আর খানদুই চেয়ার এবং একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল। টেবিলের উপর সুন্দর বাঁধানো খানদুই খাতা, একটি পরিষ্কৃত দোয়াত-দানে লাল এবং কাল কালির দুইটি দোয়াত ও গুটিচার কলম, গুটিদুই দামী ফাউন্টেনপেন, আর কয়েকখানি বই যত্নসহকারে সাজানো। পাশে একটি প্রকাণ্ড গড়গড়া. চাকর আসিয়া তামাকু দিয়া গেল। আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম. ভূতনাথবাবু বাজারে চলিয়া গেলেন। তামাক খাইতেছি. হঠাৎ গল্প বন্ধ করিয়া কিছু না বলিয়াই শরৎচন্দ্র ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। মনে হইল কে যেন ডাকিল; আমাকে কিছু না বলিয়া যাওয়ায় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হইলাম। দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, শরৎচন্দ্রের দেখা নাই। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি শরৎচন্দ্র আসিতেছেন। চোখে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতেছে, কান্না চাপিবার চেষ্টায় সারা দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। মনে হইল যে তিনি বাড়ীর ভিতরে থাকিতে পারেন নাই। হয়তো আমার কথা তাঁহার মনে ছিল না, তখন বাহিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; না পারি উঠিয়া যাইতে, না পারি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে। অনেকক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র কথা কহিলেন—"পাখীটা মরে গেল। কোন রকমে বাঁচানো গেল না। তিনদিন মাত্র অসুখটা জানতে পেরেছি. কত চেষ্টাই তো করলেম—আজ তিন বছর পাখীটা সঙ্গে সঙ্গে ছিল, একদণ্ডের জন্য কাছছাড়া করিনি। তেমন বেশী গুরুতর অসুখ তো জানা যায়নি। হঠাৎ বেড়ে ওঠায় বাড়ীর ভেতর থেকে খবর পেয়ে উঠে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না।" মনে যাহা করিলাম, তাহা আর বলিতে পারিলাম না।"

হরেকৃষ্ণ সেদিন কোন পাখির মৃত্যুসংবাদ শুনে এসেছেন কে জানে।

রেঙ্গুনেও শরৎচন্দ্র পাখি পুষেছেন।

রেঙ্গুনে সতীশচন্দ্র দাস একদিন সন্ধ্যার পর শরৎচন্দ্রের ঘরে গিয়ে দেখলেন যে তিনি পাখিকে খাওয়াচ্ছেন।

সতীশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—রাত্রে আবার পাখিকে খেতে দিতে হয়?

শরৎচন্দ্র বললেন—এরা যখন জঙ্গলে থাকে তখন ইচ্ছামত খাবার যোগাড় করে। কিন্তু যখন লোকালয়ে আবদ্ধ থাকে, ঠিক আমাদের মতো করে নিতে হয়। যখন ভালোবেসে পাখিকে জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে, সে ভালো-বাসাটা কি দেখবার জন্য? পাখি যখন তোমার আচার-ব্যবহার শিখতে থাকে, তখন তুমিও পাখিকে নিজের করে নিয়ে ভালো না বাসলে তাদের প্রাণে লাগে। যতক্ষণ বনের পশুপাখিকে নিজের করে নিতে না পারবে, ততক্ষণ এদের আটকে রাখবে কেন?

রেঙ্গুনের রাস্তায় দেখা গেছে শরৎচন্দ্র বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাঁর কাঁধে বসে আছে সোনার চেনে বাঁধা নুরীপাখি। সতীশচন্দ্র দাস লিখেছেন:

"একটী নুরি পাখী ছিল, শরৎচন্দ্রের প্রাণের তুল্য।...এ পাখী ভারত, জাভা, সুমাত্রা দ্বীপ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। শরৎদার পাশের ঘরের অনেকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিতেন—শরৎদা কাল অত রাত্রে তোমার ঘরে গাইছিল কে?

শরৎদার তামাকের উপরে এত ঝোঁক ছিল যে রাত্রে পাঁচ-সাতবার উঠিয়াও তামাক খেতেন।

খাটের খুঁটির সঙ্গে সোণার চেনে নুরি পাখী বাঁধা থাকত। যখন শরৎদা অধিক রাত্রিতে সাধনায় বসিতেন, নুরি কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান ধরিত

সখিরে কি আর বলিব

আমি?

এই নুরি পাখী ছিল শরৎদার সাধনার সহচর। যেদিন নুরি মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া চোখ বুজিল, দাদা হলেন শয্যাশায়ী। এমন কি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াই দুবেলা অশ্রুজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

উস্কো চুলে শোকার্ত্ত হৃদয়ে রাস্তায় বাহির হইলে, অজানা লোক শরৎদাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কি হয়েছে শরৎবাবু, আপনার মুখের চোখের চেহারা যেন কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছে, অসুখ করেছিল কি? তিনি উত্তর দিতেন আমার ছেলেটি মারা গেছে।

শরৎদার মুখে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করিতেন। শরৎদা হিন্দু ধর্ম্মমতে পুত্রের ন্যায় নুরির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

এই নুরীপাখিটিরই নাম কি 'বাটু'?

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন :

"রেঙ্গুনে তাঁর (শরৎচন্দ্র) একটি সিঙ্গাপুরী নুরী পাখী ছিল, তার নাম রেখেছিলেন তিনি 'বাটুবাবা'। বাটুকে তিনি অনেক কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর পরিচিত বা বন্ধুরা কেউ শরৎচন্দ্রকে ডাকতে গেলে 'বাটু' তাদের অভ্যর্থনা করতো—'এসো-বোসো'। প্রশ্ন করত—'কে গো—কে তুমি?' 'বাটু' শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র তাকে ডাকলেই বাটু সাড়া দিত "বাটু-টু-টু!" এই পাখী ও মানুষটির মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা ও প্রাণের আকর্ষণ ছিল। শরৎচন্দ্রের গলার সাড়া পেলেই বাটু "বাটু-টু-টু" বলে উল্লাসে হর্ষধ্বনি ও নৃত্য করতো। শরৎচন্দ্র বাটুর রূপার দাঁড় ও সোনার শিকল এবং পায়ে স্প্রীং যুক্ত সোনার কড়া করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের শয্যায় বাটুবাবার জন্য পৃথক একটি ছোট্ট শয্যা রচিত হ'ত। তার বালিশ ও তোষক সমস্তই মূল্যবান রেশমের তৈরি। ছোট্ট একটি নেটের মশারিও বাটুবাবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। শরৎচন্দ্র রাত্রে তার শিকল খুলে দিলেই বাটুবাবা দাঁড় থেকে নেমে এসে টুক্ টুক্ করে ঘরে গিয়ে মশারীর মধ্যে ঢুকে তার নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে পড়তো।

বাটুবাবাকে শরৎচন্দ্র যখনই আদর করে ঠোঁটে চুমু দিতেন, বাটুবাবা সানন্দে তা' গ্রহণ করতো এবং সোহাগ-গদ্‌গদ চিত্তে শরৎচন্দ্রের গণ্ডদেশে তার মাথাটি ঘষে ঘষে অন্তরের একান্ত পরিতৃপ্তি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিবেদন করতো। তাঁর এই বড় সাধের বাটুবাবা যখন তার সেই সোনার চেনই গলায় আটকে অপঘাতে মারা যায় তখন শরৎচন্দ্র এত বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে তিন দিন কিছু খেতে পারেননি, বাড়ী থেকে বেরুতে পারেননি, অফিস কামাই করেছিলেন।

বাটু ছিল কিন্তু ভারি দুর্দান্ত! একমাত্র শরৎচন্দ্র ছাড়া আর যে কেউ তাকে আদর করতে বা তার গায়ে হাত দিতে যেতো সে তারস্বরে চীৎকার করে মহা আপত্তি জানাতো এবং শেষ পর্যন্ত কঠিনভাবে দংশন করে তার হাত একেবারে রক্তাক্ত করে দিত। নূতন কোনো লোকের শরৎচন্দ্রের বাড়ী ঢোকবারই উপায় ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ বিকট চীৎকার করে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ত। এই পাখীটি একবার অদ্ভুত উপায়ে একটি চোর ধরেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরটি অতি সংগোপনে শরৎচন্দ্রের ভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রে ঘৃত সংগ্রহ করছিল। শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে সেই সময় কেউ উপস্থিত ছিল না। পাখীটা প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকে, কিন্তু প্রতিবেশীরা তার চীৎকারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল বলে কেউ তা গ্রাহ্য করেনি। চোরও সে চীৎকারে কান দেয়নি। ইতিমধ্যে কোনো রকমে তার পায়ের শিকলি খুলে যাওয়ায় বাটু

সোজা উড়ে গেল—যে ঘরে চোর ব্যস্ত ছিল তার অপহরণ কার্যে। অতর্কিতে ঘরে ঢুকে সে এমন দংশন করলে তাকে যে "বাবা গো! মা গো! গেছি গো!" বলে চোরকেও চেঁচিয়ে উঠতে হয়েছিল। সে পলায়নের চেষ্টা করতে গেল কিন্তু পাখী রইল দোর আগলে। কিছুতেই তাকে বেরুতে দেবে না। যতবার সে বেরুবার চেষ্টা করে পাখী তাকে হিংস্রভাবে দংশন করতে উদ্যত হয়। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন এবং চোরটি ধরা পড়লো।

বাটু আসবার আগে শরৎচন্দ্রের একটি ময়না পাখী ছিল। তাকে তিনি আদর করে 'মোনা' বলে ডাকতেন। এই পাখিটীও মারা যেতে শরৎচন্দ্রের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। 'বাটুবাবা'কে তিনি নামাবলী মুড়ে নাম শোনাতে শোনাতে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে শাস্ত্রমতে দাহ করেছিলেন। কিন্তু এ পাখীটির দেহ তিনি বহু ব্যয়ে চর্মশিল্পীদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংরক্ষিত করিয়ে এনে রেখেছিলেন।"

কিন্তু শৈলেশনাথ বিশী লিখেছেন : "শরৎদার এক টিয়ে পাখী ছিল—নাম বেটু, সে চোর ধরেছিল। তারপর থেকে তার আদর এত বেড়ে গেল যে, সেটা যে কোন মানব শিশুর ঈর্ষার বিষয় হতো। দুপুরে একদিন দাদা বাড়িতে ছিলেন না, যেমন তিনি থাকতেন না। চাকররাও কেউ কোথাও নেই, হয়তো বা ঘুমুচ্ছে, এমন সময় এক ঘটি-বাটির ছ্যাঁচড়া চোর ঢুকেছে তাঁর বাড়িতে। বেটু করল কি, চোরকে দেখেই ট্যা ট্যা করে চীৎকার করতে লাগল, আর শেকল ছেঁড়বার চেষ্টা করতে লাগল। তিন-চার বার আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ছিঁড়ে গেল শেকল। আর কি! বেটু গিয়ে চোরের পিঠে, মুখে, মাথায়, যেখানে পারল ঠোকরাতে লাগলো! চোরের পিঠ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, চোর বিব্রত হয়ে, কাপড়, ঘটি ফেলেই পালাতে লাগল। বেটুও তার পিছনে তাড়া করছে আর ট্যা ট্যা করে ঠোকর মারছে। এমন সময় দাদাও বাড়ি ঢুকেছেন, চোরের সাথে মুখোমুখি।"

'বাটু' আর 'বেটু' কি তাহলে আসলে একই পাখি? নরেন্দ্র দেব ভুল শুনেছেন, ভুল লিখেছেন? শৈলেশনাথ বিশী ভুল দেখেছেন, ভুল শুনেছেন, ভুল লিখেছেন?

এখানে বলে রাখা ভালো, অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন : "একটী নুরী পাখীর নাম ছিল 'বাটু'। শরৎচন্দ্র আদর করে তাকে 'বাটু-বাবা' বলে ডাকতেন। সেও শরৎচন্দ্রকে বাবা বলে ডাকত। সবুজ পাখা এবং গায়ের রঙ ছিল ঘোর লাল। পেতলের দাঁড়ে শেকলে বাঁধা থাকত কিন্তু সর্ব্বদাই সে চেষ্টা করত মুক্তি পেতে। তার অক্লান্ত উদ্যম দেখে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হতেন এবং বন্ধনের বেদনায় দুঃখও পেতেন।"

একটি খাতার মলাটের ভিতরপিঠ থেকে বাটু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের লেখা

কয়েকটি লাইন অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার উদ্ধার করে এনেছেন :

"আজ রাত্রি ১০-৪৫

বাটুর মৃত্যু হোলো।

মঙ্গলবার ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

সামতাবেড়, হাওড়া।

বন্ধন থেকে সে নিজেই শুধু মুক্তি পেলে না

আমাকেও একটা মস্ত মুক্তি দিয়ে গেল।..." (অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার : শরৎচন্দ্রের টুকিটাকি, 'শিবপুর ভবানী বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা কলেজ বিভাগ', ১৯৪৭-৪৮, প্রথম বর্ষ, পৃ. ৪৭)

নুরীপাখির মৃত্যুর স্থানকাল সম্পর্কে সতীশচন্দ্র দাস ও নরেন্দ্র দেব কি ভুল করেছেন?

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ভিড় ঠেলে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছেন শরৎচন্দ্র। সঙ্গে আছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

সুকিয়া স্ট্রীট পার হয়ে ফুটপাথ ধরে চলেছেন। হঠাৎ শরৎচন্দ্র পাশের এক মস্ত বড়লোকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কান পেতে কী যেন শুনতে লাগলেন। পাখির আর্ত চিৎকার!

সেই চিৎকারের দিকে কান রেখে শরৎচন্দ্র বললেন—শুনছ?

রাগে শরৎচন্দ্রের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে—বড়লোক! পাখি পোষবার সখ!

হনহন করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন শরৎচন্দ্র। হিন্দুস্থানী দারোয়ান বাধা দিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বলল—আরে বাবু, ক্যায়া ম্যাংতা?

শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গ করে উত্তর দিলেন—ক্যায়া ম্যাংতা!

সামনের উঠোনে একটি কাকাতুয়া ঘুরতে ঘুরতে কীভাবে একটা দড়িতে নিজের গলা জড়িয়ে ফেলেছে, ফাঁস থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। দারোয়ানের বাধা ভ্রুক্ষেপ না করে শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন, কাকাতুয়াটিকে ফাঁস থেকে মুক্ত করে দিলেন।

চোর না কী ভেবেছে কে জানে, দারোয়ান হাত পাকিয়ে এগোলো শরৎচন্দ্রের দিকে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—আরে ভাই! জান্তা হ্যায় কৌন...

এই হিন্দীকে গ্রাহ্য না করে দারোয়ান প্রায় একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে আর কি, এমন সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, উঠোনে দুজন অচেনা মানুষ দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন—

আপনারা? কী ব্যাপার? কাকে চান?

প্রশ্নের উত্তর দিলেন না শরৎচন্দ্র। উল্টে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন—এ পাখি বুঝি আপনার? পাখি পোষবার খুব সখ আপনার, না?

হঠাৎ একজন অচেনা ভদ্রলোকের মুখে এই ধরনের রুক্ষ প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলে উঠলেন—আপনি কী বলছেন?

শরৎচন্দ্র কটু গলায় বললেন—জীবজন্তু পুষতে হলে, অন্তরে মমতা থাকা চাই, বুঝলেন? কতক্ষণ ধরে পাখিটা যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, সেদিকে কারুরই হুঁস নেই!

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললেন—আপনি বোধ হয় চেনেন না ও'কে, উনি হলেন শরৎচন্দ্র...

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? ঔপন্যাসিক?

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক তক্ষুনি হাতজোড় করে শরৎচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন—এভাবে যখন এসে পড়েছেন গরীবের বাড়িতে তখন...

নিমেষে শরৎচন্দ্রের গলার সুর বদলে গেল। একান্ত পরিচিতের মত বলে উঠলেন—না হে না, বিশেষ দরকারে বেরিয়েছি...হয়তো দেরি হয়ে গেল...চল...চল নেপেন...

বলতে বলতে শরৎচন্দ্র একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়িতে একটি ছাগলের দুটি বাচ্চা হয়েছে—দুটিই পাঁঠা। ওরা বড় হয়ে উঠল। অনেকেরই পাঁঠার উপর লোভ পড়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ওদের সযত্নে পালন করেছেন। একজনের নাম রেখেছেন—বড় মিঞা; আরেকজনের নাম রেখেছেন—ছোট মিঞা। নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: "শরৎচন্দ্র একদিন সকালে উঠে পথে বেরিয়ে দেখেন কসাইরা দুটি ছাগলছানা নিয়ে চলেছে। বাজারে তাদের মাংসের দোকান আছে। বাচ্চা দুটোকে কেটে তারা বিক্রী করবে। সেই দুটি অবোধ ছাগশিশুকে অকালমৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাইবার জন্য শরৎচন্দ্রের কোমল প্রাণ কাতর হয়ে উঠল। তিনি কসাইদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কত টাকা দিয়ে কিনেছ এবং এদের কেটে মাংস বেচে তোমাদের কত টাকা লাভ হবে? কসাইরা সেকথা জানাতে শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাদের সে টাকা দিয়ে বাচ্চা দুটিকে কিনে বুকে করে সযত্নে বাড়ী নিয়ে এলেন। তারা শরৎচন্দ্রের গৃহে অপত্যস্নেহে পালিত হতে লাগল। একদিন সামতাবেড়ে গিয়ে দেখি তারা আর বাচ্ছা নেই। প্রকাণ্ড বড় হয়ে উঠে আশ্রমমৃগের মতো শরৎচন্দ্রের উদ্যান প্রাঙ্গণে যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। শরৎচন্দ্র তাদের নাম ধরে ডাকতেই তারা এক দৌড়ে তাঁর কাছে এসে হাজির। তিনি ওদের নিজের হাতে আম খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, 'তোমরা বলো এদের বোকা পাঁঠা, কিন্তু এদের মতো চালাক পশু

আমি খুব কমই দেখেছি।' বুঝলাম এই ছোট জীবের প্রতি তাঁর কী অসীম স্নেহ।"

মাছ ও বেজী নিয়েও বলবার মতো খবর আছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "পাণিত্রাসের বাগানে পুকুরের মাছরাও তাঁকে চিনত। দুটি মাছ আবার তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসত। একবার বর্ষায় রূপনারায়ণ ছাপিয়ে বাগানে জল ঢুকে সেই মাছ দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে তাঁর দুঃখ কত! তাঁর বাগানের একটি গর্ত্তে দুটি বেজী তাদের বাচ্ছা নিয়ে বাস করত। গাঁয়ের এক ছেলে সেই বাচ্ছাটিকে চুরি ক'রে পালায়। শুনেই শরৎচন্দ্র তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির। ছেলেটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সন্তানের অভাবে মা বাপের মনে কত কষ্ট হয়। কিন্তু ছেলেটি তবু বুঝল না দেখে শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তখন জোর ক'রে বাচ্ছাটিকে কেড়ে এনে আবার নেউল-দম্পতিকে ফিরিয়ে দিলেন।"

একটি রুগ্ন গরুর আর্তনাদ শরৎচন্দ্রের কানে গেল। তাঁর বাড়ির কাছে একটা খোলা জায়গায় একজন গোয়ালা পা ভাঙা রুগ্ন গরুকে ফেলে সরে পড়েছে। শরৎচন্দ্র খুঁজে বের করলেন সেই গোয়ালাকে; কিন্তু সে কিছুতেই গরুটিকে ঘরে নিয়ে যেতে রাজী হল না। শরৎচন্দ্র তখন অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিজের খরচে গরুটিকে হাসপাতালে পাঠালেন।

উলুবেড়িয়া মহকুমায় একটা পুকুরে একটা গরু জ্যান্ত অবস্থায় তিলে তিলে পচছিল—গ্রামের লোকজন নাকে কাপড় দিয়ে যাতায়াত করত। খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র লোকজনের সাহায্যে গরুটিকে পুকুর থেকে তোলালেন। গরুটি অবশ্য মারা গেল কিন্তু শরৎচন্দ্র তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তিনটি গরু ছিল। একে একে তিনটি গরুই দুধ দেওয়া বন্ধ করল। অনেকে তখন পরামর্শ দিলেন—বসিয়ে খাওয়াচ্ছ কেন, গরুগুলোকে বিদেয় করো।

শরৎচন্দ্র কান দিলেন না সেই পরামর্শে। বললেন—আমি ওদের কাছে অকৃতজ্ঞ হতে পারব না।

সামতাবেড়ের বাড়ি থেকে বহুদিনের একটি পোষা টিয়াপাখি উড়ে গেছে। সেদিন শরৎচন্দ্রের মন খুব খারাপ। টিয়াপাখিটা গেছে, কিন্তু দূরে যায়নি, বাড়ির কাছাকাছি এগাছে-ওগাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। শরৎচন্দ্র মাঝে-মাঝে বাইরে গিয়ে পাখিটাকে নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্রের ডাক শুনে পাখিটা কাছাকাছি কোনও গাছ থেকে ডেকে উঠতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই কাছে এসে ধরা দিল না, অন্তত সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত ধরা দিল না। সেদিনই সামতাবেড়ে গিয়ে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রথম আলাপ করেছেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে। অসমঞ্জ লিখেছেন: "সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায়

লইয়া স্টেসনাভিমুখে বাঁধের রাস্তায় আসিতেছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম, —পার্শ্বস্থ কিছুদূরের একখানি বাগান হইতে তিনি আমাকে ডাকিতেছেন। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইতেই, বেদনা ও নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে সেইখান হইতে উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন,—"আর বোধ হয় পেলাম না—অসমঞ্জবাবু!"

বিড়ালের উপরেও যথেষ্ট মমতা। তিলোত্তমা দেবী ও কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "স্বগৃহে আহারের সময় যে মার্জ্জার গোষ্ঠী তাঁর পাতের প্রসাদ পেতে জুটত তাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের মমতা তাঁর পরিবারের সবাই জানে।"

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের তরুণ বয়সেও সাপ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ দেখা গেছে। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : "সে কি আগ্রহ ওর সাপ দেখবার, সাপ বশ করার মন্ত্র জানবার, সাপের বিষের অষুধ শিখবার। এক ওস্তাদ সাপুড়েকে ও ধরে বসল ওকে সব শিখিয়ে দিতে।...এই জঙ্গল-ভরা পোড়ো বাড়ীটায় ছিল সাপের গর্ত্ত। এই গর্ত্ত থেকে সাপের মাথা প্রায়ই উঁচু হয়ে উঠত। এই সাপ ধরার জন্য ওর কত চেষ্টা। তারপর সেই ওস্তাদ দিলে একটা গাছের শিকড়। একটা মন্ত্র পড়ে সাপের মাথার উপরে শিকড়টা ধরলেই সে মাথা নীচু করবে। তখন তাকে অনায়াসে ধরা যায়। শরতের আহ্লাদের আর সীমা নেই। তরুণের সমাজে আজ সে অসাধ্য সাধন করে অসামান্য হয়ে উঠবে। তারপর সাপ খোঁজা সুরু হল। সাপ পাওয়াও গেল সহজেই।...একটা সাপ বেরোতেই একটা মন্ত্র পড়ে শরৎ এই শিকড়টা তার মাথার উপরে তুলে ধরল। কিন্তু সব জড়িবুটী আর তুকতাক ব্যর্থ হল। সাপটা হঠাৎ গলাটা লম্বা করে মারলে ছোবল। শরৎ চেঁচিয়ে উঠেছে। ধরাধরি করে ওকে নিয়ে আসা হল। ভাগ্যে হয়ত সাপটা বিষাক্ত ছিল না। শরৎ সে যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু ঐ ভণ্ড সাপুড়ের উপরে তার ক্রোধের সীমা ছিল না। শিকড়টা ছিল একটা বেল গাছের শিকড়। ওটা যে ছলনা সেই ছিল শরতের ক্রোধের কারণ।"

সাপের উপর শরৎচন্দ্রের চিরদিনের ভালোবাসা। সামতাবেড়ের বাড়িতে শীতের দুপুরে সামনের বাগানের ঘাসে বড় বড় সাপ রোদ পোয়াতে আসে। শরৎচন্দ্র পাহারা দিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের বারণ করেছেন—ওরে তোরা 'ওদিকে যাসনে। আহা! ওরা একটু রোদ পোয়াচ্চে, তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে শরৎচন্দ্র হাওয়া-বদল করতে দিনকয়েকের জন্য দেওঘরে গিয়েছেন। সেখানেও পাখি নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন। শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙ্গা একঘেয়ে সুরে ভজন সুরু করে, ঘুম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে,—পাখীদের আনাগোনা সুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে

দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি,—পাশের বাড়ি আমগাছে এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে পথের ধারের অশ্বত্থ গাছের মাথায়—সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হ'তো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া রঙ্গীন পাখী একটু দেরী করে আসতো। প্রাচীরের ধারে ইউক্যালিপটস্ গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেতো। হঠাৎ কি জানি কেন দিন দুই এলো না, দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—কেউ ধরলো না ত? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই,—পাখী চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা—কিন্তু তিন দিন পরে আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হ'লো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।"

দিনকয়েকের জন্য দেওঘরে গিয়েও শরৎচন্দ্র পাখি পুষেছেন। তিলোত্তমা দেবী ও কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "যখন তিনি দেওঘরে "ভারতবর্ষে"র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অতিথি ছিলেন, তখন বহু পক্ষী সংগ্রহ করে পুষেছিলেন। সেসময়ে প্রায়ই তিনি বলতেন, চলে যাবার সময় তাদের সব উড়িয়ে দিয়ে যাবেন। তাঁর মত মমতা দিয়ে পক্ষীগুলির যত্ন যে আর কেউ করবে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না!"

মৃত্যুর দিনকয়েক আগে শরৎচন্দ্র একটি ময়ূর কিনেছেন।

শেষশয্যায় শুয়েও শরৎচন্দ্র পার্ক নার্সিংহোমে নিজের ঘরে দুটি ক্যানারি পাখি আনিয়ে রেখেছেন। দুটি পাখি সারাদিন গান করেছে। শরৎচন্দ্র শান্ত হয়ে শুনেছেন।

তিন

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী, ১৯২৫ সালে একদিন, শরৎচন্দ্রকে বললেন—কুকুর-বিড়ালের প্রতি যাঁর এত দরদ বাংলার পাঠকপাঠিকার প্রতি তিনি এত অকরুণ কেন?

একটু অবাক হয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন—মাসিকপত্রে আপনার ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস যখন মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে তখন আপনার পাঠকপাঠিকার কী রকম কষ্ট হয় তা কি আপনি জানেন না?

শরৎচন্দ্র হেসে উঠলেন। খানিকক্ষণ বেশ জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন—তুমি তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলে, না জানি কি গুরুতর অভিযোগই শুনতে হবে। আমার লেখা যে সব সময়ে নিয়মমতো বার হয় না তার কারণ আমি বড় অলস লোক। আচ্ছা, এবার থেকে ঠিক নিয়মমতোই বার হবে।

নিয়মমতোই বেরিয়েছে কি তারপর?

এ-বিষয়ে একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছে একুনে একুশ কিস্তিতে। আঠারো কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-কার্তিকে, মাঘ-চৈত্রে; ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণে, কার্তিকে, পৌষে, ফাল্গুনে : ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখে, শ্রাবণে, কার্তিকে, পৌষে ও ফাল্গুনে।

গৌহাটি থেকে সত্যভূষণ সেন একখানা চিঠি লিখেছেন 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদককে। চিঠিখানা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩০ সালের ২৪ ফেব্রুআরি :

"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'শেষ প্রশ্ন' নামক উপন্যাস 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। উপন্যাসখানা আরম্ভ হইয়াছে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে। প্রতি মাসে ২/৪ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইতেছে এবং মাঝে মাঝে অনেক মাস বাদও পড়িতেছে; হয়ত ১৩৩৭ সালের কোন মাসে গিয়া শেষ হইবে অর্থাৎ এই একখানা উপন্যাস পড়িবার জন্য পাঠকদিগকে তিন বৎসর বসিয়া বসিয়া ভারতবর্ষের পাতা উল্টাইতে হইবে। এরূপ ভাবে বিলম্বিত হইলে পাঠকের ধৈর্য্য রক্ষা হওয়া কঠিন; যদি বা এরূপ ধৈর্য্যসম্পন্ন লোকের

সংখ্যা আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তথাপি এরূপ ব্যবস্থায় উপন্যাসের রস গ্রহণে যে ব্যাঘাত জন্মে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শরৎচন্দ্রের প্রতি পাঠক সাধারণের শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই তাঁহারা এরূপ ভাবে বিড়ম্বিত হইয়াও উপন্যাসখানার শেষ পরিণতির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন; কারণ এ বিষয়ে তাঁহারা নিরূপায়। কোন লেখকের প্রতি পাঠকবর্গের শ্রদ্ধার পরিচয় অবশ্যই খুব সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু অপর-পক্ষে পাঠক সম্প্রদায়ের প্রতি লেখকের কোন দায়িত্ব নাই কি? কোন লেখক যখন উপন্যাস লিখিতে থাকেন তখন তিনি পাঠকদিগের মুখাপেক্ষী হইবেন এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু যখন মাসিক পত্রিকার পাতে সেই উপন্যাসের পরিবেষণ চলিতে থাকে তখন পাঠক সম্প্রদায়কে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন? অবশ্য আমরা অনুমান করিয়া লইতেছি যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই উপন্যাস-খানার এরূপ বিলম্বিত ভাবে প্রকাশিত হইবার জন্য লেখকই দায়ী; কারণ লেখা শেষ হইয়া থাকিলে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জন্য যে 'ভারতবর্ষে' যথেষ্ট পরিমাণ স্থানের অভাব হইবে এরূপ কেহ বিশ্বাস করিবেন না।"

'শেষ প্রশ্নে'র বাকি তিন কিস্তি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রে, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চৈত্রে ও ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে।

পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের ধারাবাহিক রচনা সব সময়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি, মাঝে মাঝে কিস্তি বাদ পড়েছে, অনিয়মই যেন শরৎচন্দ্রের নিয়ম। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায় করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

শৈলেশনাথ বিশীর সম্পাদনায় 'জনসেবক' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে। শরৎচন্দ্র একদিন শৈলেশকে বলেছেন—যদি তোমার কাগজে লেখা চাও, আমার সাথে তোমার ভাব থাকবে না। আর যদি আমার লেখা না চাও, তোমার সাথে আমার চিরদিনের ভাব।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন, শোনা যায়, চিঠি লিখে ও পেয়াদা পাঠিয়ে যখন বিফল হতেন তখন নিরূপায় হয়ে নিজেই একদিন সকালবেলা বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উঠতেন। হাঁক দিয়ে শরৎ-চন্দ্রের ভৃত্য ভোলানাথকে ডেকে বলতেন—ওরে ভোলা, চা নিয়ে আয়। আর বাড়ির ভেতর বউমাকে বলে দে, আজ আমি এখানে নাওয়া-খাওয়া করব।

তারপর জামা-গেঞ্জি খুলে একটা তাকিয়া বুকে দিয়ে শুয়ে বর্মা চুরুট মুখে নিয়ে খবরকাগজ টেনে পড়তে আরম্ভ করতেন।

হাসতে হাসতে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করতেন—কী ব্যাপার বলুন তো দাদা? যা কিছু ব্যবস্থা আমাকে বাদ দিয়েই করছেন, কী মতলব আপনার?

জলধর সেন বলতেন—মতলব, বেলা পাঁচটার সময়ে চা খেয়ে বাড়ি ফেরবার। আর সেসময়ে তোমার লেখাটাও নিয়ে যাবার। সুতরাং এখানে আর সময় নষ্ট না করে ওপরে গিয়ে লিখতে আরম্ভ করো। পাঁচটার মধ্যে লেখা যদি শেষ না হয় তাহলে চাই কি...

—রাত্তিরটাও থেকে যেতে পারেন?

ঘাড় নেড়ে জলধর সেন বলতেন—তাও হয়তো পারি।

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র স্বভাবতই সকল বিষয়ে একটু উদাসীন ছিলেন। রচনার সম্বন্ধেও তাঁর আলস্য ও ঔদাসীন্যের অন্ত ছিল না। 'ভারত-বর্ষে' মাসের পর মাস তাঁর যে সকল রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল তার কোনোটাই বোধ হয় শেষ হ'ত না যদি জলধরদাদা দিনের পর দিন শিবপুরে গিয়ে পিউনিটিভ পুলিশের মত তাঁর দেউড়ীতে বসে কড়া তাগাদা দিয়ে সে সমস্ত না লিখিয়ে আনতেন।"

শরৎচন্দ্রের স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার। তিনি এক-দিন 'বিজলী' পত্রিকার জন্য একটি লেখা চাইলেন। শরৎচন্দ্র পরম স্নেহে বললেন—নিশ্চয়ই লিখব তোমার কাগজে।

আশ্বাস পেয়ে ধন্য হলেন নলিনীকান্ত।

তারপর সপ্তাহে অন্তত একদিন তিনি বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। নানারকম কথাবার্তার পর বিদায় নেওয়ার সময় রোজ নিজের প্রার্থনাটি জানিয়েছেন।

নলিনীকান্ত একদিন বললেন—শরৎদা, আমার লেখাটির কথা মনে আছে তো?

শরৎচন্দ্র বললেন—খুব মনে আছে। দেব তোমাকে একটি লেখা।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। লেখার দেখা নেই।

ছ-সাত মাস ঘোরাঘুরি করলেন নলিনীকান্ত। শরৎচন্দ্র একদিন বললেন—এটা তো শ্রাবণ মাস, সামনেই পুজো আসছে। তোমার পুজোসংখ্যায় একটি লেখা দেব আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

আরও মাসখানেক কেটে গেল। নলিনীকান্ত একদিন বললেন—দাদা, পুজোসংখ্যার লেখকদের নামের তালিকা ছাপব এবার, আপনার নামটি দেব তো?

শরৎচন্দ্র পরম উৎসাহে বললেন—নিশ্চয়ই দেবে। তোমাকে যখন বলেছি লেখা দেব, আর লিখবও, তখন নাম ছাপবে বইকি।

নামটি ছাপা হওয়ার পর সেই সংখ্যা একখানা 'বিজলী' নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন নলিনীকান্ত। কাকুতিমিনতি করে বললেন—দাদা, আর দেরি করলে চলবে না, এবারে দিতেই হবে লেখাটি।

শরৎচন্দ্র বললেন—কোনও চিন্তা নেই তোমার। তুমি শুধু আমাকে বলে দাও, তোমার প্রেসে কপি দেওয়ার শেষদিনটি কবে। সেদিন সকালবেলায় এসো, তোমার লেখা তৈরি থাকবে।

প্রেসে কপি দেওয়ার শেষদিনটি জানালেন নলিনীকান্ত। শেষদিনটির আগেও একদিন গিয়ে নলিনীকান্ত শেষদিনটির কথা মনে করিয়ে এলেন।

ঠিকদিনে হাজির হলেন শরৎচন্দ্রের কাছে।

বাইরের বৈঠকখানায় বসে আছেন শরৎচন্দ্র। নলিনীকান্তকে দেখেই তিনি বললেন—এসেছ? বোসো একটু।

বলেই তিনি বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

মিনিটদশেক বাদে শরৎচন্দ্র এলেন, হাতে চিঠির কাগজের মতো এক-টুকরো কাগজ। সেই কাগজের টুকরোটি নলিনীকান্তের সামনে ধরে বললেন —এই নাও, ভাই!

বিস্মিত হয়ে নলিনীকান্ত বললেন—এ কি শরৎদা!

শরৎচন্দ্র বললেন—পড়েই দ্যাখো না।

শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

"শ্রীযুক্ত বিজলী-সম্পাদক মহাশয়

পরম কল্যাণীয় বরেষু—

দেশের অনেক প্রকার সমস্যার আলোচনা তোমাদের বিজলী কাগজে স্থান পেয়ে আস্‌চে। এই দেড় বৎসরে আমারও কয়েকটা বিষয় দেখবার সুযোগ হ'য়েচে। ভেবেছিলাম, এ সংখ্যায় তারই কিছু কিছু লিখে জানাব। কিন্তু, শরীর এম্‌নি ভেঙে এল যে কিছুই লিখ্‌তে পার্‌লাম না। তবে, ভরসা এই যে তোমাদের কাগজও বন্ধ হবে না, আমিও হয়ত মারা যাব না। দেহটা একটু সুস্থ হলেই লিখ্‌তে সুরু কোর্‌ব। কথা না রাখ্‌তে পারার জন্য আমি নিজেই দুঃখিত, তার ওপর যদি আবার তোমরা রাগ কর ত, দুঃখ বেড়েই যাবে। এ তোমরা করবে না বেশ জানি।

তোমাদের

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

নলিনীকান্তের মুখের ভাব লক্ষ্য করে শরৎচন্দ্র বললেন—কিছু মনে কোরো না, ভাই! এইটেতেই চালিয়ে নাও এবারকার মতো। তোমার গ্রাহকরা তো আর তোমাকে দুষতে পারবে না, যা বলবার আমাকেই বলবে।

সেবার 'বিজলী'র শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ১৯২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। শরৎচন্দ্রের ওই চিঠিখানা ছাপা হয়েছে। চিঠিখানার আগে আছে এ-বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবেদন :

"আমরা প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা এই সংখ্যায় দেব; কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় লেখা পাঠাতে পারেন নি। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি অচিরে রোগমুক্ত হ'ন।

তিনি আমাদের যে চিঠিখানা পাঠিয়েচেন, তা' নীচে দেওয়া হ'ল।"

দিনের পর দিন নলিনীকান্ত চেষ্টা করে যেতে লাগলেন, কিন্তু লেখা আদায় হল না। আবার পুজো এসে গেল, এবারেও শরৎচন্দ্র কথা দিলেন যে শারদীয়া সংখ্যায় লেখা দেবেন, আবার লেখকদের তালিকায় তাঁর নাম ছাপা হল, ছাপাখানায় কপি দেওয়ার শেষ দিনটিতে নলিনীকান্ত খুব সকালে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত।

শরৎচন্দ্র বাড়ির ভেতরে ছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন—খুব সকাল সকাল এসেছ তো। এসেইছ যখন, তখন স্বচক্ষে একটি দৃশ্য দেখে যাও।

বলে নলিনীকান্তের একখানা হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন ভেতরে।

লম্বা রোয়াকে আট-দশজন লোক ঘুমুচ্ছে। নলিনীকান্ত জিজ্ঞেস করলেন —এরা কারা?

শরৎচন্দ্র বললেন—গাঁয়ে থেকে এসেছে সব মহালয়ার গঙ্গাস্নান করতে। বাড়িতে যেন বাজার বসিয়েছে হে! এর মধ্যে কিছু লেখা যায়,—তুমিই বলো?

বাইরের বসবার ঘরে এলেন দুজনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর নলিনীকান্ত বললেন—দাদা, লেখা যে পাব না তা আমি জানতাম। কিন্তু আমি আরও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি আজ।

—আবার কী হে?

নলিনীকান্ত বললেন—দাদা, 'বিজলী'তে যা মাইনে পাই তাতে সংসার চালানো দায়। কাজেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে কিছু রোজগার করতে হয়। খবর পেলাম, রামকৃষ্ণপুরে অমুকের বাড়িতে মেয়েদের গান শেখাবার জন্য তাঁরা একজন মাস্টার খুঁজছেন। সে-ভদ্রলোকটিকে তো আপনার বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। আপনি যদি তাঁকে একটু বলে দেন তাহলে কাজটি আমার হয়।

যাক, লেখা দেওয়ার ব্যাপার নয়, শরৎচন্দ্র যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন—তাকে আবার বলব কী, তুমি চলো, এখনই আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাদের বাড়িতে বহাল করে দিয়ে আসছি।

শরৎচন্দ্র বেনিয়ানটি গায়ে দিলেন, মোটা লাঠিটি হাতে নিলেন। বললেন—চলো।

দুজনে বেরিয়ে পড়লেন। সদর রাস্তায় একখানা খালি ট্যাক্সির দেখা পাওয়া গেল। নলিনীকান্ত ডাকলেন—ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি কাছে এসে দাঁড়াল।

শরৎচন্দ্র বললেন—এই তো রামকৃষ্ণপুর, মাইলটাক পথ। চলো, হেঁটেই যাব।

নলিনীকান্ত হাতজোড় করে বললেন—তা হয় না দাদা, আমার কাজে আপনাকে আমি অতদূর হাঁটিয়ে নিয়ে যাব না। উঠুন ট্যাক্সিতে।

নলিনীকান্তের পীড়াপীড়িতে শরৎচন্দ্রকে ট্যাক্সিতে উঠতেই হল। ট্যাক্সিতে উঠে তিনি একটা গল্প জুড়লেন। গল্প করতে করতে হঠাৎ চমকে উঠে বললেন —ওহে, আমরা যে রামকৃষ্ণপুর ছাড়িয়ে এসেছি! এ যে হাওড়া ময়দান।

নলিনীকান্ত বললেন—গল্পটা শেষই করুন না। ততক্ষণ একটু ঘুরিই না হয় ট্যাক্সি করে।

হাওড়া ময়দান থেকে বিস্তর রাস্তা পার হয়ে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পটুয়াটোলা লেনে।

শরৎচন্দ্র বললেন—এ কোথায় আনলে বলো তো?

নলিনীকান্ত বিনয় করে বললেন—দাদা, এটি আমার মেস। এইখানেই আমি থাকি। চলুন আমার ঘরে। সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে যখন পেয়েছি তখন একটু চা না খাইয়ে ছাড়ছি না। ভাববেন না, আবার আপনার সঙ্গে আমিও হাওড়া যাব।

নলিনীকান্ত ট্যাক্সিকে বিদায় করে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে উঠলেন দোতলায় নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ বাদে চাকর চা আর কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এল। এক পেয়ালা চা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য টেবিলে সাজিয়ে, টেবিলটির উপরে এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দেশলাই রাখলেন নলিনীকান্ত। তারপর একখানি রাইটিং প্যাড ও একটি ফাউণ্টেনপেন সেখানে রেখে বললেন—দাদা, চা খেয়ে দয়া করে আমার লেখাটি লিখুন। লেখা না দিলে আপনার নিষ্কৃতি নেই। আমি দরজা বন্ধ করে আরেকটি ঘরে রইলাম। লেখা শেষ হলে আমাকে ডাকবেন, দরজা খুলে দেব।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে নলিনীকান্ত বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিলেন। যাবার সময় দেখলেন শরৎচন্দ্র বিস্ময়-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘণ্টাতিনেক পর দরজায় ধাক্কা দিয়ে শরৎচন্দ্র চিৎকার করলেন—নলিনী দরজা খোলো।

দরজা খুলে নলিনীকান্ত ঘরে ঢুকলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—ধন্যি ছেলে যাহোক! এই নাও তোমার লেখা।

লেখাটির নাম—'দিনকয়েকের ভ্রমণকাহিনী'।

কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী 'আশুতোষ কলেজে'র অধ্যাপক ও 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার অন্যতম পরিচালক। 'পথের দাবী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। 'পথের দাবী'র কপি আনতে কুমুদচন্দ্র ঘন ঘন গিয়েছেন শরৎচন্দ্রের কাছে, মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত নিত্যই তাগাদা দিতে হয়েছে। সেসময়ে মাসের দু-তিনটি রবিবার সারাদিনই কুমুদচন্দ্রের কেটেছে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। ঘন ঘন তাগাদা দিলে শরৎচন্দ্র বলেছেন—কাল এসো। 'কাল' গেলে বলেছেন—পরশু। শেষ পর্যন্ত হয়তো সে-মাসে 'পথের দাবী'র কিস্তি বের করা গেল না; কিংবা পাঁচসাত দিন দেরি করে 'বঙ্গবাণী' বেরল। কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন: "পথের দাবীর কপির জন্য অনেক সময় তাঁহার বাড়ীতে সমস্ত দিন কাটাইতে হইত। কিন্তু বেলা ২টা/২৷৷টার সময় তিনি হয়ত বলিলেন,—বস, আমি খেয়ে আসি। তিনি খেতে গেলেন, খেয়ে এলেন, কিন্তু আমার খাওয়া সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করিলেন না; আবার গল্প করিতে লাগিলেন। শিবপুরে শরৎবাবুর বাড়ির পাশে ভূতনাথবাবু (মিত্র) নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি শরৎবাবুর খুব অনুগত ছিলেন,—তাঁহার বাড়ির বৈঠকখানার বারান্দায় শরৎবাবু মাঝে মাঝে বসিতেন...শরৎবাবুর অনেক ফরমাস এই ভূতনাথবাবুই খাটিতেন,—এই ভদ্রলোক ওমেগা ঘড়ির দোকানে কাজ করিতেন। কোন কোন দিন সকালে যখন শরৎবাবুর কাছে গিয়াছি, শরৎ-বাবুর বাড়িতে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছে,—শেষে তিনি আপিসে গিয়াছেন,—এবং আপিস হইতে আসিয়াও দেখিয়াছেন আমি বসিয়া আছি। তিনি শরৎবাবুর স্বভাব বেশই জানিতেন,—তাই আপিস হইতে ফিরিয়া আমাকে দেখিলেই গোপনে জিজ্ঞাসা করিতেন,—বামুন খেতে বলেছিল? তিনি শরৎবাবুর সম্বন্ধে বামুন বলিয়া উল্লেখ করিতেন। আমি "না" বলিলে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে লুচি ভাজাইয়া খাওয়াইয়াছেন। কিন্তু, আবার এমনও দিন গিয়াছে, শরৎবাবু বাড়ির ভিতর ডাকিয়া একত্র বসিয়া গুরুতর খাওয়া খাওয়াইয়াছেন।"

শরৎচন্দ্র যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় লিখেছেন তখন তিনি বাজেশিবপুরে থাকতেন না। সামতাবেড়ে অথবা বালিগঞ্জে থাকতেন।

কখনও কখনও চেষ্টা করেও শরৎচন্দ্র লিখে উঠতে পারতেন না। 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছেন—দুঃখের কথা বলব কি উপীন, আজ সমস্ত দিন ধস্তাধস্তি করেও দু-লাইনের বেশি লিখতে পারলুম না।

শরৎচন্দ্র যখন বালিগঞ্জে থাকতেন তখন লেখা আদায় করতে উপেন্দ্রনাথকে প্রায়ই বালিগঞ্জে যেতে হত।

আর শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়ে থাকতেন?

তখন 'বিচিত্রা'র জন্য লেখা নিয়ে আসতেন তুলসী। ইনি শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর ছোট জায়ের ভাই তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। ডেলিপ্যাসেঞ্জার। সামতাবেড় থেকে কলকাতায় চাকরি করতে আসতেন। আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ইনি 'বিচিত্রা' আপিসে শরৎচন্দ্রের লেখা দিয়ে যেতেন।

লেখা আসার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, তুলসীর কোনও খোঁজ-খবর নেই, উপেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। বেলা সাড়ে নটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পকেটে নিয়ে যেতেন একখানা চিঠি। চিঠিখানার সারমর্ম : "প্রিয় শরৎ, লেখা আসতে আর দেরি হলে অপদস্থ হতে হবে। দোহাই তোমার, যে রকম করে পার লেখা শেষ করে কাল তুলসীর হাতে পাঠিও। আমি আবার কাল যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে হাজির থাকব।"

কিন্তু হাওড়া স্টেশনে উপেন্দ্রনাথ আসেন কেন? কোনও কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিলে কি চলে না? এ-বিষয়ে স্বয়ং উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "লেখা পাবার জন্যে স্টেশনে আমি নিজে যাতায়াত করছি অবগত হলে লেখার বিষয়ে শরৎ একটু বিশেষভাবে তৎপর হবে—এই উদ্দেশ্যেই আমি হাওড়া স্টেশনে যেতাম।"

গেট পেরিয়ে এসে উপেন্দ্রনাথকে দেখতে পান তুলসী। ব্যস্তভাবে নীচু হয়ে প্রণাম করেন।

ভয়ে ভয়ে উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন—কী খবর তুলসী? এনেছ?

প্রণাম করে উঠে তুলসী বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, লেখা এনেছি।

পকেট থেকে শরৎচন্দ্রের লেখা বের করে উপেন্দ্রনাথের হাতে দেন।

লেখা নিয়ে আপিসে চলে আসেন উপেন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের লেখা পাঠিয়ে দেন ছাপাখানায়। আর শরৎচন্দ্রকে লেখা চিঠিখানা পকেট থেকে বের করে ছিঁড়ে ফেলে দেন।

শরৎচন্দ্রের লেখা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে অন্যরকম ঘটনাও আছে।

গেট পেরিয়ে এসে উপেন্দ্রনাথকে দেখতে পান তুলসী। ব্যস্তভাবে নীচু হয়ে প্রণাম করেন।

ভয়ে ভয়ে উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন—কী খবর তুলসী? এনেছ?

স্মিতমুখে তুলসী উত্তর দেন—আজ্ঞে না, আজ হয়ে উঠল না। কাল নিশ্চয় নিয়ে আসব।

পকেট থেকে শরৎচন্দ্রকে লেখা চিঠিখানা বের করে তুলসীর হাতে দিয়ে উপেন্দ্রনাথ বলেন—কাল নিশ্চয় আনা চাই তুলসী, নইলে মান থাকবে না। আপিস থেকে ফিরে গিয়ে তুমি একটু ভালো করে শরৎকে তাড়া দিও। কাল আবার আসব।

ব্যস্ত হয়ে তুলসী বলেন—আজ্ঞে না, আপনি কষ্ট করে আসবেন না, আমি না হয় আপিস যাবার পথেই দিয়ে যাব।

উপেন্দ্রনাথ উত্তর দেন—না, তোমার লেট হয়ে যাবে। আমিই আসব।

এক-আধবার উপেন্দ্রনাথ হাওড়া স্টেশনে দেখেছেন প্ল্যাটফর্মে তুলসীর

পাশে ধীরে ধীরে আসছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র—পকেটে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

গেট পেরিয়ে এসে উপেন্দ্রনাথকে একটা প্রণাম করেই তুলসী আপিসের দিকে ছুটলেন।

শরৎচন্দ্রের মুখে লজ্জা ও কৌতুকের মৃদুমধুর হাসি—ভারি কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, না?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—তা একটু দিয়েছ। কিন্তু আনন্দও তো দিলে।

শরৎচন্দ্র বললেন—কী করি বলো উপীন, পরশু সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে মনে বদ্ধপরিকর হলাম, চা খাওয়া সেরে তোমার লেখা নিয়ে বসতেই হবে। চা খাওয়ার পর যখন কাগজ-কলম নিয়ে বসবার কথা, ঠিক সেইসময়ে হঠাৎ লেগে গেলাম পুরনো বন্দুকের অংশগুলো খুলে পরিষ্কার করবার অকাজে। বন্দুকটা বহুকাল অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে, ভবিষ্যতে শীঘ্র ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই. অথচ বিনা কারণে অথবা প্রয়োজনে সেটাকে সাফ করতে বসে পড়লাম। এ তুমি বুঝবে না উপীন, আমার মধ্যে এমন এক বেয়াড়া মানুষ আছে. যে সময়ে সময়ে কাজ করবার ঠিক মুহূর্তটিতে অকস্মাৎ হাজির হয়ে অকাজ করিয়ে সব পণ্ড করে দেয়।

'অনাগত' নামে শরৎচন্দ্রের একখানা উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রা'য়—১৩৪২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে। সাতমাস পর দ্বিতীয় কিস্তি (প্রথম কিস্তি সমেত) প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্রে; বিশেষ কারণে তখন উপন্যাসটির নাম বদলে গেছে, নতুন নাম 'আগামী কাল'; নতুন নামটি দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'আগামী কালে'র আরেক কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওই পর্যন্ত। শরৎচন্দ্র 'আগামী কাল' সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের একদিন। দুপুরবেলা। বালিগঞ্জে নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছেন শরৎচন্দ্র।

'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এলেন। শরৎচন্দ্রের মস্ত ভক্ত। তাঁর বিস্তর স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছেন অবিনাশ।

খানিকক্ষণ অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শরৎচন্দ্র বললেন—অবিনাশ, শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে. আর বোধ হয় বেশী দিন দাদার উৎপাত সহ্য করতে হবে না।

অবিনাশ চুপ করে রইলেন।

দু-চার কথার পর শরৎচন্দ্র বললেন—আচ্ছা, আমাকে লেখার অনুরোধ জানিয়ে তোমার যে পত্রখানি প্রতি বৎসর পুজোর সময় আসে. সেটি সত্যিই পাঠাও কেন? কোনোদিন তো সাক্ষাতে আমার লেখা চাইতে তোমাকে শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এবারেও সেদিন তোমার একখানি অমনি ছাপা চিঠি

পেয়েছি, তাই তোমাকে দেখে সেটাই মনে পড়ে গেল। তুমি নিশ্চয় আজ লেখা চাইতে আসোনি?

অবিনাশ বললেন—আজ্ঞে না, ওর কথা আমার মনেই ছিল না। তাছাড়া আপনার কাছে আমি কোনোদিন লেখার প্রার্থী হয়ে আসি না।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন শরৎচন্দ্র। তারপর উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন—আচ্ছা অবিনাশ, তোমার কি আমার কাছে কিছুই চাইবার নেই? কাগজ চালাতে গেলে তো লেখার দরকার হয়।

অবিনাশ বললেন—দরকার যে হয় তা জানি। তবুও কেন জানি না, আপনার কাছে লেখা চাইতে কোথায় যেন আমার বাধে। তা ছাড়া বুড়ো-বুড়ো মানুষদের দিনের পর দিন আপনার কাছ থেকে মাসের লেখার অংশ যোগাড় করতে যে-রকম গলদঘর্ম হতে দেখেছি, তাতে আর আমার লেখা চাওয়ার উৎসাহ হয় না।

শরৎচন্দ্র একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—সত্যি অবিনাশ, এর জন্যে আমি ভারি দুঃখ পাই। কিন্তু বিশ্বাস করো, কারুকে ইচ্ছে করে আমি এ-কষ্ট দিই না। একেক সময় এমন হয়, দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতে কলম নিয়ে বসে আছি, কিন্তু একটি ছত্রও লিখতে পারি না। অথচ যাঁদের কাগজে ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হচ্ছে তাঁরা যদি ঠিক সময়ে লেখার অংশ না পান, তাহলে তাঁদের যে কী অসুবিধা হয় তা যে আমি বুঝি না তা নয়। কিন্তু আমার তো কোনও উপায়ই থাকে না। এই দ্যাখো না, সেদিন উপীন এসে একেবারে নাছোড়বান্দা—একটা নতুন উপন্যাস যদি 'বিচিত্রা'তে আমি না আরম্ভ করি তাহলে কাগজটা আর ও কিছুতেই চালাতে পারবে না। জানো তো, উপীনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী, ওর অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কত শক্ত। তবুও বললুম, দ্যাখো উপীন, যে-কাগজকে রবীন্দ্রনাথের 'পত্রধারা' বাঁচাতে পারছে না, তাকে আর কেউই বাঁচাতে পারবে না, ওকে নিশ্চিন্তে মরতে দাও, ওকে আর টানাটানি করে লাভ নেই। কিন্তু উপীন তা মানতে রাজী নয়। সে বলে, আমি যদি একখানা উপন্যাস আরম্ভ করি তাহলে ও আবার নতুন আশা নিয়ে কাগজ চালাবে। শেষ পর্যন্ত রাজী হলুম, খানিকটা লিখলুমও, কিন্তু আর তো পেরে উঠছি না, কতদিন থেকে তো আর লিখতে পারিনি।

আরও দু-চার কথার পর শরৎচন্দ্র বললেন—যাক, আজ বেলা হল, এখন বাড়ি যাও, পরশু সন্ধ্যার সময় একবার এসো, নিশ্চয় এসো, একটা বিশেষ দরকার।

তারপর একটু হেসে বললেন—তোমারও কিছু লাভ হবে। অতএব না এলে নিজেই ঠকবে।

অবিনাশ বিদায় নিলেন।

'পরশু সন্ধ্যার সময়' অবিনাশ হাজির হয়েছেন। বাইরের ঘরে খানিকক্ষণ বসবার পরই দেখা গেল—শরৎচন্দ্র নেমে আসছেন, হাতে খানকয়েক কাগজ।

ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে চায়ের জন্যে হুকুম করলেন।

চা এল। চা খাওয়া চলতে লাগল। একথা-সেকথার পর হাতের কাগজ-গুলো তুলে শরৎচন্দ্র বললেন—এগুলো কিসের কাগজ বলো তো?

কিন্তু অবিনাশকে কিছু বলতে হল না। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন—দ্যাখো, এটা একটা উপন্যাসের সূচনা, ভারী ভালো জিনিস, অনেকদিন এত ভালো আরম্ভ করে কিছু লিখিনি। এই লেখাটা যদি তোমাকে দিই, তাহলে কী করো?

অবিনাশ বললেন—যা করতে বলবেন তাই করব।

শরৎচন্দ্র বললেন—কিছুদিন ধরে একটা বড় উপন্যাসের ভাব মনের মধ্যে এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যে কিছুতেই তাকে তাড়াতে পারছি না। অথচ শরীর এত খারাপ যে তাকে কাজে লাগানোও যায় না। কিন্তু সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা জিনিস মাথায় এলো—যদি এটাকে আমি আরম্ভ করে দিলে তুমি আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারো তাহলে মন্দ হবে না।

অবিনাশ বললেন—বেশ তো। সে তো ভালোই হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তবে এ-ধরনের লেখায় যদি লেখকরা পরিশ্রম করতে না চায় তাহলে বই কখনও ভালো হয় না।...যাঁদের দিয়ে লেখাবে তাঁদের যেন লেখার প্রতি দরদ থাকে, আর সেই সঙ্গে লেখার শক্তিও থাকে, নইলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

অবিনাশ বললেন—কাদের দিয়ে লেখালে ভালো হয় তাঁদের নাম করুন না—চেষ্টা করে দেখব।

শরৎচন্দ্র বললেন—সাহিত্যিকরা তো সবাই তোমার বন্ধু। যাকে বলবে সে-ই তোমার জন্যে লিখে দেবে। ও নিয়ে তুমি ভেবো না।...

আরও দু-চার কথার পর শরৎচন্দ্র বললেন—আচ্ছা, কেন যেচে এই লেখাটা তোমায় দিচ্ছি বলো তো?

শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অবিনাশ।

শরৎচন্দ্র বললেন—দ্যাখো, যেদিন আমি থাকব না, সেদিন এই লেখাটাই তোমাকে তোমার শরৎদা'কে মনে করিয়ে দেবে। আমার হাতের লেখা এই কাগজগুলো কখনও কারুকে দিও না।

বলে শরৎচন্দ্র 'ভালমন্দ'র পাণ্ডুলিপি অবিনাশের হাতে তুলে দিলেন। এই লেখাটুকুই সম্ভবত শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ রচনা।

শরৎচন্দ্রের 'ভালমন্দ'র পাণ্ডুলিপির অংশ

চার

সভা-সমিতিতে যেতে শরৎচন্দ্র সহসা রাজী হতেন না।

১৯২৫ সালের এপ্রিলে মুনশীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি শরৎচন্দ্র আর ইতিহাসশাখার সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। মুনশীগঞ্জে একটা বাড়ির একই ঘরে দুজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

বহুদিন আগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিমলা স্ট্রীটের বাড়িতে রমেশ-চন্দ্র প্রথম দেখেছেন শরৎচন্দ্রকে। খুব অল্পক্ষণের জন্য দেখা। সেদিন বিশেষ কোনও কথাবার্তা হয়নি।

কিন্তু এবার মুনশীগঞ্জে আলাপ-পরিচয় খুব জমে উঠল।

সভায় যেতে হবে। 'সভাপতির অভিভাষণ' শরৎচন্দ্র লিখে এনেছেন। কিন্তু সভায় যাওয়ার সময় তিনি আর সেটি খুঁজে পাচ্ছেন না। বাক্স, বিছানা, জামার পকেট প্রভৃতি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। নেই।

সভার সময় পার হয়ে গেছে। সম্মেলনের পক্ষ থেকে কয়েকজন এঁদের নিয়ে যেতে এসেছেন।

শরৎচন্দ্র খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—এই একটু আগে আমি এই খাটে বসে ওটা পড়েছি, কোথায় গেল?

হঠাৎ রমেশচন্দ্রের মনে পড়ল যে কিছুক্ষণ আগে শরৎচন্দ্র তামাক খাওয়ার সময়—কলকেটা গরম ছিল বলেই হোক অথবা অন্য কোনও কারণেই হোক—খানিকটা কাগজ হাতের মুঠোয় নিয়েছিলেন এবং তামাক খাওয়ার পর সেই কাগজ দূরে ফেলে দিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন ঘরের এক কোণে বেনের পুঁটুলির মতো সেই কাগজের মোড়কটি পড়ে আছে।

কুড়িয়ে এনে রমেশচন্দ্র খুলে দেখলেন খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা একটি সাহিত্যিক সন্দর্ভ। শরৎচন্দ্রকে সেটি দেখিয়ে রমেশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—এটি কি?

রমেশচন্দ্রের হাত থেকে সেটি নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই শরৎচন্দ্র বললেন—আরে এই তো আমার অভিভাষণ! কোথায় পেলে?

হাসতে হাসতে সব কথা বললেন রমেশচন্দ্র। উপস্থিত সকলেই হাসতে লাগলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছুমাত্র অপ্রতিভ হলেন না।

আগেই বলা হয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে জগত্তারিণী মেডেল দিয়েছে। কিন্তু কনভোকেশনের দিন তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। হাজার হাজার লোকের সামনে মেডেল পরে আত্মপ্রসাদ লাভ করার প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। সেদিন তিনি সুধীরচন্দ্র সরকারের দোকানের নিভৃত কোণে আত্মগোপন করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "আমরা জানি, সর্ব্বপ্রথমে শরৎচন্দ্রকে যেদিন একটি সাহিত্যসভার সভাপতি করা হয়, সেদিনও তিনি সুধীরচন্দ্রের পুস্তকালয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু এমন লুকো-চুরি করে ছিনেজোঁক সভাওয়ালাদের কতদিন আর ফাঁকি দেওয়া যায়? শেষের দিকে শরৎচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে সভার অত্যাচার সহ্য করতে হত, কিন্তু তাঁর লাজুক ভাব কোন কালেই যায়নি।"

হাওড়া টাউনহলে সভা। শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করবেন। শরৎচন্দ্র খবর পাঠিয়েছেন সজনীকান্ত দাসকে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সজনী-কান্ত লিখেছেন: "উত্তর দ্বার দিয়া ঢুকিয়া সিঁড়িপথে দোতলায় উঠিলেই চওড়া বারান্দা এবং তাহারই সংলগ্ন প্রকাণ্ড হল। লোকে লোকারণ্য। শরৎচন্দ্র সভা আলো করিয়া সভাপতির আসনে বসিয়া আছেন। আমি বারান্দা ও হলের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছি, তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সভার শালীনতা ভঙ্গ করিয়া আমাকে বেশ জোরেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া চৌকি হইতে নামিয়া পাশের উত্তর-পূর্ব কোণের বিশ্রামঘরে গিয়া ঢুকিলেন। সভায় বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, শরৎচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পরে বুঝিয়াছিলাম, সভাপতির আসনে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অস্বস্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন, আমাকে উপলক্ষ্য পাইয়া তিনি বাঁচিয়া গেলেন। তাঁহার এই সভা-ভীতি বরাবরই ছিল।"

শরৎচন্দ্রের পিছনে পিছনে সজনীকান্তও বিশ্রামঘরে গেলেন। শরৎচন্দ্র ততক্ষণে একটা আরাম-কেদারায় বসেছেন, ভক্তেরা সাজা কলকে বসিয়ে তাঁর হাতে সট্‌কা তুলে দিয়েছে। সজনীকান্তকে পাশের চৌকিতে বসতে বললেন।

সভায় গুঞ্জন উঠেছে। সভার উদ্যোক্তাদের মুখে সে-খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র বিরক্তভাবে বললেন—আর কাউকে বসিয়ে দাও গে, সজনীর সঙ্গে আমার জরুরী কাজ আছে।

আর সকলকে বিদায় দিয়ে শরৎচন্দ্র ওই বিশ্রামঘরে শুধু সজনীকান্তের সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলতে লাগলেন। সজনীকান্ত ঘণ্টাখানেক ছিলেন সেখানে; এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শরৎচন্দ্র আর সভামণ্ডে যাননি।

কলকাতার কিসের একটা সভা—শরৎচন্দ্র সভাপতি। খাওয়া-দাওয়ার পর কয়েকজনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে রওনা হয়েছেন।

পিছন থেকে কে ডাক দিল—দাদাঠাকুর!

সর্বনাশ, পিছনে ডাক! তুলসীবাবু সভয়ে বললেন—বিপদ-আপদ না হলে বাঁচি।

শরৎচন্দ্র বললেন—ঘটবে বলেই তো ঠেকছে, সভাপতি করেছে—বক্তৃতা না করিয়ে কি ছাড়বে?

আবার বলি, সভাসমিতিতে যেতে তিনি সহসা রাজী হতেন না। শরৎচন্দ্র বলেছেন: "বক্তৃতা দিতে হইবে মনে হইলেই আমার হৃৎকম্প হয়। আমি কিছুই বলিতে পারি না।"

সুরেন্দ্রনাথ রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন শরৎচন্দ্র। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বেহালার লোকজন একটি স্মৃতিসভার আয়োজন করেছে। সেই সভায় পৌরোহিত্য করার জন্য অনুরোধ করা হল শরৎচন্দ্রকে। তিনি রাজী হলেন।

সুরেন্দ্রনাথের পুত্র মণীন্দ্রনাথ বিস্তর স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছেন শরৎচন্দ্রের কাছে। সভার দিন সকালেই মণীন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্র। বললেন—পাছে না আসতে পারি মণি, তাই সকালবেলাই চলে এলাম, তোমার বাবাকে আমি বড় ভালোবাসি, তাঁর প্রতি আমার একটা সত্যিকারের শ্রদ্ধা চিরদিন আছে, এ-সভায় আমি যে আসতে পারবই এ আমার মন থেকে ডেকে বলেছে।

কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন: "বক্তৃতা দেওয়ায় শরৎবাবুর অত্যন্ত ভয় ছিল। সভায় তাঁহার কোন কথা বলিতে হইলে অথবা কিছু পড়িতে হইলে তিনি একেবারে সঙ্কুচিত ও বাকবিরহিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু বড় হওয়ার বড় জ্বালা,—তিনি বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করিতেন, কিন্তু লোকে তাঁহাকে ছাড়িত না। তিনি অকপটভাবে নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতেন, কিন্তু তবুও লোকে তাঁহাকে ছাড়িত না। এরূপস্থলে অনেক অশোভনীয় ব্যাপার সংঘটিতও হইত। একবার তাঁহাকে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যের সভাপতি করা হয়। তিনি প্রথমে না-না করিয়া শেষে স্বীকার করিলেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের তরফ হইতে ঘটা করিয়া তাঁহার নাম প্রচার করা হইল,—দেশবিদেশ হইতে লোক সভায় যাইতে লাগিল। সভার তারিখের দিন পনের আগে তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, দুইজন লোক সভার ২/৩ দিন পূর্বে সামতাবেড় আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবে। শরৎবাবু আমাকে বলিলেন, তুমি অবশ্য অবশ্য অমুক তারিখে সকালে আসিয়া এ-মাসের লেখাটা নিয়ে যাবে। তিনি আমাকে যে-তারিখে যাইতে বলিলেন, সেই তারিখে তাঁহার পশ্চিমে যাইবার কথা। আমি যথাসময়ে গিয়া দেখি তাঁহার বাড়িতে দুইজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন. কিন্তু সেখানে শরৎবাবু নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম. "শরৎবাবু কোথায়?" একজন বলিলেন, তিনি উপরে। আর একজন বলিলেন,—তাঁর

অসুখ করেছে। আমি তখনই অনুমান করিলাম যে, যাইবার প্রাক্কালে তাঁহার সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে, দেহ-মন সঙ্কুচিত, ভীত ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে,—তিনি আর যাইতে চাহিতেছেন না। শেষে তাহাই হইল,—তিনি গেলেন না,—ভদ্রলোক দুইজন মর্মাহত হইয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে ফিরিয়া গেলেন। আমরা একসঙ্গেই ফিরিলাম। পথে ভদ্রলোক দুইজন কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলিতে লাগিলেন, কি হবে বলুন দেখি। পশ্চিমের সমস্ত শহর থেকে শরৎবাবুকে দেখবার জন্য লোক ভেঙে আসচে,—আমরা কি করে মুখ দেখাব বলুন দেখি।"

এইরকম ঘটনা আরও বহুবার ঘটেছে। বেহালার মণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন : "শরৎবাবু কোন সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করতে কোনোদিনই সহজে রাজী হন না। এ দুর্নাম তাঁর চিরদিনই আছে যে আসবেন বলে অনেক সভায় তিনি নির্দিষ্ট দিনে আসেন নি। তাঁকে এর কারণ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে তিনি আমায় বলেন—"দেখ মণি, যে সভাসমিতিতে আমার সত্যিকার দরদ আছে, তাতে আমি কোনোদিনও যেতে অবহেলা করিনি। তাছাড়া আমি বক্তৃতা কোনোদিনও করতে পারি না—ও কাজ আমাকে দিয়ে কোনো মতেই হয়ে ওঠে না—কেবল কাঠের পুতুলের মত বসে থাকার সার্থকতা কি?" আমি নিজেও জানি যে তিনি আমাদের এখানকার আর্য্য সমিতিতে সভাপতিত্ব করবার জন্য তরুণদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন—স্বীকারও তিনি করেছিলেন আসবেন—সমস্তই প্রস্তুত...সভামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য—পত্রপুষ্পে সজ্জিত। সাড়ে পাঁচটায় সভাপতির আসবার কথা...সব লোক শরৎবাবুর আশায় উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন—কিন্তু সভাপতি ছ'টার মধ্যেও যখন এলেন না—তখন শেষে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবই এই সভার সভাপতিত্ব করতে বাধ্য হলেন।"

বহরমপুরের একটি ঘটনা আছে।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবের আর মাসখানেক বাকি। শরৎচন্দ্রকে যদি এই পুনর্মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি করে আনা যায়!

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তখন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সৈদাবাদ রাজবাড়ির কাছে একটি বাড়িতে থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হল কয়েকজন ছাত্র—যেমন করেই হোক শরৎচন্দ্রকে এই পুনর্মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি করে আনতে হবে।

কাশিমবাজার রাজ-এস্টেটের ইঞ্জিনিয়ার তখন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সাবিত্রীপ্রসন্নের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ি খুব কাছে।

ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে এলেন যতীন্দ্রনাথের বাড়িতে। ঠিক হল, দুজনে অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করবেন। শরৎচন্দ্রকে সভায় নিয়ে আসা অসাধ্যসাধনই বটে।

পরের সপ্তাহে দুজনে উপস্থিত হলেন বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে। সব শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—ছাত্রেরা যখন আমাকে চায় তখন যাব। কিন্তু তোমরা যে বিশ্বসুদ্ধ লোককে ডেকে এনে আমাকে অপ্রস্তুত করবে তা কিন্তু হবে না। তোমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসবেন, ধোপদোরস্ত পোষাকে আসর জমিয়ে বসে মনে মনে, মনে মনে কেন, জনান্তিকে বলবেন—এ লোকটা নোংরা গল্প-উপন্যাস লিখে নাম কিনেছে, ছাত্রেরা এ-রকম লোককে নিয়ে মাতামাতি করছে কেন?—আর আমি উচ্চাসনে একটি অতি দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে বসে লোক-নিন্দা কুড়োবো!

সহসা শরৎচন্দ্র যেন কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—তোমাদের কাছে কী দোষ করেছি বাপু, তোমাদের ভালোবাসি বলে আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে—না বাপু, ও আমার পোষাবে না। বেশ আছি, বসে বসে যা মনে আসে লিখি, গড়গড়ায় তামাক খাই, ইচ্ছে হলে লাঠিখানা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে আসি। কারও তোয়াক্কা রাখিনে।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের সম্মতি নিয়ে দুজন মহানন্দে ফিরে এলেন। সর্বাগ্রে সংবাদটি দিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রকে। তিনি খুব খুশি হলেন. তক্ষুনি কলেজে খবর পাঠিয়ে দিলেন।

বহরমপুর কলেজে সাড়া পড়ে গেল। বিরাট আয়োজন হল। আশা করা গিয়েছিল সভায় অন্তত বিশ-পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হবে। সেই সভাতেই হবে শরৎ-সংবর্ধনা।

উৎসবের আগের দিন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে শরৎচন্দ্র বহরমপুর স্টেশনে পেঁছিলেন। কলেজের ছাত্র আর অধ্যাপক ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক স্টেশনে শরৎচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন। মহারাজার পক্ষ থেকে এসেছেন মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী।

শ্রীশচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ আর সাবিত্রীপ্রসন্ন মহারাজের মোটরে উঠলেন শরৎ-চন্দ্রকে নিয়ে। তারপর সৈদাবাদ রাজবাড়ি। সেখানেই শরৎচন্দ্রের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সম্মানিত অতিথির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেখানে বিপুল আয়োজন।

বিপুল আয়োজন দেখে শরৎচন্দ্র বিন্দুমাত্র খুশি হননি। বললেন—এসব আমার ধাতে সয় না। বেশি আড়ম্বর দেখলে আমি আড়ষ্ট বোধ করি।

তারপর হাসতে হাসতে শ্রীশচন্দ্রকে বললেন—তবে আপনারা যে এই গড়-গড়াটার ব্যবস্থা রেখেছেন এবং আমি আসামাত্র নলে মুখ দিতেই যে ফৌজদারী বালাখানার কড়ামিঠে তামাকের আমেজটুকু পেলাম এতেই খুব খুশি হয়েছি —কিন্তু দোহাই আপনার মহারাজকে যেন একথা বলবেন না—গুরুজন।

বলে শরৎচন্দ্র দু-হাত তুলে মাথায় ঠেকালেন।

যতীন্দ্রনাথ বাড়ি ফেরার পথে সাবিত্রীপ্রসন্নকে বললেন—যাক, শরৎদা অতঃপর এসে পেঁছেছেন, এখন শেষরক্ষা হলে হয়।

পরদিন যতীন্দ্রনাথ সকালবেলা সাবিত্রীপ্রসন্নের বাড়িতে এসে উপস্থিত। বললেন—ওহে, শরৎদা ডেকে পাঠিয়েছেন রাজবাড়ির হরকরা দিয়ে। চলো যাই একবার।

দুজনে গেলেন সৈদাবাদ রাজবাড়িতে। শরৎচন্দ্র তখন ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে গড়গড়া টানছেন। চায়ের সরঞ্জাম পড়ে আছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—এই যে তোমরা এসেছ—বেশ, বেশ!—চায়ের পাত্রে অনেকখানি চা আছে, বিস্কুট সন্দেশ আছে ওই রেকাবিতে—খাও, খাও, দেরি কোরো না, চা জুড়িয়ে যাবে। এখানকার ছানাবড়া নাকি খুব বিখ্যাত—ওঁরা বলছিলেন।

কেমন যেন গম্ভীর দেখালো শরৎচন্দ্রকে।

একথা-সেকথার পর শরৎচন্দ্র বললেন—তোমাদের সভা তো সেই চারটে নাগাদ। আমি ভাবছি—তোমরা সকাল করে খেয়েদেয়ে এসো—সিরাজের কবরটা দেখে যাব অনেকদিনের ইচ্ছা—ফিরবার পথে হাজারদুয়ারী, নবাবের বাড়ি ও জাহানকোষের কামানটাও দেখে আসা যাবে। কী বলো?

দুজনে চুপ।

কিন্তু শরৎচন্দ্র চুপ করলেন না। আবার বললেন—মহারাজের মোটর-গাড়িটা মোতায়েন আছে—তিনজন মিলে যাব—কতক্ষণ আর সময় লাগবে? ঠিক সময়ে এসে পেঁছে যাব। কী বলো?

কী আর বলা যায়!

দুজনে বিদায় নিলেন। কথা দিয়ে গেলেন যে দশটা নাগাদ লালবাগ যাবেন।

যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে এলেন। শরৎচন্দ্র তখন স্নানটান সেরে তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ওঁদের সাড়া পেয়ে চোখ মেলে একটু হেসে বললেন—এই যে তোমরা এসে গেছ। আমিও ড্রাইভারকে তেল নিয়ে দেউড়িতে অপেক্ষা করতে বলেছি।

রওনা হতে আরও আধঘণ্টাখানেক লাগল।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "মুর্শিদাবাদে পেঁছেই আমরা গঙ্গা পার হয়ে চলে গেলাম ওপারে, সিরাজ ও লুৎফার কবরস্থানে। চারিদিকে বড় বড় গাছ,—ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল। ঘেরা পাঁচিলের জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে,—নীরব নির্জন সমস্ত পরিবেশটি যেন থমথম করছে। কবর-রক্ষক ফকিরবেশী একজন সামনে এসে দাঁড়াল—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সিরাজের সমাধির দিকে। মাটিতে বসে

পড়লেন শরৎচন্দ্র—তাঁর একটি হাত কবরের উপর আর একটি হাত আলগা হয়ে পড়ে রইল তাঁর হাঁটুর উপর। মুখে কথা নেই—কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু মাঝে মাঝে হাওয়া এসে স্খলিত শুষ্ক পত্রে মর্মর ধ্বনি তুলছে—অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে—পাছে সিরাজের ঘুম ভেঙে যায়। আমাদের মুখেও কথা নেই—সেই গম্ভীর পরিবেশে আমাদের মনটাও যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সেই অনন্ত স্তব্ধতার মধ্যে, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের আত্মা যেন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করল—। চেয়ে দেখলাম শরৎচন্দ্র যেন ধ্যানসমাহিত—নত নেত্রে মাটির দিকে চেয়ে আছেন—তাঁর অন্তরের কি এক গভীর জিজ্ঞাসা যেন বাংলার অলিখিত অসমাপ্ত ইতিহাসের মধ্যে তার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরিবেশটি ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠল আমাদের কাছে—কিন্তু শরৎচন্দ্রের মানসলোকে তখন হয়ত মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা, তরুণ নবাব সিরাজের নিরুপায় অবস্থা—জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণ-বল্লভ, রবার্ট ক্লাইভ, ড্রেক, ওয়াটস প্রভৃতির মুখ ভেসে উঠছে—সেই সঙ্গে বুঝি ভেসে উঠল মীরমদন মোহনলালের মুখ—তাই শরৎচন্দ্র একবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন।”

এদিকে প্রায় তিনটে বাজে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন—আর তো না উঠলে চলে না।

শরৎচন্দ্র বললেন—গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি।

যতীন্দ্রনাথ বললেন—আর বসবার সময় কই?

সেকথার কোনও উত্তর দিলেন না শরৎচন্দ্র। শুধু একবার উদাস চোখে যতীন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন।

কিছুতেই ছাড়লেন না শরৎচন্দ্র। অগত্যা গঙ্গার ধারে বসতেই হল।

শরৎচন্দ্র বললেন—না হয় একটু দেরিই হবে। সভায় লোক জমতে জমতে পেশছে যাব। তাছাড়া ড্রাইভারটি খুব ভালো।

পার হওয়ার জন্য যখন নৌকোয় উঠলেন সকলে তখন চারটে বেজে গেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—না, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, চলো ফেরা যাক, আর কিছু দেখব না।

ওপারে পেশছে শোনা গেল ঘণ্টার শব্দ—নবাবপ্যালেসের পেটাঘরিতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। সভায় যাঁরা এসেছিলেন এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাঁরা চলে গেছেন!

ড্রাইভার খুব জোরে গাড়ি চালাল। কিন্তু সৈদাবাদ রাজবাড়ির ফটকে যখন পেশছনো গেল তখন আর বিন্দুমাত্র আশা-ভরসা নেই—সাড়ে ছটা বেজেছে।

গাড়ি থেকে নেমে শরৎচন্দ্র বললেন—না, খুব অন্যায় হয়ে গেল।

বলে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। কারও দিকে ফিরেও তাকালেন না।

সাবিত্রীপ্রসন্ন আর যতীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে হেঁটে চললেন রাস্তায়—পা যেন আর চলতে চায় না। যতীন্দ্রনাথ বললেন—আচ্ছা কর্মভোগে পড়া গেল বটে।

রাস্তাতেই খবর পাওয়া গেল—লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল সভা, হাজারখানেক মেয়ে পর্যন্ত সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অপেক্ষা করে বসেছিলেন, অবশেষে মহারাজ হাতজোড় করে সভাস্থ সকলকে বলেছেন, 'বুঝতে পারছি না শরৎবাবু কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন? লোক পাঠিয়েছি সে এখনো ফিরে আসেনি। আপনারা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন।'—নমঃ নমঃ করে সভা শেষ করা হয়েছে।

পরদিন সকালে? সাবিত্রীপ্রসন্ন লিখেছেন: "সকালে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম তিনি রাত্রির গাড়ীতেই কলিকাতা ফিরে গেছেন।"

এই ঘটনার অনেকদিন আগে একটি শোকসভায় সভাপতিত্ব করেছেন শরৎ-চন্দ্র। কোনও শোকসভায় অমন অভাবনীয় সভাপতিত্ব সম্ভবত আর কেউ কখনও করেননি।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিশেষ অনুরাগী শরৎচন্দ্র। ১৯২২ সালের ২৫ জুন সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন।

বহু সাধ্যসাধনার পর একটি সত্যেন্দ্র-শোকসভায় সভাপতিত্ব করতে রাজী হয়েছেন শরৎচন্দ্র।

ঠিক হয়ে আছে গান গেয়ে সভার উদ্বোধন করবেন নজরুল ইসলাম, তারপর নানাজন বক্তৃতা দেবেন, তারপর সভাপতির অভিভাষণ, সমাপ্তি-সঙ্গীতটি গাইবেন নলিনীকান্ত সরকার।

যথাসময়ে সভাপতির আসনে বসলেন শরৎচন্দ্র।

টেবিলে সভার কার্যসূচী রাখা আছে। তিনি তুলে নিয়ে পড়লেন। পড়েই বললেন—নজরুল, গাও হে!

নজরুল ইসলাম গান গেয়ে সভার উদ্বোধন করলেন।

তারপর শরৎচন্দ্র প্রথম বক্তাকে আহ্বান করলেন। প্রথম বক্তা মন্মথমোহন বসু। তিনি প্রায় আধঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন।

কিন্তু মন্মথমোহনই একমাত্র বক্তা নন। তারপর আরও কয়েকজন বক্তা সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানাকথা বললেন।

তারপর সভাপতির অভিভাষণের পালা। শরৎচন্দ্র অভিভাষণ দিলেন। আজ পর্যন্ত কোনও শোকসভায় কোনও সভাপতি সম্ভবত অমন অভিভাষণ দেননি। অভিভাষণটি অনেকটা এইরকম: "আজ আপনারা কবি সত্যেন্দ্রনাথ

দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে এখানে এসেছেন;—ভালোই করেছেন। বড়-মানুষরা মারা গেলে পাঁচজনে মিলে সভায় গিয়ে শোক প্রকাশ করে, আপনারাও করেছেন। বেশ করেছেন। সত্যেনবাবু প্রতিভাবান কবি ছিলেন, তাঁর উপর সকলের শ্রদ্ধা থাকবারই তো কথা,—তাঁর অভাবে দুঃখ হবারই তো কথা। আমাদের বারোজন ইয়ারের তিনি একজন ছিলেন, আমরা তাঁর অভাব বোধ করছি। সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁর গ্রন্থপাঠের ভিতর দিয়ে। সত্যেন-বাবুর বই আপনারা কে কয়খানা কিনে পড়েছেন, সেইটুকুর হিসেব করলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার হিসেবও পাওয়া যাবে। সত্যেনবাবুর লেখা পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তিনি কত বড় কবি ছিলেন। মন্মথবাবু অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন, তিনিও হয়তো পড়ে থাকবেন। আরও অনেকে বললেন। ভালোই বললেন। নজরুল গানটি গাইলে। ভালোই গাইলে। নলিনী, এবারে তুমি গাও হে! ভালোই হবে।"

এই অভিভাষণটি দিয়ে সভাপতি শরৎচন্দ্র নিজের আসনে বসে পড়লেন।

কবি শশাঙ্কমোহন সেন কৌতুক করে বললেন—শরৎবাবু, আপনার ভাষণই সবচেয়ে ভালো হয়েছে—এটা তৈরি করতে আপনার ক'দিন লেগেছে?

শরৎচন্দ্র হাসলেন। বললেন—আমাকে জোর করে সভাপতি করার এই ফল—আমার কোনও দোষ নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উত্তরকালে শরৎচন্দ্র বলেছেন : "পরলোকগত সত্যেন দত্তর শোক বাসরে গিয়ে দেখেছিলাম, অনেকে সত্যিই কাঁদছেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম,—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এ রকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি—সে দিন বলেছিলুম, এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন কিন্তু জানেন কি যে বারো বছরে তাঁর পাঁচ-শখানা বই বিক্রি হয় নি। অনেকে বোধ করি তাঁর সব পুস্তকের নাম পর্যন্ত জানেন না। অথচ, আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে।"

পাঁচ

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন : "মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।"

একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বললেন—কলম ছেড়ে রাজনীতিকের দলে ভিড়ে পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নয়।

শরৎচন্দ্র সহাস্যে বললেন—আমি কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলম ছেড়ে চরকাই ধরেছি।

শরৎচন্দ্র, ১৯২১ সালের ২৭ জুন, লিখেছেন : "এখন আমার এক মুহূর্ত্তের সময় নেই। কংগ্রেসের কাজটা যদি সার্থক হয় ত আবার হয়ত সময় পাওয়া যাবে। আজকাল আমার সেই দু'বছর আগের মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলন্‌টিয়ার—আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬/৭ জন যখন 'জান্ গিয়া' ব'লে গুলি খেয়ে প'ড়ে ম'রে গেল—তখন আমি পালাই নি কিন্তু আমার লাগে নি। অনেক দিন আশ্চর্য্য হয়েছি, সেদিন কি কোরে মেশিনগানের গুলি লাগে নি। আজ মনে হয় তারও প্রয়োজন ছিল।"

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সবসময় শরৎচন্দ্রের মতের মিল হয়নি। কিন্তু মুখের কথায় ও কলমের লেখায় শরৎচন্দ্রের কাছে গান্ধীজী সবসময়েই 'মহাত্মা' থেকেছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় 'বাঙলার কথা' নামে একখানা সাপ্তাহিক-পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। প্রথম সংখ্যায় দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কারও লেখা ছাপা হয়নি।

ভারতবর্ষের মাটিতে প্রিন্স অব ওয়েলস প্রথম পদার্পণ করেছেন ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর। সেদিন কলকাতায় সম্পূর্ণ হরতাল হয়েছে। ১৯২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতা এসেছেন। 'বিজলী,' ১৯২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর, লিখেছে : "২৩শে ডিসেম্বর বিকেলবেলা থেকেই দোকানপাট বন্ধ হওয়া সুরু হল। ২৪শে তারিখ প্রাতঃকালে সমস্ত দোকানপাট,

গাড়ী ঘোড়া রিক্সা-ট্যাক্সি সব বন্ধ।"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসা তখন শিবপুরে। হরতালের দিন সকাল আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ শরৎচন্দ্র খালি পায়ে উপেন্দ্রনাথের বাসায় এসে উপস্থিত। বললেন—উপীন, শুনছি হাওড়া স্টেশনে ভারি দুরবস্থা। ট্রেনে ট্রেনে বহু লোক না জেনে এসে পড়েছে। শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা খাবার পাচ্ছে না, স্ত্রীলোকেরা বাড়ির যাবার গাড়ি পাচ্ছে না। যাবে? যদি কোনও কাজে লাগতে পারি।

উপেন্দ্রনাথ আপত্তি করলেন না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হল যে বারদৌলি তালুকে সংগ্রাম আরম্ভ হবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেসময়ে অন্তত তিরিশ হাজার নরনারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণে, ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুআরি, গোরখপুর জেলায় চৌরিচৌরা থানার কয়েকজন পুলিশ আগুনে পুড়ে মরেছে। এই ঘটনার ফলে বারদৌলিতে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাবের দৌলতে সমবেত আইন অমান্য স্থগিত রাখলেন। ইতিহাসে এই আইন অমান্য স্থগিতের নাম—বারদৌলি হল্ট।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় একদিন দেখা করতে গেলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে। দেখলেন, বারদৌলি হল্টে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত, তাঁর মন একেবারে ভেঙে গেছে। শরৎচন্দ্র বললেন—মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ-অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানো। মাস্ রেভলিউশন একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। এ-মুভমেন্ট আর রিভাইভ করবে না।

আরেকদিন শরৎচন্দ্র কথায় কথায় শচীনন্দনকে বললেন—দ্যাখো, ভেবেছিলুম এই আন্দোলনে স্বরাজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, তা মহাত্মাজী আন্দোলন আরম্ভই করলেন না।

সমস্ত মুখে গভীর বেদনা, দুচোখ সজল, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় নলটি তুলে মুখে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে সহসা উত্তেজিত হয়ে গড়গড়ার নলটি লাঠির মতো শূন্যে তুলে বললেন—গোটাকতক কনস্টেবল ইনফিউরিয়েটেড মবের হাতে পুড়ে মরেছে, তাতে কী হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে—সেই শোণিতপ্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?

কিছক্ষণ চুপ করে থেকে শরৎচন্দ্র আবার বললেন—নন-ভায়ওলেন্স খুব

নোবল আইডিয়া কিন্তু Achievement of freedom is nobler—hundred times nobler.

কংগ্রেসকর্মী হিসেবে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের অহিংসনীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁর কাছে অকৃপণভাবে সাহায্য পেয়েছে।

স্বনামধন্য বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা। বয়সে ছোট, বিপিনবিহারীকে তিনি নাম ধরে ডাকতেন। বিপিনবিহারীর উপর শরৎচন্দ্রের ভালোবাসার অন্ত নেই। বহুবার শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বলেছেন—কী অদ্ভুত এই বিপ্লবীরা তার একটা দৃষ্টান্ত আমাদের বিপিন। কী কষ্টই দেশের জন্য সারা জীবন করছে, অর্ধেক জীবন তো জেলেই কাটালো। কত বলি, বিপিন, আমার বাড়িতে এসে দু-চার দিন থাকো, একটু ভালো খাও, একটু ভালো বিছানায় শোও, একটু আদর-যত্ন নাও, তা ওর সময়ই হয় না। সময় হবে কোত্থেকে, দেশের চিন্তা ছাড়া ওর কি আর কোনও চিন্তা আছে? কিছুই নেই।

কয়েকজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়ে হুগলী জেলে আছেন, চুঁচুড়া আদালতে তাঁদের বিচার হচ্ছে। এই বিপ্লবীদের মধ্যে একজনের নাম স্বদেশরঞ্জন দাশ। স্বদেশরঞ্জন আদালতে একদিন শচীনন্দনকে বললেন—ভাই, জেলখানাতে সময় কাটানোর জন্যে কিছু বই দিয়ে যেও, আর শরৎদাকে আমাদের প্রণাম দিও।

খবর শুনে শরৎচন্দ্র তাঁদের জন্য অনেক টাকার বই কিনে দিয়েছেন। স্বদেশরঞ্জন একখানা ভালো গীতা চেয়েছিলেন। নিজে দোকানে দোকানে ঘুরে শরৎচন্দ্র তিনখানা ভালো গীতা এনে পাঠিয়েছেন।

বিপ্লবীরা নিতান্ত ভ্রান্ত, তাঁদের কাজকর্ম দেশের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর—এমন কথা শরৎচন্দ্র শুনেছেন এবং শুনে দুঃখিত হয়েছেন। বলেছেন—আমরা নন-ভায়োলেন্স গ্রহণ করেছি, কিন্তু যারা তা করেনি, করেনি বলেই যে তারা ভ্রান্ত একথা কী করে বলা যায়? ভারত উদ্ধার আমাদের পথেই হবে, অন্য কোনও পথে হবে না এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়? হাসতে হাসতে যারা ফাঁসিতে ঝুলছে তারা দেশের স্বাধীনতাকে পেছিয়ে দিচ্ছে একথার মধ্যে গোঁড়ামি ছাড়া আর কি থাকতে পারে? মহাত্মাজীর কথা আলাদা, নন-ভায়োলেন্স হচ্ছে তাঁর অন্তরের জ্বলন্ত বিশ্বাস, এ তাঁর আদর্শ, এর চেয়েও ধ্রুব কোনও নীতি তাঁর জীবনে আর নেই, দেশের স্বাধীনতার চেয়েও অহিংসাই তাঁর কাছে বড়। তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করি তাঁর সততা ও আন্তরিকতার জন্যে, তেমনি যাদের জীবনে সবচেয়ে ধ্রুব সত্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা, সমান আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে যারা ভায়োলেন্সের পথ গ্রহণ করেছে, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়ে যারা স্বাধীনতার রাস্তা তৈরি করছে, তাঁদেরও সমান শ্রদ্ধা করি, তাঁরা আমার নমস্য।

শরৎচন্দ্র, ১৯২২ সালের ১৪ জুলাই, বলেছেন : "হাবড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটীর আমি ছিলাম সভাপতি। আমি ও আমার সহকারী বা সহকর্ম্মী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই পদত্যাগ করেছেন।"

কিন্তু এই ইস্তফাই শেষ কথা নয়। আবার হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছেন শরৎচন্দ্র।

১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিচার হল ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ১৯২২ সালের ৭ ফেব্রুআরি। ছ-মাস কারাদণ্ডের হুকুম পাওয়া গেল। জেল থেকে দেশবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন ১৯২২ সালের ৯ অগস্ট।

মির্জাপুর পার্কে একটি জনসভায়, ১৯২২ সালের ২০ অগস্ট, দেশবন্ধু সংবর্ধিত হয়েছেন। এই সভায় দেশবন্ধু স্বদেশবাসীদের পক্ষ থেকে একখানা অভিনন্দনপত্র পেয়েছেন। শরৎচন্দ্র অভিনন্দনপত্রখানা লিখেছেন :

"শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু—

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি-পথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল. সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেমনই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক। কিন্তু. আর একদিন এই বাঙ্গলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাঙ্গলার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে. তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই. হয়ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে. কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল. সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সর্ব্বস্ব

পণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা নাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্ব্বলোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল,—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

এই ত তোমার ব্যথা! এই ত তোমার দান!

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না—তাই, বাঙ্গলা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ, তাই ত, আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটী যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনই করিয়াই মানবজীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনিই করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যত দিন সংসারে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, তত দিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতির সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেক দিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্ব্বের বড়

গর্ব্ব,—বাঙালী তুমি; তাই ত সমস্ত বাঙলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছে,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ, —তুমি চিরজীবী হও! তুমি জয়যুক্ত হও!

তোমার গুণ-মুগ্ধ—স্বদেশবাসিগণ।"

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। আগেও একবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। গয়াতে তুমুল মতবিরোধ হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির পদ ছাড়লেন কিন্তু কংগ্রেস ছাড়লেন না। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুকে নিয়ে তিনি নতুন একটি দল গড়ে তুললেন—কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি। ১৯২৩ সালের ২৯ জানুআরি থেকে নতুন দলটির নাম সংক্ষিপ্ত হল—স্বরাজ্য পার্টি। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হবার পরে শরৎচন্দ্র স্বরাজ্য পার্টি এবং দেশবন্ধুর কাজে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এ সময়ে দেশবন্ধুর অজস্র বাঙলা বিবৃতি শরৎচন্দ্র রচনা করে দিয়েছেন। নানাভাবে তিনি স্বরাজ্য পার্টি ও দেশবন্ধুর কাজে সাহায্য করেছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে দরদের সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য কাজ করেছেন। কিন্তু নিজেকে তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না, নিজেকে প্রচার করতেন না।"

দেশবন্ধুর একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা অনেকে অপছন্দ করেছেন। অনেকেই তখন দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে। কিন্তু শরৎচন্দ্র পাশে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধুকে বললেন—কিছু ভাববেন না আপনি। এই তো আপনার পথ! যে সত্য আপনি একান্তমনে উপলব্ধি করেছেন, নিঃসঙ্কোচে তাকে প্রচার করুন।

দেশবন্ধু কৌতুক করে বললেন—সবাই যে বিপক্ষে, শরৎবাবু!

শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করে বললেন—হোক সবাই বিপক্ষ। সবাইকার মত আপনার জন্য নয়। আপনার মতই সবাইকার জন্য।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বলে উঠলেন—লোকে শুনছে না? শুনবেই না তো! লোকে তো কোনোদিনই সত্যের বাণী প্রথমে শোনে না। রাজা রামমোহন যখন সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, লোকে শুনেছিল? বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের বিধান লোকে শুনেছিল? নেপোলিয়ন যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, লোকে শুনেছিল? আপনার কথাও লোকে আজ শুনছে না—কিন্তু শুনবে। কাল শুনবে, পরশু শুনবে, নিশ্চয়ই শুনবে।

দেশবন্ধুর তখন দারুণ দুঃসময়। হাতে টাকা নেই, নিজের দলে অল্প কয়েকজন লোক। নিতান্ত নগণ্য লোকজন পর্যন্ত তখন দেশবন্ধুর নিন্দা করে।

১৯২৩ সালের মে মাসে বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। দেশবন্ধু বরিশাল পৌঁছেছেন ১৯২৩ সালের ১২ মে। সেদিনই সভা আরম্ভ হয়েছে। সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। আবার পরদিন সভা বসেছে। সভায় গোলমাল হয়েছে। 'আত্মশক্তি', ১৯২৩ সালের ২৩ মে, লিখেছে : "এই গোলমালের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায় সানুনয়ে সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এটা সভা হচ্ছে না তামাসা হচ্ছে।" শ্যামসুন্দর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং শরৎবাবুকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। অনেক সভ্য বললেন—শরৎবাবুকে এই কথা প্রত্যাহার করার কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু বের করে দেওয়া হতে পারে না। অগ্নিশর্ম্মা সভাপতি বললেন—I can't bear his sight—আমি তার মুখদর্শন করব না।...সকলের অনুরোধে শরৎবাবু তাঁর কথা প্রত্যাহার করলেন।" কথা প্রত্যাহার করেছেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্র মনে করেননি যে তিনি অন্যায় বলেছেন।

দারুণ অপমানিত বোধ করেছেন শরৎচন্দ্র। সভার পর তিনি রাগ করে বললেন—যে রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমন অপমানী হতে হয়, তাতে আর আমি নেই— I have had enough of it and I would have none of it any more.

দেশবন্ধু হাসলেন। শরৎচন্দ্রের একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন—তাই করুন, শরৎবাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ; আপনার অনুভূতি বড় ডেলিকেট। এত ব্যথা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না। এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে দিন।

শরৎচন্দ্র একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। গড়গড়ায় দু-একটা টান মেরে বললেন—কিন্তু কী করে ছাড়ি!!

মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধা-বিদ্রূপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কী করে? আমাদের ব্যথা তো নিতান্তই সামান্য, উপমা দিতে হলে হয়তো গোষ্পদই বলা চলে, কিন্তু আপনি যে দুঃখের মহার্ণব হয়ে রয়েছেন। নাঃ, আপনাকে ফেলে পালাতে পারব না।

শরৎচন্দ্র গড়গড়া টানতে লাগলেন।

বরিশাল থেকে দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরে এসেছেন ১৯২৩ সালের ১৭ মে।

হেমন্তকুমার সরকার লিখেছেন : "দেশবন্ধুর যখন চরম আর্থিক দুর্দ্দশা শরৎচন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "ত্যাগ এবং দুঃখবরণ ব্যতীত যখন স্বরাজ লাভ হবেই না, আর সবই যখন ত্যাগ করেছেন এবং দুঃখেরও চরম হয়েছে তখন

একখানা পা কেটে ফেলুন, তাতে আপনার যে ত্যাগ ও দুঃখ, তাতে স্বরাজ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে," এই বলে শরৎচন্দ্র মোটা টাকার একখানা চেক দেশবন্ধুর হাতে দিলেন।"

দেশবন্ধু একদিন বললেন—শরৎবাবু, আপনি হাওড়া থেকে দাঁড়ান।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—আপনি ক্ষেপেছেন? আমি দাঁড়াব কাউন্সিল ইলেকসনে?

দেশবন্ধু বললেন—কেন দাঁড়াবেন না?

শরৎচন্দ্র বললেন—না না, দূর দূর, সে কি হয়? আমি সামান্য গ্রন্থকার মানুষ, আমি কি কাউন্সিল ইলেকসনে দাঁড়াবার যোগ্য? লোকে বলবে কি?

দেশবন্ধু সবিস্ময়ে বললেন—আপনি কি বলছেন শরৎবাবু?

শরৎচন্দ্র স্মিতমুখে বললেন—ঠিক বলছি। দেশের জন্য আমি কি করেছি? আমি জেলে যাইনি, ওকালতী ব্যারিস্টারী ত্যাগ করিনি, দেশের জন্য আমি তো কোনও নির্যাতন-বরণ কোনও ত্যাগস্বীকারই করিনি। আপনি আমাকে ভালোবাসেন—সে আপনার আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আপনি নিজে কবি সাহিত্যিক, আমাকে সাহিত্যিক হিসাবে ভালোবাসেন। বন্ধুত্বের জন্য আমি আপনার প্রিয়জন হতে পারি কিন্তু দেশের লোক আমাকে প্রিয়জন মনে করবে কেন? তাছাড়া আমার নিজের সামান্য সাহিত্যসাধনাকে আমি রাজনীতির মূলধন করতে চাই না। বিশেষত কাউন্সিলের যা কাজ—ইংরেজী বক্তৃতা শোনা আর ইংরেজী বক্তৃতা দেওয়া, দুটোতেই আমার অত্যন্ত অরুচি। আপনি আমাকে রেহাই দিন। এমন কাউকে দাঁড় করান লোকে যাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করবে। আপনার এমনই বাধাবিপত্তি অসুবিধার অন্ত নেই, তার উপরে ভোটারদের উপরে আপনার নিজের লাইকিং চাপিয়ে দিয়ে বাধাবিপত্তি আর বাড়াবেন না।

কোনোদিনই ইলেকসনে দাঁড়াতে রাজী হননি শরৎচন্দ্র।

১৯২৪ সালের ২২ অগস্ট। জন্মাষ্টমী। শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর বাড়িতে এসেছেন। কথাবার্তায় রাত এগারোটা বেজে গেল।

টেলিফোনে খবর এল তারকেশ্বরে গুলি চলেছে। কিছুক্ষণ বাদে দুজন কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে লালমোহন ঘোষ এলেন, তিনিও ওই খবরই নিয়ে এসেছেন। খবর শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন দেশবন্ধু। বললেন—নিরীহ ছেলেরা গুলি খেল, ধর্মের স্থানে রক্তপাত হল, আর বাকি কি?

অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ চলল। কর্মীদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দেশবন্ধু বিদায় দিলেন। শরৎচন্দ্রও বিদায় নিয়ে উঠলেন।

তাঁকে বিদায় দিতে সিঁড়ি পর্যন্ত নামলেন দেশবন্ধু। সিঁড়ির পাশে চমৎকার মস্ত কালো পাথরের একটি কৃষ্ণমূর্তি। উড়িষ্যা থেকে মূর্তিটি আনা হয়েছে। দেশবন্ধু বললেন—মূর্তিটির বয়স পাঁচশ বছরের কম নয়। আরও

একজোড়া রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে, আপনাকে দিচ্ছি।

বলে আবার উপরে উঠে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে এলেন। শরৎচন্দ্রকে দিলেন। বললেন—আজ জন্মাষ্টমী, তাতে তারকেশ্বরে গুলি চলেছে, ঠাকুর স্বয়ং আজ আপনার ঘরে যাচ্ছেন। নন্দের বাড়ি ছেড়ে আজ গোকুলে যাচ্ছেন।

হেসে বললেন—তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

সেদিন গভীর রাত্রে বাহক হয়ে ওই মূর্তি ট্যাক্সি করে শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের বাড়িতে পেঁছে দিয়েছেন শৈলেশনাথ বিশী।

কিছুকাল পরের কথা। শৈলেশ একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন। শরৎচন্দ্র তখন উপরে আছেন। তাঁর চাকর ভোলা এসে শৈলেশকে বলল—আপনি বসুন, তিনি আসছেন।

খানিকক্ষণ বাদে ভোলা একখানা শ্বেতপাথরের রেকাব নিয়ে এল। রেকাবে ছানা, মাখন, মিছরি, ক্ষীর, সর আর নানারকম ফলের টুকরো।

শৈলেশ বললেন—এসব কী রে?

—প্রসাদ। আপনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

শৈলেশ বললেন—প্রসাদ কিসের?

ভোলা সংক্ষেপে বলল—পুজোর।

প্রসাদ খেতে আরম্ভ করলেন শৈলেশ। খাওয়া শেষ হয়েছে, চাও এসে গেল।

ভোলা বলল—চা খেয়ে ওপরে যাবেন। বাবু সেখানে যেতে বলেছেন।

উপরে গেলেন শৈলেশ। দেখলেন—একখানা ঘর ঠাকুরঘর হয়েছে, ধূপ-ধুনোর গন্ধ, চারদিকে ফুলের ছড়াছড়ি; শরৎচন্দ্রের পরনে গরদের ধুতি, কপালে চন্দনের ফোঁটা।

শৈলেশ অবাক হয়ে বললেন—এসব কী দাদা!

—দেখতেই তো পাচ্ছ, পুজো।

—তা দেখতে পাচ্ছি। এ সেই মূর্তি না যাকে আমি বয়ে নিয়ে এসেছিলাম?

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—সেই শ্রীমূর্তি!

শরৎচন্দ্র এই বিগ্রহের নিয়মিত পুজো করেছেন। ভক্ত শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আরেকটি বলবার মতো খবর আছে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হতে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে' ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি,—আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজির মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরি নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতিবড় নাস্তিকও যে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান!"

এখানে, মনে পড়ে যায়, শরৎচন্দ্র, ১৯১৪ সালের ৭ জানুআরি, লিখেছেন : "আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জল-

গ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্য্যন্ত খাই না।"

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন একদিন সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন। দুপুরে একসঙ্গে খেতে বসেছেন দুজনে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'খাও হে, প্রসাদ। বাড়ীতে নারায়ণ আছেন। নিজের হাতে সেবা করি, গিন্নী ভোগ রাঁধেন।' দেখিলাম সত্যই প্রসাদান্ন। মাথায় তুলসীপত্র।"

সামতাবেড়ে বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন নিজের চোখে শরৎচন্দ্রকে পুজো করতে দেখেছেন। বলাইচন্দ্র লিখেছেন : "একখানি ঘরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে শরৎচন্দ্রকে ধ্যানস্থ দেখিলাম। পূজার উপকরণ নাই, অর্থাৎ ফুল নাই, গঙ্গাজল নাই, কোশা-কুশী নাই—আছেন মাত্র পূজারী শরৎচন্দ্র ও তাঁহার দেবতা বিগ্রহের মুর্ত্তি ধরিয়া। পরে শুনিয়াছিলাম, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শরৎচন্দ্রের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের ধ্যানরত মুর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিয়াছিলাম, কি কঠোর তপস্যা, কি একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা। সেদিন বুঝিয়াছিলাম, শরৎচন্দ্র কত বড় আস্তিক; নাস্তিকতা তাঁহার স্বেচ্ছাবরণ, তাহার আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেন।"

পইতে নিয়েও একটি কাহিনী আছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পইতে না দেখে শরৎচন্দ্র একদিন খাপ্পা হয়ে বললেন—ও কি হে চারু, তোমার পইতে নেই!

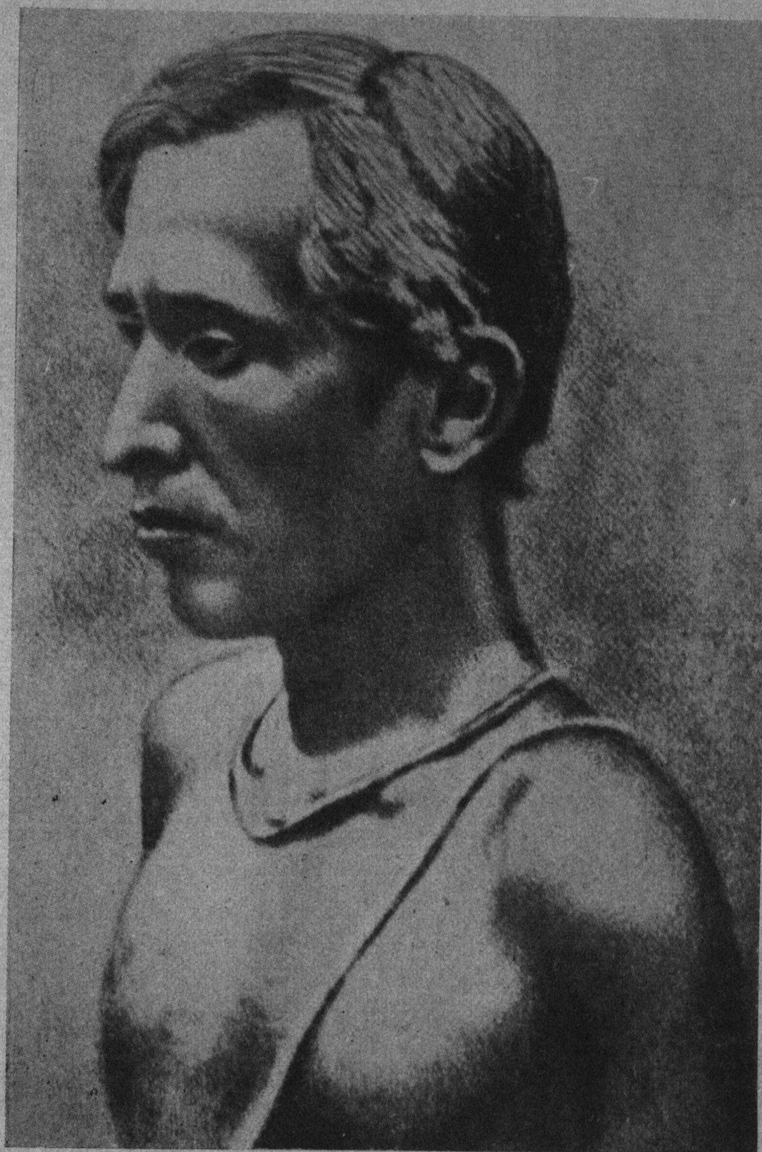
চারুচন্দ্র হেসে বললেন—শরৎ, পইতের ওপরে ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না।

শরৎচন্দ্র আহত কণ্ঠে বললেন—না, না, বামুন হয়ে পইতে ফেলা অন্যায়।

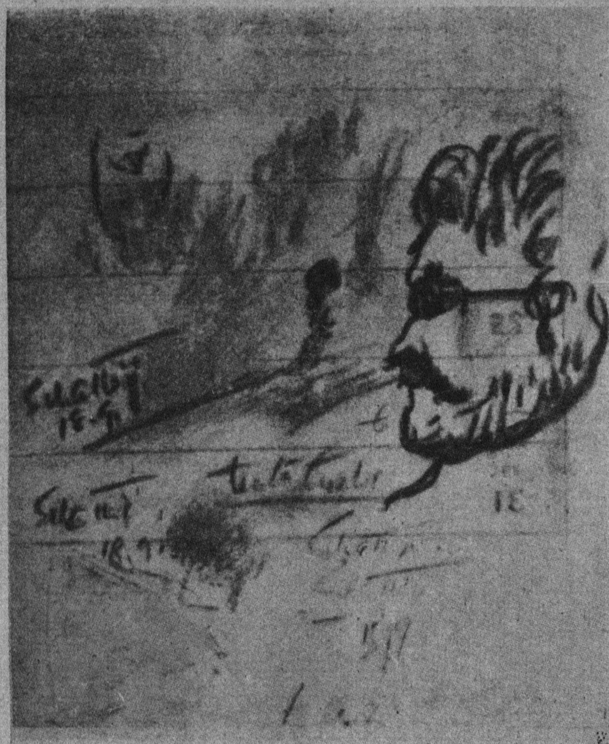
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে কেউ বলেন 'সি. আর.', কেউ বলেন 'দাশ সাহেব', কেউ বলেন 'কর্তা'। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মুখে 'দেশবন্ধু' ছাড়া অন্য কোনও উচ্চারণ নেই।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় একদিন ঠাট্টা করে বললেন—আপনার মুখে কি 'দেশবন্ধু' ভিন্ন তাঁর আর কোনও নাম আসেই না? কত লোকে 'কর্তা' বলে, 'সি. আর.' বলে, 'দাশ সাহেব' বলে?

শরৎচন্দ্র বললেন—ন্না, আমার মুখে তাঁর আর কোনও নামই আসে না। ওই তো ও'র সত্য পরিচয়। কে জানে কে সর্বপ্রথম ওই একটি নামের মধ্যেই ও'র ভেতর-বার যথার্থরূপে আমাদের চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। দেশবন্ধু সত্যই দেশবন্ধু। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, ভাল মন্দ নরনারী, পতিত তুচ্ছ ব্যথিত সকলের অকৃত্রিম বন্ধু তিনি। মানুষের এত বড় দরদী



শরৎচন্দ্র



শরৎচন্দ্র অঙ্কিত রেখাচিত্র

বন্ধু আমি কখনও কোথাও দেখিনি।

বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল, গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

১৯২৪ সালের অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হয়েছেন। ১৯২৭ সালের মে মাসে মুক্তি পেয়েছেন। কিছুকাল বাদে দেখা গেল—বাঙলায় কংগ্রেসের মধ্যে তখন দুটি দল—এক দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আরেক দলের নেতা সুভাষচন্দ্র। শরৎচন্দ্র রইলেন সুভাষচন্দ্রের দলে।

শরৎচন্দ্র সমস্ত হৃদয় দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ভালোবেসেছেন। বলতেন—সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে পারিনে।

হাওড়া জেলার কর্মীসম্মেলনে দলাদলির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে নেমন্তন্ন করা হল না। তাই নেমন্তন্ন পেয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—আমি যাব না।

প্রশ্ন হল—কেন যাবেন না? হাওড়া জেলার কর্মীসম্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারিনে।

শরৎচন্দ্র, ১৯২৮ সালের ২৯ এপ্রিল, হাওড়া টাউনহলে হাওড়া যুবক-সঙ্ঘের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছেন।

'ফরওয়ার্ড', ১৯২৮ সালের ১ মে (মঙ্গলবার), লিখেছে :

"Under the presidentship of Sj. Sarat Chatterji, there was a meeting of the youths of Howrah on Sunday evening at the local Town Hall to organise a movement of physical culture and social welfare work.

In his speech Sj. Chatterjee asked the youths of Howrah to devote their attention to meet the crying needs of the hour. He urged them to leave the bigger issues to bigger institutions and found one with a limited but well-defined scope to tackle the smaller but immediate issues—one of the most important of which was to increase physical strength and learn the arts of self-defence such as lathiplay. Disturbances were occuring every now and then and at any moment the youths of a locality might be called upon to defend their hearth and home and the honour of their ladies. They must keep prepared for this. This was to be the goal of the new youth organisation at Howrah.

Though the object at present would be limited yet as Sj. Chatterjee emphasised, it might become wider. There should be an age limit for the members. It should be under the control of young people only. Help from senior men might

be required in the beginning but after gaining sufficient experience, the youths should depend on themselves. Because these were the functions of the youths and must therefore be entrusted to them.

Through many of his books and writings Sj. Chatterji proceeded, he had tried to impress upon them the proper functions of the youths. He wanted their love and affection and called them to do real work. They should come to it with the mentality that a great taste was entrusted to them.

It was no good to engage oneself in too many works. Everyone could not be able to do all sorts of works. Concluding Sj. Chatterji emphasised that as the scope of the organisation was limited the progress of its work should be intense and vigorous in proportion."

অনেক রাজবন্দী মুক্তি পেয়েছেন। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "কারাপ্রাচীরের অবরোধ থেকে মুক্তিলাভ করলেন বটে কিন্তু মুক্তি এ'দের কোথায়? পরাধীন দেশে মুক্ত রাজবন্দীর স্থান কোথায়? ফুটপাতে আর গাছ-তলায়। যে অল্প কয়েকজনের নিজ গৃহ ছিল তাঁরা আপন গৃহে ঠাঁই পেলেন, যে কয়েকজনের পিতামাতা জীবিত ছিলেন তাঁরা পিতামাতার কোলে ঠাঁই পেলেন, কিন্তু বাকী অধিকাংশ? দেশের এবং সমাজের সকল দরজা তাঁদের জন্য বন্ধ। ভাই বোন আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞাতি স্বজন বন্ধু বান্ধব, মেস বোর্ডিং হোটেল সকলের দরজা এ'দের কাছে বন্ধ। এ'দের বাড়ীতে আশ্রয় দিলে সে বাড়ীতে দিবারাত্রি সি. আই. ডি. পাহারা বসে, রাস্তায় এ'দের সঙ্গে আলাপ করলে সি. আই. ডি.তে নাম টুকে নেয়। এ'দের ছায়া পর্যন্ত বিপজ্জনক। কোন আপিসে দোকানে কারখানায় এ'রা চাকরি পান না। কোন স্থানে এ'দের কেহ চাকরি পেলে সেখানে টিকটিকি পুলিসের আনাগোনা আরম্ভ হয়ে যায়। কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। মুক্ত রাজবন্দীদের অবস্থা হল তেমনি। গভর্নমেণ্ট এ'দের রাজবন্দী করে কয়েক বৎসর জেলখানাতে বিনা বিচারে আটক রেখে পরিশেষে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ছেড়ে দিয়েও এ'দের জীবন দুর্বিষহ করে দিলেন। এ'দের নামের উপরে বিপ্লবী ছাপ মেরে দিলেন, দিবারাত্র অহরহ গতিবিধি গোপনে তদারক করবার জন্য পালে পালে টিকটিকি পুলিস লেলিয়ে দিলেন। ফলে এ'দের জীবন একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠল। কেহ এ'দের সঙ্গে মেলামেশা করতে, আশ্রয় দিতে সাহস করে না, লোকে কথা বলতে পর্যন্ত ভয় পায়। এ'দের সকলেই প্রায় কংগ্রেসের কাজ করতে করতেই গ্রেপ্তার হয়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন, এখন সেই কংগ্রেসেও এ'দের অবস্থা খুব ভাল নয়। কংগ্রেসের অনেক লোকই এ'দের এড়িয়ে চলতে লাগল।

নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীরা এ'দের সুনজরে দেখতেন না, স্বরাজীরাও আমল দিতে চান না। দেশের লোকে ভয় পায়, টিকটিকি পুলিস অহরহ প্রেতের মত অনুসরণ করে বেড়ায়। জীবন এ'দের দুর্বিষহ হয়ে উঠল।"

শরৎচন্দ্র উদাসীন থাকতে পারলেন না। তিনি কয়েকজন কর্মীকে ডাকলেন। বললেন—ওহে, হাওড়াতে সমস্ত মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরিক সংবর্ধনা দেব। জাঁকালো সভা করতে হবে। এমন জমকালো করে এদের অভ্যর্থনা করতে হবে যাতে দেশের মধ্যে একটা মর‍্যাল ইমপ্রেশন হয়। হাওড়ার সমস্ত তরুণ যাতে এই সভাতে এসে যোগদান করে তার বন্দোবস্ত করো।

শরৎচন্দ্র বলে চললেন—দেশের জন্যে যারা নিজেদের রিক্ত করেছে, নিঃস্ব করেছে আজকে তারাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া যাদের আর কিছু নেই দেশ হবে তাদের প্রতি বিমুখ? কেন? টিকটিকির ভয়ে? আই. বি. আর স্পেশাল ব্রাঞ্চ এখনও দেশের লোকের মনকে শাসন করবে? কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়ল, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন? সংবর্ধনা জানাবে না কেন? গভর্নমেণ্ট তাদের রেভলিউশনারী বলেছে বলে? তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে এই কথা গভর্নমেণ্ট রটিয়েছে বলে? গভর্নমেণ্ট কি হবে আজ আমাদের কনশেন্স-কীপার? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা আইডেণ্টিফাই করব গভর্নমেণ্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means. We must receive them and congratulate them openly and wholeheartedly. কলকাতাতেই এটা প্রথমে হওয়া উচিত ছিল; বি.পি.সি.সি.-রই এটা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন হল না, তখন আমরাই প্রথমে করব। তোমরা এর ব্যবস্থা করো।

হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শরৎচন্দ্র, ১৯২৮ সালের ২৩ জুলাইয়ের 'বাঙ্গলার কথা'য়, বিজ্ঞাপিত করেছেন :

"মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীগণকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আগামী, ২৫শে জুলাই, বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় হাওড়া টাউনহলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।"

'ফরওয়ার্ড', ১৯২৮ সালের ২৬ জুলাই, লিখেছে :

"To Howrah belongs the honour of giving the first public reception to the released detenus. Sj. Sarat Ch. Chatterjee, President, and the members of the Howrah District Congress Committee gave an At Home on Wednesday evening in the

Town Hall to meet the detenus who have now been restored to liberty after years of detention. The Town Hall was tastefully decorated, and Swaraj tricolour was abundantly displayed. Most of the prominent detenus whose names are household words in Bengal were present.

The meeting opened with the "Bande Mataram" song sung by Sj. Harendra Ghosh, the entire audience listened standing.

After the songs and speeches were over, the meeting terminated. The detenus who were the chief guests of the evening and friends were treated to a sumptuous dinner.

It was from beginning to end a meeting of friends who all felt quite 'at home'. There was very little of the formal about the meeting and the atmosphere in which it was held. The warm heart and the human understanding of Sj. Sarat Chandra Chatterji made the whole thing really enjoyable. The Secretary of the Howrah District Congress Committee and other leaders, Sj. Baroda Prasanna Pain, Sj. Khagendra Nath Ganguly, Sj. Probodh Ch. Bose, Sj. Gour Mohan Roy, Sj. Bhola Nath Roy were very active and enthusiastic. They were here, there and everywhere, greeting the detenus and friends.

Special mention must be made of an incident that almost threatened in the beginning to mar the hole affair. Most of the detenus objected to the presence in the meeting of a few ex-detenus who they say are undesirable persons. After a good deal of discussion outside the hall, a solution was arrived at, and the detenus were persuaded to attend the meeting. Sj. Sarat Chandra Chatterji made a statement in the meeting, explaining why most of the detenus refused to attend the meeting. It is unfortunate, he said, that among those who have suffered and sacrificed there should be a few who had fallen from their ideal and disgraced themselves. These few who know they have disgraced themselves should not have come to share in the honour that is being shown and that is most certainly due to those sons of Bengal who have been brave in suffering, brave in sacrifice, brave in action, and have been victims of bureaucratic wrath...."

'বাঙগলার কথা', ১৯২৮ সালের ২৬ জ্বলাই, লিখেছে :

"গতকল্য ব্ধবার সন্ধ্যা সাতটার সময় হাওড়া টাউন হলে কারামুক্ত রাজবন্দীদের সম্বর্ধনার জন্য একটী জনসভা হইয়া গিয়াছে। হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভা আহ্বান

করেন। সভার নির্দ্ধারিত কালের বহু পূর্বে হলগৃহ দর্শক ও অভ্যাগতবৃন্দে ভরিয়া গিয়াছিল; কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ হলগৃহ ও তোরণদ্বার বিবিধপ্রকার লতাপাতা ও স্বরাজ্যপতাকায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন—হলের মধ্যে সভামঞ্চের ঊর্দ্ধে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর একখানা বিরাট তৈলচিত্র পত্রপুষ্প ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল—ইহাতে গৃহের শোভা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মঞ্চোপরি বহু কারামুক্ত স্বদেশসেবক আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত হাওড়া জেলার পক্ষ হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বসু, বরদাপ্রসন্ন পাইন, কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র দাস, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হাওড়ার নির্য্যাতিত কর্মী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয়কে সভাপতি পদে বৃত করিলে শ্রীযুক্ত শরৎবাবু বাঙ্গলার শত শত নির্য্যাতিত সেশ-সেবককে সাদরে আহ্বান করেন। তিনি বলেন, এই যুবকগণই আজ জাতির অন্ধকার মন্দিরে একমাত্র আলোকশিখা। এই তরুণগণের নূতন প্রাণের প্রদীপ-শিখায় দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মনো-মন্দির আলোকিত হইয়া উঠুক, বাঙ্গলার কোটী কোটী যুবক ইহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশসেবায় ব্রতী হউক—এই আশা করিয়া তিনি দেশসেবকদের নির্য্যাতনকে অভিনন্দিত করেন।...”

কয়েকজন বিপ্লবী তরুণের উদ্যোগে ‘বেণু’ নামে একখানা মাসিকপত্র চলে। শরৎচন্দ্রের ‘বিপ্রদাস’ দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হল ‘বেণু’তে—১৩৩৬-৩৮ বঙ্গাব্দে।

শরৎচন্দ্রকে একদিন প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, কত টাকা নিয়ে তিনি ‘বেণু’র ছোকরাদের লেখা দিচ্ছেন।

শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর দিয়েছেন—ওরা দেবে টাকা? কোথায় পাবে? ওদেরকেই আমার সাহায্য করা উচিত—কিন্তু তা পারি কই?

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছেন—ওদের সঙ্গে যে আমার রক্তের পরিচয়, জন্মান্তরের আত্মীয়তা—ওদের কাছ থেকে নেব টাকা? বলো কি তোমরা!

বহুদিন শরৎচন্দ্র ‘বেণু’র কর্মীদের বলেছেন—দ্যাখো, তোমরা বড় দেখে

একটা বাড়ি নিয়ে 'বেণু'র আপিস করো, আমি প্রায়ই যাব, কলকাতা গিয়ে ওখানেই উঠব—দেখবে, বাঙলার সাহিত্যিকগোষ্ঠী তোমাদের সঙ্গে কেমন আত্মীয়তা করেন।

কিন্তু 'বেণু'র নিঃসম্বল কর্মীরা বড় বাড়ি ভাড়া করে আপিস খুলতে পারেনি।

হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শরৎচন্দ্র, ১৯২৮ সালের ২১ অগস্ট, 'বাঙ্গলার কথা'য় বিজ্ঞাপিত করেছেন: "হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দল হইতে উক্ত দুই পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল দল হইতে চেয়ারম্যানের জন্য শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইনকে এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য শ্রীযুত বিজয়-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে মনোনীত করিলাম। অদ্য মঙ্গলবার ১০টার সময় নির্ব্বাচন পর্ব্ব আরম্ভ হইবে। আমি আশা করি, সমস্ত কংগ্রেস নির্ব্বাচিত কমিশনার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে ভোট দান করতঃ নির্ব্বাচিত করিবেন।"

বিরুদ্ধবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বরদাপ্রসন্ন পাইন ও বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

হাওড়ার গার্ডেনরীচের একটি বিলাতী কারখানার বাঙালী শ্রমিকেরা হঠাৎ একদিন ধর্মঘট আরম্ভ করে দিয়েছে। শরৎচন্দ্র খবর শুনে অগম দত্ত, জীবন মাইতি ও শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়কে ওই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করতে নির্দেশ দিলেন। অনেকদিন ধর্মঘট চলেছে, শেষপর্যন্ত শ্রমিকেরা জয়ী হয়েছে। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "এই ধর্মঘট পরিচালনায় আমাদের শরৎ-চন্দ্রের কোন প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু ধর্মঘটীদের সাহায্য করবার ও ধর্মঘট পরিচালনার প্রাথমিক প্রেরণা তিনিই দিয়েছিলেন।"

এই ধর্মঘট সফল হওয়ার পর অগম দত্ত, জীবন মাইতি ও শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় হাওড়া মেথর ও ঝাড়ুদার ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন। শচীনন্দন এই ইউনিয়নের সেক্রেটারি। কয়েকমাসের মধ্যেই এই ইউনিয়ন মেথরদের ধর্মঘট আরম্ভ করে দিল।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি তখন কংগ্রেসের দখলে। এবং শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।

ধর্মঘট ঘোষণার আগে শচীনন্দন সবকথা শরৎচন্দ্রকে বলেছেন। প্রণাম করে

তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছেন।

শরৎচন্দ্র আশীর্বাদ করলেন। হেসে বললেন—এবার কি গুরুমারা বিদ্যে আরম্ভ করলে?

শচীনন্দন বললেন—কী করব বলুন, ইউনিয়ন গড়ে তুলে এখন তো আর পেছিয়ে আসা যায় না।

শরৎচন্দ্র শান্ত গলায় বললেন—না, পেছিয়ে আসা চলবে না, কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। সংঘর্ষটা কী জন্যে হচ্ছে সেইটেই বড় কথা, কার সঙ্গে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়।...দ্বিধা-সঙ্কোচের কিছু নেই, এগিয়ে যাও।

ধর্মঘট চলতে লাগল। মিউনিসিপ্যালিটি ধর্মঘট ভাঙবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছে কিন্তু ধর্মঘট ভাঙেনি।

কোনও কোনও কমিশনার শরৎচন্দ্রকে বললেন—এই ছোকরাগুলো তো আপনারই শিষ্য, আপনি এদের ডেকে ধমকে দিয়ে ধর্মঘট উইথড্র করতে বলে দিন।

শরৎচন্দ্র তাঁদেরই ধমক দিয়ে বললেন—নো, বাই নো মীনস। ধর্মঘট যারা করেছে তাদের গ্রীভ্যান্স যদি সত্য হয় তাহলে সে সম্বন্ধে সঙ্গত ব্যবস্থা করো।

ধর্মঘট ষোলোআনা চলতে লাগল। রাস্তায় একদিন মিউনিসিপ্যালিটির পনের-কুড়িজন জমাদার হঠাৎ শচীনন্দনকে মারধর করল। মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেলেন শচীনন্দন।

এই মারধরের খবর শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র। ইজি-চেয়ারের হাতল চাপড়ে বলে উঠলেন—দিস ইজ শীয়ার কাওয়ার্ডিস। একটা ছোট ছেলেকে এমনি বর্বরের মতো ঠেঙিয়ে এরা ধর্মঘট ভাঙতে চায়?

প্রবোধ বসু তখন হাওড়া কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা, মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার। তাঁকে ডেকে শরৎচন্দ্র বলেছেন—I can see the unseen hand in this game. Tell everybody that I want immediate settlement of the strike, otherwise I will issue a statement and taboo the municipality.

সেদিনই কমিশনারদের মধ্যে জরুরী পরামর্শ হল। তাঁরা ইউনিয়নের সঙ্গে মীমাংসার প্রস্তাব করলেন।

পরদিন মীমাংসা হয়ে গেল। ইউনিয়নের প্রায় সব দাবিই পূর্ণ হল।

পরদিন শচীনন্দন গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। প্রণাম করে বললেন—আপনার জন্যেই জিত হল।

শরৎচন্দ্র আদর করে শচীনন্দনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—উঁহু, জিতেছ নিজেরই জোরে। সত্যিকার দাম দিয়েছ তাই সিদ্ধিলাভ করেছ।

দাম যদি না দিতে তাহলে আমি চেষ্টা করেও জেতাতে পারতুম না।

শচীনন্দন বললেন—কিন্তু আপনি যদি ওইরকম রুদ্রমূর্তি ধারণ না করতেন তাহলে এটা হত না।

শরৎচন্দ্র হাসলেন। বললেন—তা নয়। ধর্ম এবং ন্যায় যেখানেই পীড়িত হয়, প্রতিকার সেখানে আপনিই নেমে আসে। এই হচ্ছে নিয়ম, চিরকাল সব জায়গায় এইই হয়ে আসছে।

মুক্ত রাজবন্দী আশুতোষ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে, ১৯২৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে, হাওড়া জেলা যুবসঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছে। এই অধিবেশনে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা যুবসঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই সঙ্ঘের কর্মপদ্ধতি : "(ক) জেলার যে কোন জনহিতকর কার্য্যের সাহায্যার্থ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা। (খ) আলোচনা বিভাগ। (গ) মফঃস্বলে প্রচার কার্য্যের জন্য একটী বোর্ড গঠন।" ('বাঙ্গলার কথা', ২০ ফেব্রুআরি ১৯২৯, পৃ. ২)

শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে, ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ (শুক্রবার), রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুবসম্মিলনের অধিবেশন হয়েছে। 'বাঙ্গলার কথা', ১৯২৯ সালের ৩১ মার্চ, লিখেছে : "সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অসহযোগ আন্দোলন, চরকা ও খদ্দর গ্রহণ একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। চৌরিচরার দুর্ঘটনার পর মহাত্মার সিদ্ধান্তই জাতির জাগ্রত আশাকে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে. তিনি বলিয়াছেন যে বাঙ্গলাকে তাহার স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া চলিতে হইবে এবং বিদেশী বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে হইবে। সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্রোহই এখন একমাত্র প্রয়োজন—এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার নির্ভীক ও মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণ শেষ করিয়াছেন।"

'বাঙ্গলার কথা'র নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯২৯ সালের ৩০ মার্চ, লিখেছেন : "গতকল্য (শুক্রবার) শরৎবাবু যুব সম্মেলনে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন ডাকবিভাগ তাহা আটক রাখিয়াছেন। কি কারণে তাঁহারা এরূপ করিলেন তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া জানান নাই তবে বুঝা যাইতেছে বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটী স্পষ্ট কথা বলাতেই নাকি কর্ত্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। শরৎবাবুর বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বক্তৃতাই যে কর্ত্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়াছেন তাহা নয় 'এসোসিয়েটেড প্রেস' এ বক্তৃতার যে চুম্বক পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বন্ধ রাখা হইয়াছে।"

'বাঙ্গলার কথা'র নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি, ১৯২৯ সালের ১ এপ্রিল,

লিখেছেন : "যুব সম্মেলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত শরৎবাবু যে বক্তৃতা প্রদান করেন, টেলিগ্রাফ আফিসে তাহা আটকানো হয়—কর্ত্তৃপক্ষের এ আচরণের কারণ নির্দ্দেশ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ইহাতে উল্টা ফল ফলিয়াছে—বক্তৃতার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে এবং কলিকাতার প্রতি সংবাদপত্রে তাহা বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।..."

হাওড়ার যুব-সমিতির সভাপতি শরৎচন্দ্র, ১৯২৯ সালের ২০ জুলাই, সর্বসাধারণের কাছে আবেদনপত্র লিখেছেন :

"ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি-আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসই ছিল এতাবৎ একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহার শক্তি ছিল ক্ষুদ্র, উদ্যম ছিল অকিঞ্চিৎকর, পরিসর ছিল সঙ্কীর্ণ, এবং জীবন ছিল নৈরাশ্যপীড়িত, দেশের যৌবনশক্তি না যতদিন ইহাতে যোগ দিয়াছিল। ইহা যে অত্যুক্তি নয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা দেখা যাইবে।

কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছে দেশের যৌবন, তথাপি সেই কংগ্রেসের কাটা-ছাঁটা, ধরা-বাঁধা মুষ্টিভিক্ষায় যৌবনের ক্ষুধা মিটিল না; তাই যুব-সমিতির সৃষ্টি। এই তো সেদিনের কথা,—জন্মের তারিখ গণনায় ইহার হিসাব মিলিবে না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়াছে তাহার বাধা নাই, বিনাশ নাই, সে অপরাজেয় এবং তাহার পরেই এ দুর্ভাগা দেশের সব চেয়ে বড় দাবী, সেই দিন হইতেই এই সমিতির বিস্তৃতির আর বিরাম নাই। সঙ্ঘ-শক্তির অপরিমেয় বিকাশে আজ এই প্রতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান যে কোথায় এ কথা নিজে বাঙ্গালী হইয়া উচ্চারণ করিলে আমার অবিনয়ের অপরাধ স্পর্শিবে। কিন্তু এই বঙ্গ-দেশের মাঝখানে হাওড়া জেলার নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে আর কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার বিগত ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারাই এ কথার সত্যতা বুঝিবেন।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় হাওড়ার যুব-সমিতির সম্মিলনও আসন্নপ্রায়। ইহার অনেক কাজ রহিয়াছে। তাই সর্ব্বসাধারণের কাছে, বিশেষ করিয়া দেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের কাছে আমার একান্ত নিবেদন, তাঁহারা যেন একযোগে এই সম্মিলনীকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে অবহেলা না করেন। আপনাদের পক্ষ হইতে আমি বঙ্গদেশের সকল জেলার সকল কর্ম্মীকেই আমন্ত্রণ করিব এবং নিঃসন্দেহে জানি আমার আহ্বান তাঁহারা কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

যৌবনে নিজের আর আমার দাবী দাওয়া নাই, সামর্থ্যও নিঃশেষিতপ্রায়,

তথাপি ইহার উদ্বোধনের ভার যুবকেরা স্নেহবশতঃ আমার হস্তেই ন্যস্ত করিয়াছেন। যথাশক্তি কর্ত্তব্য সমাপন করিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি।

এখানে এই ব্যাপারে আর একটা কথা সকলকে জানানোর প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। যুব-সমিতির সম্মিলনের আয়োজনের প্রারম্ভেই জনকয়েক বিশিষ্ট কর্ম্মীযুবক ব্যক্তিগত মতবিরোধের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। প্রথমে, উভয় পক্ষই আমাকে মীমাংসা করিয়া দিতে আহবান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক পক্ষের আহবানে বোধ করি আন্তরিকতা ছিল না। আমার প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ আমার নির্দ্ধারণ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না, "কর্ম্মী-সম্মিলনী" নাম দিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র আয়োজনে ব্যাপৃত।

এইভাবে যুব-শক্তি খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হওয়া যত বড় বেদনার বস্তুই হোক, যাহা হইল না তাহা লইয়া ক্ষোভ করা নিষ্ফল। বোধ করি, ইহাই এ দেশের সনাতন-রীতি। যাই হোক, তাঁহাদের অধিকাংশই আমার সুপরিচিত, কর্ম্ম-নৈপুণ্যে, নিষ্ঠায়, দেশের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগে তাঁহারা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। সেও দেশেরই কাজ, দেশের মুক্তি তাঁহাদেরও সাধনার সামগ্রী। প্রার্থনা করি, সে অনুষ্ঠানও যেন জয়যুক্ত হয়, ইতি—৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩৬।" ('বঙ্গবাণী', ২৪ জুলাই ১৯২৯, পৃ. ৬)

কংগ্রেস, ১৯৩০ সালের ২৬ জানুআরি, পূর্ণ স্বরাজের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে। সেদিন শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে হাওড়া টাউনহলে জনসভা হয়েছে। 'বঙ্গবাণী', ১৯৩০ সালের ২৭ জানুআরি, লিখেছে : "হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে সন্ধ্যায় এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুত শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধন সময়ে সভাপতি মহাশয় বলেন, "ওয়ার্কিং কমিটী যে প্রস্তাবের খসড়া করিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিবার জন্যই অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি এবং এখনই পাঠ করা হইবে।" অতঃপর বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি পাঠ করা হয়। শ্রীযুত বিপিনবিহারী বসু একটী জাতীয় সঙ্গীত গান করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।"

সুভাষচন্দ্র বসু সমেত শতাধিক রাজনৈতিক বন্দী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অনশন করেছেন।

'বঙ্গবাণী', ১৯৩০ সালের ২৮ জুলাই (সোমবার), লিখেছে :

"কলিকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে এবং বাঙ্গলার আরও কয়েকটী জেলে বহু বিশিষ্ট দেশসেবক আজ অনশনে। যাঁহারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে সুকঠোর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন,—শ্রান্তি মানেন নাই, গৃহের আরাম

চাহেন নাই, আপনাদের সর্ব্ববিধ সুখের আশা যাঁহারা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহারা আজ অনশনে। অপরাধ তাঁহাদের যত গুরুই হোক, এ সংবাদে আজ বাঙলার চিত্ত-সমুদ্রে ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র স্বয়ং আলিপুর জেলে গিয়া ইঁহাদের প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম দিন তিনি নাকি জেলে প্রায়োপবেশনকারী নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পান নাই। পরে গত শনিবার সে অনুমতি দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক। তিনি মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার স্বপ্নে বিভোর। তিনি স্রষ্টা, তিনি রূপধ্যেয়ানী। কিন্তু এ দুঃসংবাদে তাঁরও ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে। নিভৃত পল্লী-নিবাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেও কলিকাতায় ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কুসুমগুলি আজ বিপন্ন, তাঁহাদের বাঁচাইতে হইবে। শরৎচন্দ্রের জেলে ছুটিয়া যাওয়ায় সেই আকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

গত ১৯২১ সালে যখন এ দেশে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। সমগ্র দেশ সেদিন আশা করিয়াছিল, সেদিনের আকাশে যে সুরটি ধ্বনিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের বীণায় তাহা অপরূপ ঝংকারে বাজিয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু নবযৌবনমত্ত মানুষের গান তাঁহার বীণায় বাজিল না। বলাকার কবি তখন ভারতকে ছাপাইয়া সমগ্র বিশ্বে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিবেন, —সব ঝুটা, সব ঝুটা।

রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল না, কিন্তু সেই সময়েই আশাহত দেশ শরৎ-চন্দ্রকে পাইয়া বাঁচিয়া গেল। রণকুয়াসাচ্ছন্ন ভারতের নব জাগ্রত যৌবনকে স্মরণ করিয়া তিনি শোনাইলেন পথের দাবীর কথা। এতদিন আপনার খেয়ালে পথের দু-পাশের যে ফুল তুলিয়া তিনি সাজি ভরিয়াছিলেন, বাণীর দেউলে তা চিরদিন অম্লান থাকিবে। তাতে আছে স্নিগ্ধতা, আছে যাদু, আছে ব্যথিত মানুষের গোপন হিয়ার অতি সুনিবিড় মায়া। তাতে আছে, যে-যৌবন সৃষ্টি করে, যে আপনার আনন্দে মধুচক্র রচনা করে তারই সুগোপন ব্যথা। কিন্তু যৌবন তো শুধু সৃষ্টি করে না;—যৌবন ভাঙেগও, অত্যন্ত নির্ম্মম হইয়া ভাঙে। পরবর্ত্তী উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিল সেই ভাঙার গান।

শরৎচন্দ্র দরদী শিল্পী। মাতৃভূমির সমস্ত ব্যথা ও দৈন্য তাঁহার লেখনীতে তাই অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠে। জাতির জীবনে যত কিছু দৈন্য, যাহা কিছু লজ্জাকর তাহা তাঁহার মনকে স্পর্শ করিয়াছে; তাঁহার লেখায় তাঁহার সেই কোমল মনের পরিচয় পাই। নিজের জীবনে একদিন তিনি বহুরূপে

বহু দুঃখই পাইয়াছেন। নিজের দুঃখের ভিতর দিয়া চিরজীবন তিনি মানবতার দুঃখের সন্ধান করিয়াছেন। তাই মানবতার দুঃখ তিনি এমন আপন করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। যে দরদ তাঁহার লেখায় ফোটে, অনশনক্লিষ্ট বন্দীদের দেখিতে যাওয়াতে সেই দরদেরই পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।”

১৯৩১ সালের ৪ ফেব্রুআরির 'বঙ্গবাণী'তে হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শরৎচন্দ্র নিবেদন করেছেন :

“হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া গতবার আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কমিশনারগণ একবাক্যে তাহাতে সম্মত হওয়ায় আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আগামী মার্চ্চ মাসে আবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। হাওড়ার কংগ্রেসকর্ম্মীরা আমার উপর প্রার্থী নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়াছেন। নির্ব্বাচন লইয়া অন্য সকল স্থানে যে দলাদলি ও বিবাদ হয় তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের সদিচ্ছা থাকাতেই হাওড়াবাসিগণ এই কার্য্য করিয়াছেন—সেজন্য আমি তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। হাওড়ার লোক যে সাধারণ বিবাদ চাহেন না, তাহা জানিয়াই আমি ওই দায়িত্বপূর্ণ ভার লইতে সম্মত হইয়াছি। তবে মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটী যাহাতে আরও একবার কার্য্য করিবার সুযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিবে না। শুধু ৭নং ওয়ার্ডে আমাকে সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে —সেখানে একজন কমিশনার কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে আমি হাওড়া করদাতাদিগকে এক আবেদন জানাইতেছি— যাঁহারা কংগ্রেসের লোক নহেন, তাঁহারা যেন সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন। আমাদের সম্মুখে যে সংগ্রাম পড়িয়া আছে, তাহা সম্পাদন করিতে হইলে অন্য কোন দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া চলিবে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করা কাহারও পক্ষেই শোভন নহে। আশা করি আমার নিবেদন ব্যর্থ হইবে না এবং হাওড়ার অধিবাসীরা আমার এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।...”

সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩১ সালের ১৩ মার্চ, লিখেছেন : “হাওড়ায় মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন আসন্ন। ১৯২৮-এর ন্যায় এবারও হাওড়া কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রত্যেক ওয়ার্ডে দাঁড় করান হইয়াছে। গতবার নির্ব্বাচনে

কংগ্রেসের জয়লাভ হওয়াতে গত তিন বৎসর হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ খুব ভাল ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। এবারও যদি কংগ্রেসের জয়লাভ হয়, তাহা হইলে আগামী তিন বৎসর যে হাওড়া-অধিবাসীবৃন্দের বিশেষ সুবিধা ও উপকার হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব হাওড়ার জনসাধারণের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ যে তাঁহারা যেন কংগ্রেসের মনোনীত পদ-প্রার্থীদের ভোট দিয়া জয়যুক্ত করেন। কংগ্রেসের জয়—মানে সর্ব্বসাধারণের জয়।" ('বঙ্গবাণী', ১৮ মার্চ ১৯৩১, পৃ. ৫)

হাওড়ায় মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন হয়েছে ১৯৩১ সালের ২০ মার্চ ও ২১ মার্চ। বরদাপ্রসন্ন পাইন ও বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচায, ১৯৩১ সালের ২১ মার্চ একখানা চিঠি লিখেছেন 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদককে। চিঠিখানা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩১ সালের ২২ মার্চ। চিঠিখানা থেকে একটিমাত্র বাক্য উদ্ধার করি: "হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত একমাস কাল সর্ব্বপ্রকারে এই নির্ব্বাচন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণই আজ সাফল্য লাভ করিয়াছেন কাজেই যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলিতেন, তাঁহারা আজ তাঁহাদের ভুল বুঝিতেছেন।"

কুমিল্লা জেলা ছাত্রছাত্রী সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ৬ মে, চট্টগ্রাম মেলে কুমিল্লা রওনা হয়েছেন। শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ১৩ মে, লিখেছেন: "দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বল-পূর্বক কুমিল্লায় চালান ক'রে দিয়েছিল। পথে এক দল শেম্ শেম্ বল্‌লে, গাড়ীর জানলার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে, আবার এক দল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা ক'রে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক রূপনারাণের তীরে আবার ফিরে এসেছি।...জয় হোক্ কয়লার গুঁড়োর! জয় হোক্ বারো ঘোড়ার গাড়ীর!"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ২৪ মে, লিখেছে: "শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জেলা রিটার্ণিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। নমিনেশন কাগজ ৪নং তেলকল ঘাট রোড জেলা কংগ্রেস অফিস হইতে প্রাতে ৮টা হইতে ১১টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। যাহারা বি, পি, সি, সি, নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে চান তাঁহারা রিটার্ণিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র ২৭শে মের পূর্ব্বে পাঠাইবেন।"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ২৫ মে, বিজ্ঞাপিত করেছে:

"যে সকল কংগ্রেস বি, পি, সি, সির নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে আগামী ২৭শে মের পূর্ব্বে নির্ব্বাচন পত্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের নিকট ৪নং তেলকল ঘাট রোডে পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্ব্বাচন পত্র পরীক্ষার পূর্ব্বে নির্ব্বাচন প্রার্থীকে ২৲ টাকা রিটার্ণিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হইবে।

রিটার্ণিং অফিসারের আফিস ৪নং তেলকল ঘাট রোডে স্থাপিত হইয়াছে। অফিস প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। হাওড়া জেলা কংগ্রেস অফিসে নির্ব্বাচন পত্র পাওয়া যাইবে। ২৮শে মে নির্ব্বাচন পত্র পরীক্ষা হইবে। স্থান ও সময় পরে জানান হইবে। শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রিটার্ণিং অফিসার।"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ২৭ মে, বিজ্ঞাপিত করেছে: "হাওড়া জেলার রিটার্ণিং অফিসারের অফিস হাওড়া জেলা কংগ্রেস অফিসে স্থাপিত হইয়াছে। অফিস প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। অফিসের সময় মনোনয়ন পত্র সকল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। আগামী ২৭ মের মধ্যে মনোনয়ন পত্র গৃহীত হইবে। প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পূর্ব্বে ২৲ টাকা জমা দিবেন। ২৮শে মে তারিখে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় মনোনয়ন পত্র সকল কংগ্রেস অফিসে পরীক্ষিত হইবে। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রিটার্ণিং অফিসার হাওড়া।"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ৪ জুন, বিজ্ঞাপিত করেছে: "হাওড়া জিলার বি, পি, সি, সি নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত সেণ্টার নির্ব্বাচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পোলিং স্থানে ৫ই জুন প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে। বাইনান, দফরপুর, ডোমজুর, গড়ভবানীপুর, ঝিকিড়া, জুয়ার গৌরী, জুজুরমা, কল্যাণচক, কল্যাণপুর, খালনা, খাসমোরা, মুগ কল্যাণ, মুন্সীরহাট, নারিট, পাতিহাল, পুলগুবয়া, রামনগর, সামন্তি, সাঁকরাইল, দক্ষিণ মংটী, ফলিয়া। ৭ই জুন প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানে ভোটের কেন্দ্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আন্দুল, বালি ও বেলুড়, বসন্তপুর, জগাছা, ঝোড়হাট, জয়পুর, লিলুয়া, মাকড়দা, ম্যাল্লোক, সালখিয়া,—সালখিয়া অন্যস্থানে, পাত্রাগাছা, শিবপুর, রামকৃষ্ণপুর, বড়ামাট, খুরোট রোড, পঞ্চাননতলা রোড, বাঁটারা। উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে ৭ই জুন সন্ধ্যা ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ও আমতায় ৫ই জুন মধ্যাহ্ন ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রিটার্ণিং অফিসার।"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ৬ জুন, বিজ্ঞাপিত করেছে:

"হাওড়ায় বি, পি, সি, সি, নির্ব্বাচনে ভোটারগণের সুবিধার জন্য মিউ-

নিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড বিভাগ অনুসারে ৫টী কেন্দ্র স্থাপিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের পোলিং অফিসারগণ অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন যাহাতে তাঁহাদের কেন্দ্রে নির্দ্দিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটারগণ ভোট দেন।

(১) ২নং এবং ৬নং ওয়ার্ড—কদমতলা পোলিং কেন্দ্র (২) ৫নং ওয়ার্ড—দিগম্বরী বিল্ডিং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া (৩) ৭নং ও ১০নং ওয়ার্ড—২৩নং খুরুট রোড (৪) ৮নং ও ৯নং ওয়ার্ড—গোলাপবাগান ক্লাবগৃহ শিবপুর রোড, হাওড়া। (৫) চড়াঘাট—চড়াঘাট কেন্দ্র।

আর সাঁকরাইল কেন্দ্রের নির্ব্বাচন পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে ৫ই জুন না হইয়া ৭ই জুন রবিবার প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত হইবে। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রিটার্ণিং অফিসার।"

বালী-বেলুড় নির্বাচন কেন্দ্র সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ৭ জুন, বিজ্ঞাপিত করেছে: "শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের পোলিং অফিসারের কার্য্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় আমি তাঁহার স্থলে ডাঃ সুবোধচন্দ্র পাল মহাশয়কে বালী-বেলুড় কংগ্রেস নির্ব্বাচন কেন্দ্রের 'পোলিং অফিসার' নিযুক্ত করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে উক্ত কেন্দ্রের ভোট অদ্য, ৭ই জুন রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্র ৮ ঘটিকার মধ্যে বালী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে তাঁহার ডিস্পেন্সারীতে গ্রহণ করা হইবে। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রিটার্ণিং অফিসার।"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ৭ জুন, বিজ্ঞাপিত করেছে: "আগামী সোমবার ৮ই জুন অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ৪নং তেলকল ঘাট রোড, হাওড়ায় জেলা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে 'ব্যালট পেপার' সমূহ পরীক্ষা করা হইবে। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রিটার্ণিং অফিসার। হাওড়া জেলা কংগ্রেস নির্ব্বাচন কেন্দ্র হাওড়া ৪ঠা জুন ১৯৩১।"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেসের নীতির বিরোধী; প্রতিবাদ করে তিনি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন, এই বিরোধিতার ফলে কংগ্রেসী ন্যাশনালিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের বন্ধুপুত্র পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় তখন সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁর সামনে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন—পণ্ডিত মালব্য এতদিনে মস্ত বড় ভুল করলেন।

কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বললেন—কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—কংগ্রেস যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে ভুল করেই থাকে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কি সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করা চলত না? মালব্যজী যে পথ বেছে নিলেন তাতে যে কংগ্রেসকেই দুর্বল করা হবে। অথচ কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড রদবদলের চেষ্টা কি কোনোদিন সার্থক হবে ভাবো?

পাঁচুগোপাল উৎফুল্ল হয়ে বললেন—আপনার এই অভিমত সর্বসাধারণকে জানাতে পারি?

শরৎচন্দ্র বললেন—লিখে বিষয়টা আমাকে দেখিও।

পরদিন পাঁচুগোপাল বিষয়টা সাজিয়ে-গুজিয়ে লিখে নিয়ে গেলেন। আদ্যন্ত পড়ে শরৎচন্দ্র বললেন—কিছুই হয়নি। মোটেই লিখতে পারোনি হে!

জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন পাঁচুগোপাল।

শরৎচন্দ্র বললেন—মালব্যজীকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—সেই কথাটাই কোথাও পরিস্ফুট হয়নি। দেখো, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের সমালোচনা করি ক্ষতি নেই, কিন্তু যে কথাটা বলব তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা চাই। তোমাদের—অর্থাৎ সাংবাদিকদের এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। ওটা দাও, আমি নিজেই আগাগোড়া লিখে দেব।

নিজেই আগাগোড়া লিখে দিয়েছেন।

একদা কংগ্রেস ছিল, শরৎচন্দ্রের মতে, বিচ্ছিন্ন, অক্ষম জাতীয় মহাসমিতি; নিজের অদম্য অকপট বিশ্বাসের জোরে মহাত্মা গান্ধী এই প্রতিষ্ঠানে সমগ্রতা এনেছেন, শক্তি দিয়েছেন, প্রাণ সঞ্চারিত করেছেন; তাঁর এই দান সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয়। মৃত্যুর অল্পকাল আগে শরৎচন্দ্র লিখেছেন: "উত্তর কালে হয়ত তাঁহার (মহাত্মা গান্ধী) মত ও পথ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শের হয়ত চিহ্নও থাকিবে না. তথাপি তিনি যাহা দিয়া গেলেন, সমস্ত পরিবর্ত্তনের মাঝেও তাহা অমর হইয়া রহিবে। শৃঙ্খলমুক্ত ভারত ঋণ তাঁহার কোনও দিন বিস্মৃত হইবে না।"

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯২৩ সালে কংগ্রেসে এসেছেন। তিনি বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে পনেরো বছরের ছোটো। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহকর্মী। ১৯২৬ সালে হরেন্দ্রনাথ হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হয়েছেন। বহুকাল তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটিতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেছেন; শরৎচন্দ্র সভাপতি, হরেন্দ্রনাথ সম্পাদক।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসে শরৎচন্দ্র ও হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভট্টাচার্যের মতের মিল হয়নি। এ-বিষয়ে সীতাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদককে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছে

১৯৩১ সালের ১৮ জন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "হাওড়ায় কংগ্রেস কার্য্য লইয়া প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নানা আলোচনা চলিতেছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় হাওড়াতেও একাধিক দল বিদ্যমান। এই দলাদলি হাওড়ায় বহুকাল হইতে আছে, এবং অচির ভবিষ্যে দূর হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই।...হরেনবাবুর উপর বিজয়বাবু আজ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন কেন? হরেনবাবু শরৎবাবুর কথামত চলেন ইহাই কি একমাত্র অপরাধ? কিন্তু বিজয়বাবু তো জানেন শরৎবাবু কাহাকেও নিজ কথামত চালাইতে চান না, তবে তার কথাই এমনই যে তাহা সকলেরই মনের কথা। সে অপরাধ হরেন-বাবুর নয়—শরৎবাবুর নয়, সেজন্য দায়ী শরৎবাবুর প্রতিভা।"

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ২০ জন, লিখেছে : "হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও অপর কয়েক ব্যক্তি এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের "রিকুইজিশন" অনুসারে বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর এক সাধারণ সভায় অধিবেশন হয়। "রিকুইজিশনের" স্বাক্ষরকারিগণ সভায় উপস্থিত থাকিলেও কেহ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠেন নাই। ফলে "রিকুই-জিশন" বাতিল হইয়া যায়।..."

'বঙ্গবাণী', ১৯৩১ সালের ২০ জন (শনিবার), লিখেছে : "গত বৃহস্পতি-বার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ১৪৩নং মধুসূদন পাল চৌধুরী লেনে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়।..." এবং সেই সভাতেই শরৎচন্দ্র ১৯৩১-৩২ সালের হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ২০ জন, ঈষৎ কৌতুক করে লিখেছেন : "কাল আমাদের হাবড়ার জেলা কংগ্রেস ইলেকশন হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালি-গালাজ ও লাঠি ঠকঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়ত বিনা রক্ত-পাতে শেষ হবে না। আমি প্রেসিডেণ্ট, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটা তারের বেড়া, মায় ইলেকট্রিফিকেশন সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরি ছিল বলেই দাঙ্গা হয় নি, নির্ব্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক প্রেসিডেণ্ট আছি, vested interest জন্মে গেছে—সহজে ছাড়া চলে না।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৪ সালের ১২ জুলাই, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

"তোমার কাছে এসেছিলাম এই আশা নিয়ে যে দেখা হবে এবং আজই যাহোক একটা কংগ্রেস ব্যাপারের সমাপ্তি করে যাবো। কারণ এইটুকু তোমার কাছে প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নয় যে যে-হরেনকে আমি নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও

কল্যাণীয়েষু

হঠাৎ তোমার কাছে এসেছিলাম এই আশা নিয়ে যে দেখা হবে এবং আমারই ব্যবহার একটা Congress ওয়ালারা সমাপ্তি করে যাবে। কারণ এই টুকু তোমার কাছে প্রকাশ করা আবশ্যক নয় যে সে-ঘটনাকে আমি নানা বিরোধের মধ্যেও আন্তরিক ভাবে বোধ ছিলাম যে আজ আমার এই দুঃসময় পরিত্যাগ করবে। আজ যদি একটা ভুল করেই থাকি তবু আমাকে ফাঁকি না ভুলিয়ে পারলেনা।

তোমার কাছে আমার প্রার্থনা আমাদের সমস্ত দাঙ্গাদের কাছে অন্ততঃ তুমি লাঞ্ছিত হলেনা।

অন্ততঃ আমার বিশ্বাস তুমি যদি আমাকে দুর্বল না কর, কোন কর্মীই আমাকে কোনদিন অক্ষম করতে পারবেনা। আমার আদেশ নয়, অনুরোধ নয় তোমার কাছে এই টুকু আমি চাই।

২৭শে আষাঢ় ১৩৪৪

তোমার
শরৎদা

আপনার করে রেখে ছিলাম সে আজ আমার এই দুঃসময়ে পরিত্যাগ করবে। আজ যদি একটা ভুল করেই থাকি তবু আমাকে শক্তি না জুগিয়ে পারবে না।

তোমার কাছে আমার প্রার্থনা আমাকে সমস্ত বাঙলা দেশের কাছে অন্ততঃ তুমি লাঞ্ছিত করো না।

আজও আমার বিশ্বাস তুমি যদি আমাকে দুর্ব্বল না করো কোন কর্ম্মীই আমাকে বলহীন অক্ষম করতে পারবে না।

আমার আদেশ বলো অনুরোধ বলো তোমার কাছে এইটুকু আমি চাই।"

'বাতায়ন', ১৯৩৪ সালের ৩ অগস্ট, লিখেছে: "সংবাদ পাওয়া গেল যে শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাওড়া জিলার কংগ্রেসের দলাদলির অবসান ঘটেছে এবং তাঁরা একযোগে কাজ করবেন বলে মনস্থ করেছেন।..."

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৫ সালের ২০ ফেব্রুআরি, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির জয়েণ্ট সেক্রেটারিকে লিখেছেন: "Please call a meeting of the Ex. Committee as early as possible and have my resignation accepted in the meeting." ('সাহিত্য-প্রয়াসী পত্রিকা', ডিসেম্বর, ১৯৭৫)

কিন্তু সেবারের ইস্তফাপত্র নিষ্ফল হয়েছে; শরৎচন্দ্র যেমন ছিলেন তেমনি সভাপতি থেকেছেন।

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ২ মে, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: "হাবড়ার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা বিশেষ দরকার। বিষ্ণুপদ কার্ত্তিক প্রভৃতি দু'একজনকে নিয়ে একবার এসো। আমি দিন চারেক হলো বাড়ী থেকে এসেছি। সুস্থ মোটেই নয় তবু সাবেক কালের নেশা কাটতে চায় না। এখনো কংগ্রেসের ভালমন্দর জন্যে মন কেমন করে। কিরণের কাছে কিছু কিছু শুনেছি তুমি এলেই সব ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারি।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ১০ জুলাই, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: "অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে আমার দরকার। পত্র পাঠ আসা চাই।" ('সাহিত্য-প্রয়াসী পত্রিকা', ডিসেম্বর, ১৯৭৫)

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ১০ অক্টোবর, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

"কাল বিকালে তুমি নোটিস দিতে পারোনি আজকের কাগজে তার উল্লেখ না দেখতে পেয়ে মনে হলো। যদি মিটিঙের নোটিস কাগজে না গিয়ে থাকে তা হলে হাওড়া টাউনহলটাই ঠিক করো। খরচ যা লাগে আমিই দেবো। অবশ্য যদি লাগে। আর যদি ওরা এগ্‌জেমট করে তা হলে খরচ লাগবে না।

যেখানে সেদিন হয়েছিল, অর্থাৎ তোমাদের পাড়ায় আমার যেতে সত্যই ভরসা হয় না। তুমি দায়িত্ব নিয়েছো বটে, কিন্তু হয়ত তোমার কথাও থাকবে

Sarat Chandra Chatterji
P. 566, MONOHAR PUKUR
KALIGHAT, CALCUTTA

Jt Secy. Howrah D. C. C
Howrah.

—

Please call a meeting of the Ex. Comtte. as early as possible and have my resignation accepted in the meeting.

Sarat Ch. Chatterji.
President. H.D.C.C.

20.2.35

না। কারণ...এঁদের সামলাতে পারবে না। সমস্ত দোষ তোমার উপরেই পড়বে। কারণ, আমার সম্ভ্রমের সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই নেই। তাই ভেবে চিন্তে দেখলাম টাউনহল হলে ওরকম ব্যবহার তাঁরা হয়ত করবেন না। তুমি শুধু তিনজন রেট পেয়ার্স দস্তখত নিয়ে পারমিশনের জন্য ভাইস চেয়ারম্যান হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন ক'রো। এবং স্থানটা টাউনহল বলেই কাগজে নোটিস দিও। কাল থেকে আমার শরীরটা আবার খুব খারাপ হয়েছে। আশা করি তুমি ভালোই আছো।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

"This is to submit my resignation from the Presidentship of the Howrah Dist Congress.

It is not due to any slight difference between myself and the Committee, for wherever there is no difference, dispute and bitter quarrels in the Congress organisation throughout Bengal? therefore it is not for that. Recently I have become *very* ill and I feel I could not be of any use to the Congress in future: it is best that I should vacate.

In tendering my resignation I have no ill will against any one and least of all against you, the same affection you will always find in me. Or perhaps, I should not ever have come into politics. It is so very alien to my vocation and so often becomes painful to my inner self. Strife, dissension and disputes inherent in politics were not meant for me: they always destroy that peace of mind I so essentially require...".

সকল দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের পরমাত্মীয়। বহু দেশপ্রেমিককে তিনি সাহায্য করেছেন। কেবল সাহিত্যিক হিসেবে নয়, কংগ্রেসকর্মী হিসেবেও শরৎচন্দ্র স্মরণীয়। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন : "বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে।"

জীবনের শেষ পর্বে শরৎচন্দ্র একদিন কালিদাস রায়কে বলেছেন—দেশ-সেবার প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে কাজ সোজা পথে দ্রুত করা চলে। আমার রচনা দেশের মনকে কতটা আগিয়ে দিয়েছে জানি না—তবে দেশবন্ধুর কাজ যে দশ বছরে পঞ্চাশ বছরের কাজ করেছে—তা আমি স্বীকার করি। তাঁর সেই কাজে আমার কন্‌ট্রিবিউশান আছে। অগ্রগতির পথে সেটাকে চিহ্নিত করে দেখানো যায় না—তা তাঁরই কাজের অঙ্গীভূত হয়ে তার স্বাতন্ত্র্যের দাবী লোপ করেছে। বহু

বাধাবিঘ্ন জয় করে বহু ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে গেছে—দুর্গম পথটা অতিক্রান্ত হয়েছে—এখন পথ সোজা ও সুগম। পথের অত্যন্ত দুরূহ অংশে আমারও সাহায্য আছে—পাথেয়ের মধ্যে আমারও কিছু দান আছে—আর মহত্তর ব্যক্তির মহাব্রতে আমার আত্মনিবেদন আছে—একথা মনে করে আমি আনন্দই পাই, ক্ষুব্ধ হই না। দেশের স্বাধীনতা একদিন আসবেই, বোধ হয় বিলম্বও নেই। দুঃখ এই যে আমি তা দেখে যেতে পারব না। শরীর ক্রমে জীর্ণ হয়ে আসছে—ওপারের ডাক চরম মুক্তির বাণী নিত্যই শোনাচ্ছে। তোমাদের জীবনে সে শুভদিন আসবে—সেদিন এই নগণ্য সেবকটিকে স্মরণ কোরো ভাই।

২১

রবিবার। সকালবেলা। জলধর সেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন।

ঘরের মধ্যে একরাশি ছোটবড় ধুতিশাড়ি ছড়ানো। শরৎচন্দ্রের চাকর সব ধুতিশাড়ি গুছিয়ে বেঁধেছেঁদে রাখছে। আর শরৎচন্দ্র একখানা চেয়ারে বসে টেবিলে আনি-দুআনি-সিকি গুনে গুনে গোছাচ্ছেন।

জলধরকে দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—দাদা, আমি এই দশটার গাড়িতে দিদির বাড়ি যাব। তা বলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন রাত সেই দশটায়।

জলধর বললেন—দিদির বুঝি কোনও ব্রতপ্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছ আর কাঙালীবিদায়ের জন্যে ওই আনি-দুআনি?

শরৎচন্দ্র তাকালেন জলধরের দিকে। বললেন—না দাদা, দিদির ব্রতপ্রতিষ্ঠা নয়।

বলেই শরৎচন্দ্র চুপ করলেন। আসল কথাটা গোপন করাই তাঁর ইচ্ছা।

জলধর বললেন—ব্রতপ্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নতুন কাপড়ই বা নিয়ে যাচ্ছ কেন, অত সিকি-দুআনিরই বা কী দরকার?

খুব ম্লানমুখে শরৎচন্দ্র বললেন—দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চারপাশের গাঁয়ের গরীব-দুঃখীদের যে কী দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কি...

আর কিছু বলতে পারলেন না শরৎচন্দ্র। তাঁর দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "একবার আমার বেহালার বাড়ীতে কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন এক রমণীর প্রতি চা-বাগিচার লোকদের অত্যাচারের কথা বলিতেছিলেন, হঠাৎ শরৎচন্দ্র বুক হাতে চাপিয়া সাশ্রুচক্ষে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।'..."

নিবারণ ঘোষাল হাওড়া আদালতের একজন পিওন।

সামতাবেড়ে দুঃস্থ মানুষজনকে শরৎচন্দ্র নানাভাবে সাহায্য করেন। এবং নিবারণ ঘোষাল এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের একজন মস্ত সহায়। ইংরেজীতে যাকে বলে ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড।

হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট তখন শরৎচন্দ্রের ভক্ত। হাওড়ার সাবডিভিশনাল

অফিসার সামতাবেড়ের দিকে সফরে যাচ্ছেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর হাতে একখানা চিঠি লিখে দিলেন শরৎচন্দ্রকে দেওয়ার জন্য।

সাবর্ডিভিশনাল অফিসার সামতাবেড়ে এলেন। চারদিকে রটে গেল—শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সাবর্ডিভিশনার অফিসার এসেছেন। গ্রামসুদ্ধ মানুষজন সাবর্ডিভিশনাল অফিসারের সঙ্গে ভিড় করে এল শরৎচন্দ্রের বাড়িতে।

আদালতের পিওন হিসাবে নিবারণ ঘোষালও সঙ্গে আছে।

বিস্তর রাস্তা হেঁটে এসেছেন, সাবর্ডিভিশনাল অফিসারের সর্বাঙ্গে ধুলো। সাবর্ডিভিশনাল অফিসার বললেন—ওহে নিবারণ, শিগগির পা ধোয়ার জল নিয়ে এসো।

কথাটা শরৎচন্দ্রের কানে গেল। লোকের ভিড় আর সাবর্ডিভিশনাল অফিসার দেখে শরৎচন্দ্র তখন নীচে নামছিলেন।

সোজা নীচে নেমে এলেন শরৎচন্দ্র। সাবর্ডিভিশনার অফিসারকে বিন্দুমাত্র খাতির করলেন না। বললেন—যান, আপনি আমার বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যান। আপনার পা ধোয়ার জল আমিই দিতাম। আপনিও যেমন অতিথি, নিবারণও আমার বাড়িতে তেমনি অতিথি। আমার অতিথিকে আপনার অপমান করবার কোনও এখতিয়ার নেই।

আরেকদিন। কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। শরৎচন্দ্র চললেন গড়িয়াহাট বাজারের দিকে। সঙ্গে নরেন্দ্র দেব আছেন।

শীতকাল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে ছাতা আছে। একটা ছাতার তলায় দুজনে যাচ্ছেন।

গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে একজন বুড়ী হাত পেতে দাঁড়াল।

পরনে ছেঁড়া কাপড়। বৃষ্টিতে ভিজে গায়ে লেপটে আছে। শীতে বুড়ী কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে ভেতরে যা ছিল—পনেরো-কুড়ি টাকা তো হবেই—শরৎচন্দ্র উপুড় করে বুড়ীর হাতে ঢেলে দিলেন।

বুড়ী অবাক হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র বললেন—মা, এ-টাকায় তোমার যে-কদিন চলে সে-কদিন আর ভিক্ষায় বেরিও না। একে শীত, তাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঠাণ্ডায় তুমি কাঁপছ। দ্যাখো, আমি রোজ এদিকে বেড়াতে আসি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে আবার তুমি এসে দাঁড়িও এই মোড়ে, আমি আবার কিছু দেব। আজ আমার সঙ্গে এর বেশী আর কিছু নেই।

এই কাহিনীটি নিবেদন করে নরেন্দ্র দেব লিখেছেন : "বুড়ী. 'রাজা হও বাবা, বেঁচে থাকো, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক'—বলে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আর আমি? আমার সমস্ত অন্তর এই দরদী মানুষটির পায়ে অসীম শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়লো!"

শরৎচন্দ্র তখন বালিগঞ্জের বাড়িতে। রাস্তায় হইচই শুনে একদিন ভোর-রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। নীচে নামলেন। দেখলেন, কুড়ি-একুশ বছর বয়সের দুজন চোরকে পাড়াসুদ্ধ লোক দারুণ ঠেঙাচ্ছে, তাদের চোখমুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

গেট খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। মারমুখো লোকজনের হাত থেকে দুজন চোরকে উদ্ধার করে বাড়ির মধ্যে টেনে এনে গেট বন্ধ করে দিলেন। মারমুখো লোকজনকে বললেন—বামাল যখন ধরা পড়েছে তখন ওদের পুলিসে দিতে পারো তোমরা। কিন্তু খুন করে ফেলতে পারো না।

পুলিস স্টেশনে পাড়ার লোকেরা শরৎচন্দ্রের বাড়ি থেকে টেলিফোনে খবর দিল।

এদিকে দুজন চোরের চোখমুখ মারের চোটে দারুণ ফুলে উঠেছে। ওদের অবস্থা দেখে শরৎচন্দ্র খুব কাতর হয়ে পড়লেন. নিজেই আয়োডিন তুলোটুলো এনে ওদের শুশ্রূষা করলেন, দু-গেলাস গরম চা বানিয়ে আনার হুকুম দিলেন। আর দুজন চোর তাঁর পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমাদের পুলিসে দেবেন না বাবু, যত খুশি আপনারাই মারুন। আর কখনও এসব কাজ করব না।

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। একটু পরেই পুলিসের গাড়ি এলো। দুজন চোর ধরে নিয়ে চলে গেল।

আর শরৎচন্দ্র গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর। বললেন—আমিই ছেলে দুটোর জীবনের সর্বনাশ করে দিলুম।

চা দেওয়া হল। ছুঁলেন না। তামাক পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে নিভে গেল।

সকাল সাড়ে নটা আন্দাজ নরেন্দ্র দেব আর রাধারাণী দেবী গেলেন শরৎ-চন্দ্রের বাড়িতে। হিরণ্ময়ী দেবী ব্যস্ত হয়ে নরেন্দ্র দেবকে বললেন—ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে এসে পড়েছ, খুব ভালো হয়েছে। কিছুতেই তো তোমার দাদাকে ওঠানো যাচ্ছে না। চা দেওয়া হয়েছে, পড়ে আছে. তামাক পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে নিভে গেল। তোমরা একটু ভেতরে গিয়ে দ্যাখো না—যদি ওঠাতে পারো।

দুজনে আস্তে আস্তে শরৎচন্দ্রের ঘরে ঢুকলেন। শোকার্ত মুখে তিনি বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকালেন।

নরেন্দ্র দেব কথায় কথায় শরৎচন্দ্রকে কিছুটা স্বাভাবিক করে আনলেন। নতুন করে চা বানিয়ে আনতে বলা হল। শরৎচন্দ্র কেবলই বলতে লাগলেন—কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছেলে দুটো. এবারে দাগী চোর হয়ে গেল ওরা। ওদের

বাঁচবার পথ আমিই বন্ধ করে দিলুম নরেন। পুলিসে যে আরও ওদের মারবে না তারই বা কি গ্যারাণ্টি আছে? শুধু নিজের নার্ভকে, নিজের বিবেককে আরাম দেবার জন্যে আমি ওদের মারধোর বন্ধ করে ফোন করিয়ে জেলে পাঠালুম। এটা মোটেই করুণা নয়, উদারতা তো নয়ই, এ কেবল স্বার্থকেন্দ্রিকতা। আমি ঐ বীভৎস মার চোখে দেখতে পারছিলুম না, সহ্য করতে পারছিলুম না। আমার মুহূর্তের অস্বস্তিটাই বড় কথা হল। তাই, মেরো না, বরং পুলিসে দাও—বলে বসলুম।

পড়ার ঘরে সেদিন শরৎচন্দ্র অনেকক্ষণ নরেন্দ্র দেব আর রাধারাণী দেবের কাছে ওই বিষয় নিয়েই অনেক কথা বলেছেন। দুজন চোরকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছেন বলে শরৎচন্দ্র মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছেন। ওদের চুরি করার মূল কারণ দূর করার চেষ্টা না করে চিরদিনের মতো ওদের দাগী চোর করে ছেড়ে দিয়েছেন বলে শরৎচন্দ্র আপসোস করেছেন।

কাহিনীটি নিবেদন করে রাধারাণী দেবী লিখেছেন: "সমাজের যত অবহেলিত, অপমানিত, অপ্রীতিভাজনদের জন্যেই তাঁর হৃদয়ের দ্বার অবারিত ছিল। সমাজ যাদেরই একটু বাঁকা চোখে দেখেছে, শরৎচন্দ্র তাদের বুকে টেনে নিয়েছেন। অত্যাচারিতের প্রতি তাঁর মমতার শেষ ছিল না।"

গরীব-দুঃখীদের কথা বলতে বলতে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বিহ্বল হয়ে পড়েছে, চোখ ছলছল করে উঠেছে। গরীব-দুঃখীদের জন্য তাঁর বেদনার অবধি ছিল না।

অনেক সময়ে শরৎচন্দ্রকে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকতে দেখে কালিদাস রায় জিজ্ঞেস করেছেন—আপনার কি শরীর অসুস্থ? এমন মুখ ভার করে বসে আছেন কেন?

শরৎচন্দ্র তখন একটা করুণ চিত্রের কথা অথবা কোনও দুঃস্থ পরিবারের দুর্গতির কাহিনী শুনিয়ে বলেছেন—এই ব্যাপারটার জন্য কাল থেকে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে। কি করা যায় ভেবে পাচ্ছি না। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি—কিন্তু তাতে কি হবে? মরুভূমিতে অশ্রুপাত! চিরদিনের দুঃখী এরা, মুষ্টিভিক্ষায় এদের কি হবে?

একেক সময়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন—আমাদের এই বাংলাদেশ যে কত দুঃখী, কত দুর্গত, তা আমাদের দেশের শাসকরাও জানে না, দেশের বড় বড় পণ্ডিত, কবি, জননেতারাও জানেন না। এ কি শুধু উদরান্নের অভাব? কত অভাব, কত দুঃখ, কত জ্বালা যে তার হিসাব কেউ রাখে? পল্লীগ্রামে বাস না করলে কেউ জানতে পারে না। পল্লীতে যারা স্বচ্ছন্দে বাস করে—তাদের দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে—অস্বাভাবিক বলে একটুও মনে হয় না—তারা অনুভবই

করে না। নগরে যারা সুখের জীবনযাপন করছে তারা যদি কিছুকাল পল্লী-গ্রামে গিয়ে থাকে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মেশে তাহলে বুঝতে পারবে তাদের ব্যথা কত বিচিত্র—কত গভীর কত দুর্বিষহ। তাদের অন্নকষ্ট হয়তো কোনোদিন ঘুচলেও ঘুচতে পারে—কিন্তু তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সব নিদারুণ দুঃখ, সেগুলো কেউ কখনো ঘুচাতে পারবে বলে মনে হয় না।

বলে শরৎচন্দ্র একের পর এক বিচিত্র ধরনের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কালিদাস রায় লিখেছেন: "বালিগঞ্জের আত্মসুখসর্বস্ব ভোগপিপাসাময় পরিবেষ্টনীর মধ্যে গৃহনির্মাণ করে তিনি (শরৎচন্দ্র) বাস করতে এসেছিলেন—কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত রূপনারায়ণের কূলে দুঃখী কাঙালদের কুটিরে। তাই বারবারই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন, দুর্গত বঙ্গদেশ থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি।"

সাত

সিনেমায় শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'আঁধারে আলো' দেখানো হচ্ছে মনোমোহন থিয়েটারে।

ঢালা বিছানা পাতা বক্সে বসে শরৎচন্দ্র 'আঁধারে আলো' দেখছেন। সঙ্গে আছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়।

সিনেমা শেষ হল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের একপাটি তালতলার চটি কোথায় গেল?

বিস্তর খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু চটির একপাটি পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে শরৎচন্দ্র চটির অন্য পাটি বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন।

হেমেন্দ্রকুমার বললেন—আর একপাটি চটি নিয়ে কী করবেন, ওটাও এখানে রেখে যান।

শরৎচন্দ্র বললেন—ক্ষেপেছ? চোর ব্যাটা এইখানেই কোথায় লুকিয়ে বসে সব দেখছে। আমি এ-পাটি রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। তার সে-সাধে আমি বাদ সাধব,—শিবপুরে যাবার পথে হাওয়ার পুল থেকে চটির এই পাটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেব।

খালি পায়েই শরৎচন্দ্র গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

পরদিনই বক্সের তলা থেকে তালতলার হারানো চটির পাটি পাওয়া গেল।

এই কাহিনীটি নিবেদন করে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: "কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের হস্তগত অন্য পাটি তখন গঙ্গালাভ করেছে এবং সম্ভবত এখনো সলিল-সমাধির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।" (হেমেন্দ্রকুমার রায়: সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ৯৪)

শরৎচন্দ্র ভুল করে ভেবেছেন তাঁর চটির একপাটি চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অন্যরকম ভুলেরও চমৎকার কাহিনী আছে।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় বিস্তর স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছেন শরৎচন্দ্রের কাছে। শরৎচন্দ্র বয়সে অসমঞ্জের চেয়ে চার বছরের বড়।

বিকেলবেলা। প্রায় পাঁচটা বেজেছে। অসমঞ্জ গিয়েছেন বালিগঞ্জে শরৎ-চন্দ্রের বাড়িতে।

শরৎচন্দ্র বললেন—চলো, আজ একটু বাজারের দিকে যাওয়া যাক।

গাড়ি তৈরি। দুজনে এলেন জগুবাবুর বাজারে। অনেক কেনাকাটা হল।

কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে শরৎচন্দ্র মহা মুশকিলে পড়লেন। জিনিসটা বাড়ির মেয়েরা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু জিনিসটার নাম শরৎচন্দ্র একেবারেই ভুলে গেছেন। শুধু মনে আছে জিনিসটা উপকারী, দরকারী, জরুরী, ভিজিয়ে খেতে হয়।

অসমঞ্জ বললেন—ভিজিয়ে খাবার জিনিস? এ তো না মনে পড়বার কিছু নেই। নিশ্চয়—মিছরী।

—না, মিছরী নয়।

—তাহলে বাতাসা।

—আরে দূর! ওসব নয়।

—তবে কি ছোলা?

একান্তমনে ভাবতে ভাবতে শরৎচন্দ্র মাথা নাড়লেন। না, ছোলা নয়।

—তাহলে কাঁচা গোটা মুগ কি বরবটি কড়াই বোধ হয়। কোনও পুজোয় নৈবিদ্যির জন্যে তো?

—আহা-হা না না, ওসব নয়। আর কি বললে তুমি? ছোলা? তা হতে পারে। বোধ হয় ছোলাই—নাঃ, ছোলা নয়। কেননা একটা ছোট ধামায় প্রায় আধধামা ছোলা আজ সকালেই আমি ভাঁড়ারে দেখেছি, মেজের ওপর সামনেই রয়েছে।

কী হতে পারে জিনিসটা? গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন অসমঞ্জ। হঠাৎ বলে উঠলেন—দাদা, ইসবগুল কি?

ইসবগুলের কথায় কান না দিয়ে শরৎচন্দ্র লাফিয়ে উঠে বললেন—চিঁড়ে—চিঁড়ে!

মুদীর দোকান থেকে সের আড়াই চিঁড়ে কেনা হল। অসমঞ্জকে জায়গামতো নামিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র বাড়ি চলে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা অসমঞ্জ গেছেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। শরৎচন্দ্র বললেন—কাল তোমার জন্যে আমি বাড়িতে কি বকুনিটাই খেলুম!

—কেন, কাল আমি কী করেছিলুম, দাদা?

—তুমি চিঁড়ের কথা বললে, আমি চিঁড়ে নিয়ে এলুম। তারপর খুব একচোট বকুনি খেলুম!

—তাহলে চিঁড়ে নয়? কী আনতে বলেছিলেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—নালতেপাতা। ছেলেমেয়ে দুটোর কৃমি হয়েছে, ওঁদেরও পিত্তি বেড়েছে, সব ভিজিয়ে দিনকতক খাবে। ওঃ! ওর জন্যে কাল কী কথাটাই শুনতে হল!

—শুনবেনই তো। আপনিই তো বললেন, 'চিঁড়ে'। আমার ঘাড়ে এখন

দোষ চাপালে তো চলবে না। আমি বরং 'নালতেপাতা'র কাছাকাছি গিয়েছিলুম, 'ইসবগুল' বলেছিলুম।

কিন্তু এই ভুলের চেয়েও ঢের বেশি মজার ভুলের কাহিনী আছে। এবং সেই কাহিনীর সঙ্গেও অসমঞ্জ জড়িত।

অসমঞ্জ তখন বরানগরে থাকেন।

শরৎচন্দ্র এক রবিবার অসমঞ্জকে পরের রবিবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন।

পরের রবিবার সকালবেলা অসমঞ্জ বাজার থেকে মাছ না কিনে সেরখানেক মাংস কিনলেন। বাড়িতে এসে গিন্নীকে বললেন—আজ শুধু মাংসের ঝোল আর ভাত। শেষপাতে দই আর সন্দেশ।

গিন্নী বললেন—আজ না তোমার শরৎবাবুর বাড়ি নেমন্তন্ন?

তাই তো। কথাটা একেবারে মনে নেই।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বরানগর থেকে বালিগঞ্জে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে চলে এলেন অসমঞ্জ। তখন দশটা বাজে।

শরৎচন্দ্রের হাবভাব দেখে মনে হল তিনিও সম্ভবত নেমন্তন্নের কথা ভুলে গেছেন। তিনি বললেন—তা বেশই হয়েছে, চলো, আর বসে দরকার নেই।

অসমঞ্জ বসলেন। বললেন—যেতে হবে কোথায়?

শরৎচন্দ্র বললেন—আজ বোটানিকাল গার্ডেনে Pen ক্লাবের খুব খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। চলো, তুমি যাবে আমার গেস্ট হয়ে।

অসমঞ্জ আপত্তি করে বললেন—আপনার সঙ্গে সেখানে যেতে পারি, কিন্তু খাব আমি এখানেই। এখানে খেয়ে তবে যাব। কারণ নেমন্তন্নটা আমার এখানেই।

অগত্যা দুজনে খেতে বসলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—অত পেট ঠেসে খেও না, তাহলে সেখানে গিয়ে কিছুই খেতে পারবে না। ক্লাবটাও যত বড়, সেখানে আজ খাওয়ার আয়োজনও তত বড়। সুতরাং সেখানকার কথা মনে রেখে পেটটা একটু খালি রেখো। দোহাই তোমার।

এই সদুপদেশে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না অসমঞ্জ। শরৎচন্দ্র আবার বললেন—আমি তো তোমার মতো বোকামি করব না। আমি ওইখানেই খাব। তোমার সঙ্গে বসে—নেহাৎ দুটি না খেলে নয়, তাই।

বোধ হয় আরও কী যেন বললেন, সেদিকে কান দিলেন না অসমঞ্জ। খেয়ে যেতে লাগলেন।

খাওয়ার পর কালীকে ডাকলেন শরৎচন্দ্র। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার

খাওয়া হয়েছে কালী?

—আজ্ঞে না।

শরৎচন্দ্র বললেন—ওখানে গিয়েই একেবারে খাবে'খন, সেই ভালো।

সেই ভালো। গাড়ি রওনা দিল। গাড়ি চালাচ্ছে কালী। গাড়ীতে যাচ্ছেন শরৎচন্দ্র আর অসমঞ্জ।

বোটানিকাল গার্ডেন। গঙ্গার ধারে সাহেবী হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামল।

দুজনে গাড়ি থেকে নামলেন।

কিন্তু অত বড় ব্যাপার, কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন?

চতুর্দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—কই, এঁদের কাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না!

অসমঞ্জ বললেন—এখানেই ঠিক বটে তো?

শরৎচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-বিষয়ে কোনও ভুল নেই। দশবার করে কার্ডখানা আমি পড়েছি।

অসমঞ্জ বললেন—ভালো।

বলে গঙ্গার ধারে পায়চারি করতে লাগলেন।

চতুর্দিকে তাকিয়ে ক্লাবের মেম্বারদের খুঁজতে লাগলেন শরৎচন্দ্র। কোথাও কোনও মেম্বারের দেখা নেই। হোটেলের একটা চাপরাসীকে ডেকে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—বাবুলোক সব আয়া নেহি?

চাপরাসী জবাব দিল—বাবুলোক? কোই বাবুলোগ তো নেহি আয়া, হুজুর। উধার দেখিয়ে—ওহি বটগাছকা নীচুমে বাবুলোককা সব খানাপিনা হোগা মালুম হোতা।

গাড়িতে উঠে এদিক-ওদিক ঘুরে সেই বটতলায় যাওয়া হল। কিন্তু সেখানেও ক্লাবের কোনও মেম্বারের দেখা পাওয়া গেল না। কয়েকজন ছাত্র পিকনিক করছে সেখানে।

হতাশ হয়ে আবার ফিরে আসা গেল সাহেবী হোটেলের সামনে।

অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন—কার্ডে সময়টা কখন লেখা আছে?

শরৎচন্দ্র বললেন—সমস্ত দিনই, বেলা আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

দুপুর তখন প্রায় দেড়টা।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—আটটা বেজে গেছে তো?

অসমঞ্জ বললেন—কিছু বিলম্ব আছে। উঠুন, ততক্ষণ এদের এই গাছতলার চেয়ারে বসে থাকা যাক।

খানিকক্ষণ বসে থেকে শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—হোটেলের

ম্যানেজারকে একবার জিজ্ঞাসা করে এলেই তো সব হাল মালুম হয়ে যাবে এখন।

বলে তিনি হোটেলের ভেতর ঢুকে পড়লেন। পাঁচসাত মিনিট পর ফিরে এসে বললেন—সবই ঠিক। এই হোটেলই বটে, আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তও বটে, রবিবারও বটে, তবে, কি জানি, এরা সব এলো না কেন?

অসমঞ্জ বললেন—আমি তো পেট ভরেই খেয়ে এসেছি, আমার জন্যে দুঃখু নেই। কিন্তু আপনার আর কালীর বরাতেই...

যেন ইচ্ছে করেই কথাগুলো শুনতে চাইলেন না শরৎচন্দ্র। যেন চিন্তিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—চা খাবার তো সময় হল, সেটাতে আবার কোনও ব্যাঘাত না হয়।

ওখানে এক কাপ চায়ের দাম তখন আট আনা।

শরৎচন্দ্র, অসমঞ্জ আর কালীর জন্য তিন কাপ চা দরকার। হিসাবমতো তিন কাপ চায়ের দাম বয়ের হাতে দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—জলদি লে আও।

জলদি চা এসে গেল।

অসমঞ্জের সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। চায়ের পর তাঁর সিগারেট দরকার। বয়কে শরৎচন্দ্র সিগারেট এনে দিতে বললেন। কিন্তু বয় বলল—এক প্যাকেট হুজুর নেহি মিলেগা, পচাঁশকো এক টীন মিলতা হায়।

অসমঞ্জ আপত্তি করে বললেন—সিগারেটের আর দরকার নেই। হয়তো আঠারো আনার এক কৌটো সিগারেট এখানে পাঁচ টাকাই দাম চেয়ে বসবে। কেননা, দু-পয়সা কাপ চা যদি এখানে আট আনা হয়, তাহলে...

শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—আরে, তা তো হবেই, এ আর বেশী কি? সাহেবের হোটেল, বোটানিকাল গার্ডেন, গঙ্গার ধার। ক্যানাপির নীচে, চেয়ার, বয়—আট আনা কাপ, এ আর বেশী কি?

তারপর শরৎচন্দ্র বয়ের দিকে তাকালেন—লে আও এক ডিবিয়া।

সিগারেটের কৌটা এসে গেল।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পাইপ ও তামাক আছে। তিনি অনবরত পাইপ টানতে লাগলেন। আর অসমঞ্জ টানতে লাগলেন সিগারেট। বিরাট ভোজের বদলে দুজনে গাছতলায় আর গঙ্গার ধারে গল্পগুজব করে কাটালেন।

বিকেল তিনটে নাগাদ্ দুজনে গাড়িতে উঠে পড়লেন। এবার ফেরা যাক।

ফিরতিপথে শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বলে উঠলেন—কালী! থামো, থামো।

কালী গাড়ি থামাল।

শরৎচন্দ্র বললেন—কেন থামাতে বললুম, ভুলে যাচ্ছি তো!...ওহো! মনে পড়েছে। এক বোতল সোডা ওই দোকানটা থেকে নিয়ে এসো তো কালী, বড্ড

তেষ্টা পাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরে আবার আরেক জায়গায় শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—রাখো, রাখো, কালী, রাখো।

অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন—আবার কি? সোডা?

—না। ওই যে বুড়ো লোকটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওকে ডেকে আনো কালী, ওই যে, ওই ভিখিরীটা।

গাড়ি থামিয়ে কালী ডেকে নিয়ে এলো লোকটাকে। ছেঁড়াখোড়া পোষাক, জীর্ণশীর্ণ শরীর, মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে, চোখ কোটরে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ভিখিরী?

—আজ্ঞে, না।

—না? আচ্ছা, কিছু খাবে?

—কি আর খাব?

নিজের সাটিনের থলের ভেতর থেকে কিছু পয়সাকড়ি বের করে হাতে নিলেন শরৎচন্দ্র। আবার লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কিছু খেতে চাও তো বলো।

তখন লোকটি হাত পেতে বলল—তা দিন বাবু, কিছু খাব।

পয়সাকড়ি নিয়ে লোকটি চলে গেল।

অসমঞ্জ বললেন—এটা কি রকম হল দাদা? দানটা কি ঠিক উপযুক্ত পাত্রেই করলেন?

—দেখে বুঝলে না লোকটা খেতে পায় না?

—বোধ হয় তা নয়। লোকটা নেশাখোর বলেই মনে হয়। হয়—নেশা, নয়—জুয়ো, নয়তো ওই ধরনের আর কিছু। কিন্তু ভিখিরী ও মোটেই নয়।

সামনের রাস্তার দিকে নজর রেখে কালী বলল—খুব সম্ভব লোকটা নেশা-খোরই হবে।

হয়তো ঠকেছেন বুঝতে পেরে শরৎচন্দ্র আর কোনও কথা বললেন না, চুপ করে রইলেন।

গাড়ি জোরে চলতে লাগল।

হাওড়ার পোল পার হয়ে এসে শরৎচন্দ্র বললেন—মোটে তো এখন সাড়ে তিনটে। দিনের শেষ হতে তো এখনও অনেক বাকি। এ-সময়টা করা যায় কী? কিছু তো একটা করতে হবে?

অসমঞ্জ বললেন—করবার কাজ তো যথেষ্টই রয়েছে। আপনি ছুটুন দক্ষিণে আর আমি পাড়ি দিই উত্তরে।

—না। তোমাকে এখন ছাড়া হবে না।—শরৎচন্দ্র নিজের ঘড়িটা একবার

দেখে কালীকে বললেন—চলো রঙমহল।

'রঙমহলে' সেদিন 'চরিত্রহীনে'র ম্যাটিনি।

'রঙমহলে' এসে শরৎচন্দ্র বললেন—এখনও তো প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি। উপেনকে আনানো যাক।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ফড়েপুকুরে থাকেন। গাড়ি নিয়ে কালী তাঁকে আনতে চলে গেল।

পরমুহূর্তেই শরৎচন্দ্র বললেন—বড় ভুল হয়ে গেল তো। এখানে...

কথার মধ্যিখানে অসমঞ্জ বললেন—আবার কি ভুল হল? তবে আজ ভুলের পর ভুল হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের নয়। আজ তো দেখছি আমাদের ভুলেরই দিন। পয়লা এপ্রিল যেমন ওদের অল ফুলস ডে তেমনি আমাদের আজ অল ভুলস ডে! তা আবার কি ভুল হল, শুনি?

শরৎচন্দ্র বললেন—না, তেমন কিছু নয়। বলছি যে এখানেই বা একটা ঘণ্টা বসে থাকি কী করে? উপেনের ওখানে গেলেই তো হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করা হল। কাছেই উপেন্দ্রনাথের বাসা।

উপেন্দ্রনাথ বললেন—এই তো মোটর এল। তাতে না এসে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে পেছন পেছন আসবার কারণ কি?

কারণ বুঝিয়ে বললেন অসমঞ্জ। এবং সেদিনের সমস্ত ব্যাপারের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন।

উপেন্দ্রনাথের কাছেও নেমন্তন্নের কার্ড আছে। হাসতে হাসতে উপেন্দ্রনাথ জানালেন যে খাওয়া-দাওয়া আজ রবিবার নয়, আগামী রবিবার।

কার্ড দেখা গেল। উপেন্দ্রনাথের কথা ষোলোআনা নির্ভুল।

আট

শরৎচন্দ্র তখন কলকাতার বাড়িতে। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় (মণ্টু) এবং আরও কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শরৎচন্দ্র গল্পের পর গল্প বলে চললেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন।

হঠাৎ হরিদাস দিলীপকুমারকে বললেন—রাতদুপুর হল মণ্টু, মানে মানে চলো প্রস্থান করি—নইলে শরৎদা তাঁর চাকরকে ডাকবেন উইলের জন্য।

শরৎচন্দ্র সহাস্যে বললেন—উইল?

হরিদাস হাসলেন। বললেন—এক যে ছিল সদাশয় ব্রাহ্মণ—আপনারই মতন। অনেককে ডেকেছেন সরস্বতী পুজোর দিন। খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে অভ্যাগতদের আর উঠবার নাম নেই—চলেছে তো চলেইছে পান সরবৎ গুড়ুক গুড়ুক—আর গালগল্প। হঠাৎ এক বিরাট হাই তুলে গৃহকর্তা ডাক দিলেন চাকরকে, 'ওরে বিশে, এই চাবিটা নিয়ে যা তো—লোহার সিন্দুক খুলে বাবার উইলটা নিয়ে আয়।' অভ্যাগতরা তো অবাক! উইল!! কর্তা সেই সুরেই বললেন, 'দেখি, বাবা উইলে বাড়িটা কাকে দিয়ে গেছেন—এঁদের সবাইকে, না আমাকে?' হা হা হা!

হরিদাসের কথার সারমর্ম সম্ভবত এই যে শরৎচন্দ্র গল্প শুনিয়ে লোককে ঘরবাড়ি ভুলিয়ে দিতে পারতেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছেন: "হয়তো অনেকেই জানেন না যে শরৎচন্দ্র খুব ভালো গল্প-বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচু দরের আর্টিস্ট। তাঁর লেখার চেয়ে গল্প-বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর। একথা এই জন্যে বলছি যে, ছাপা হ'য়ে যাবার পর সে গল্প বা কাহিনীর অন্য কোনোরূপ কল্পনা করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একই ঘটনা বা কাহিনীকে শরৎচন্দ্র দিনের পর দিন ভিন্ন ভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তুলতেন—এক-দিনের বর্ণনার সঙ্গে অন্য দিনের এত তফাৎ থাকত যে একই ঘটনাকে বিভিন্ন বলে মনে হত। প্রতিভার লক্ষণই হচ্ছে—মুড। তিনি যেদিন যে-রকম ভাবের খেয়ালে মশগুল থাকতেন বর্ণনাও সেদিন সেই ভাবে রঙিয়ে উঠত।"

"শরৎচন্দ্র তখন গ্রামে থাকেন; সম্ভবতঃ সামতাবেড়ে। একদিন বিকালের

দিকে শুনলেন, পাড়ার একজনদের শোবার ঘরের মধ্যে বিরাট এক গোখরো সাপ আড্ডা নিয়েচে, কিছুতেই বেরুচ্চে না। সুতরাং কেউ আর ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারচে না। অনেক লোক জড় হয়েচে, কিন্তু কেউ-ই কোন উপায় করতে পারচে না। এদিকে অপরাহ্ণ ক্রমেই সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে আসতে লাগলো। আর খানিক পরেই অন্ধকার হয়ে আসবে। তখন আর সে ঘরে কেউ ঢুকতে পারবে না। অথচ ঐ একখানি মাত্র তাঁদের শোবার ঘর। মহা মুশকিল! কি উপায় হয়! দুর্ভাবনা আর আতঙ্কে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এমন সময়, খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্দুকটা হাতে নিয়ে সেখানে এলেন। সকলকে তিনি খুব সাহস দিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'চার জনকে নিয়ে, তিনি খুব সাবধানে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন, সর্প মহারাজ কড়ি-কাঠের একটা ফাঁকে আশ্রয় নিয়েচেন। সকলের পায়ের শব্দে ও গোলমালে সে স্থান ত্যাগ করে, দেওয়াল বেয়ে নীচের দিকে আসতে লাগলো। বহু কালের পুরানো ঘর। তার ওপর, বালি ধরানো নয়; তার ফলে, দেওয়ালের গায়ে অনেক জায়গায় ফাঁক আর ফাটল। সাপটা দেওয়াল বেয়ে এদিক-ওদিক করতে লাগলো। শেষ কালে সুড় সুড় করে একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ইয়া লম্বা সাপ! কুলোর মত চক্কোর! ভয়েত সব আড়ষ্ট! দেয়ালের গর্তটার মধ্যে সাপটা ঢোকাতে, সকলের ভয় আর ভাবনা আরও বেড়ে গেল। গর্ত থেকে মহারাজ না বেরোলে, কার সাধ্য রাত্রে ও-ঘরে কেউ ঢোকে বা শোয়! তিনি কিন্তু দিব্যি সেই ফাটলের ভেতর ঢুকেই রইলেন। বাইরে থেকে কতই খোঁচাখুঁচি করা হোল, কিন্তু সাপের কোন সাড়াশব্দই আর পাওয়া গেল না। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসচে। সকলে মহা চিন্তায় ও সমস্যায় পড়লো। তখন শরৎচন্দ্র বন্দুকে টোটা পুরে, সেই ফাটলের মুখে, বন্দুকের নলের মুখটা রেখে—দিলেন ঘোড়া টিপে—দুড়ুম! সঙ্গে-সঙ্গেই ঝলকে-ঝলকে তাজা রক্ত ফাটলের মুখে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখন বাইরের যত লোক সব ভীড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার পর...তার পর আর কি : সেই মরা সাপকে তখন খুঁচিয়ে টেনে বার করা হল—ইয়া প্রকাণ্ড এক গোখরো!"

এই গল্পটা স্বয়ং শরৎচন্দ্র একদিন বলেছেন। যাঁদের কাছে বলেছেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

অসমঞ্জ দু-একদিন পর হাসতে হাসতে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—গল্পটা কি সত্যি?

—তোমার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয়—মিথ্যে।

সহাস্য ইশারায় শরৎচন্দ্র জানালেন যে তাই, অর্থাৎ মিথ্যে। বললেন—স্থান ও সময় বিশেষে একটু-আধটু মিথ্যে বলতে হয়। তাতে কোনও দোষ হয় না। কারও না তিলমাত্র ক্ষতি হয়, অথচ সকলে একটুখানি আনন্দ পাওয়া যায়, তেমন একটু-আধটু মিথ্যে বলতে কোনও পাপ নেই। তবে, গল্পটা একেবারে মিথ্যে নয়, একটু সত্যি আছে। সাপটা সত্যি, আর তাকে মেরে ফেলাটাও সত্যি। তবে—বন্দুক আর গোখরো—এ দুটো মিথ্যে। সেটা ছিল মস্ত বড় একটা ঢ্যামনা সাপ।

শরৎচন্দ্রের মুখে একদিন একটি কাহিনী শুনেছেন হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনীটি তিনি ছাপার অক্ষরে লিখেছেন: "শরৎচন্দ্র তখন বর্মা থেকে সবেমাত্র কলিকাতায় ফিরেছেন। থাকেন বাজেশিবপুরে বাড়ী ভাড়া ক'রে। সেখানকার এক বুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পাড়ায় থাকে—কাজেই দেখা-শুনো ও দুটো চারটে কথাবার্ত্তা হয় রোজই। একদিন তিনি দেখলেন সেই বুড়ি একটা মনি-অর্ডারের ফর্ম নিয়ে ভারী ব্যস্তভাবে তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে চ'লেছে; শরৎচন্দ্র তাকে ডেকে এতো ব্যস্ততার কারণ ও গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বুড়ী জানাল সে কোনো এক ভদ্দরলোকের কাছে যাচ্চে—বড় দরকার। শরৎচন্দ্র বললেন—ও বুড়ীমা, শুনিই না বাছা কি দরকার তোমার। বুড়ী যেতে যেতেই বললে, এই মনিঅর্ডারের কুপনের ওপর একটা ছোট চিঠি এসেচে, তাই যাচ্চি এই চিঠি পড়াতে সেই ভদ্দরলোকের কাছে। শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন: বুড়ীটা ভাবত এ এক লুচিভাজা বামুন, কুপোনের ওপর দু'ছত্তর বাঙলা চিঠি পড়ার বিদ্যেও এর নেই।"

সামতাবেড়ে চাষাভূষোদের নিতান্ত আপনজন হয়ে থেকেছেন শরৎচন্দ্র। মনোজ বসু লিখেছেন: "হাসিমুখে শরৎচন্দ্র বললেন—একদিন কিন্তু সত্য সত্য আমার বড় দুঃখ হয়েছিল! একখানা টেলিগ্রাম এসেছে, সেটা পড়বার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেছে। এমন কি মাইল দেড়েক গিয়ে ভিন্ন গ্রাম থেকে পড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি সেইখানটায় বসে। অথচ এতগুলোর মধ্যে একটা লোকেরও মনে একথাটা জাগল না যে টেলিগ্রাম পড়বার মতো ইংরেজি বিদ্যা দাদাঠাকুরের থাকলেও থাকতে পারে।"

নিজের জীবনে প্রায় একই রকম ঘটনা দু-জায়গায় দুবার ঘটেছে? নাকি শরৎচন্দ্র নিছক গল্প শুনিয়েছেন?

নিজের জীবনের কোনও কোনও কথা শরৎচন্দ্র কখনও কখনও বলেছেন। কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন: "কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁহারা স্বীকার ক'রিবেন, তাঁহার এই সব কথা সম্পূর্ণ সত্য ত নহেই, কখনও অর্ধসত্য, কখনও প্রায় সম্পূর্ণই মিথ্যা। একই গল্প তিনি বিভিন্ন লোকের

নিকট বিভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন।”

শরৎচন্দ্র যে কীভাবে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতেন তার একটি চমৎকার বিবরণ রাধারাণী দেবী দাখিল করেছেন :

“শরৎচন্দ্র নিজেই নিজের সম্বন্ধে নানা রকম বাজে গল্প বলতেন। পরে বলেছেন,—ওটা ঠিক আমার জীবনে ঘটেনি বটে, কিন্তু আমারই জানা অন্য একজনের ঘটেছে। একবার তাঁর নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে একটি খুনের গল্প বলেছিলেন। আমরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলুম। জন-কতক বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি নতুন এসেছেন, তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে। গল্পটি ছিল কয়েকটি শ্রমিকের মত্ত অবস্থায় বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া। জায়গাটা বেশ নোংরা। মত্ততার ঝগড়া বাড়তে বাড়তে তাদের আচরণ কতো অদ্ভুত হয়ে উঠলো, তাদের কথাবার্তা কতো অসংলগ্ন অর্থহীন হয়ে গেল,—শেষ পর্যন্ত একজন অপরাধীর ভূমিকায় কি-রকম কাতরভাবে সকলের পায়ে ধরে মার্জনাভিক্ষা করতে লাগলো,—আর অন্য একজন মত্তব্যক্তি বিচারকের ভূমিকায় প্রচন্ড ক্রোধে তাকে হাতের কাছে যে একটি কুড়ুল পড়েছিল, সেই কুড়ুলের ঘায়ে সত্যি সত্যি খুন করে ফেললো,—তিনি চমকপ্রদ ভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। ঘরের সমস্ত মানুষ আমরা তখন বিস্ময়ে ভয়ে উত্তেজনায় কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্রের লেখা যেমন পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না, গল্প বলাও ছিল তেমনি আকর্ষণীয়। নিঃশ্বাস রোধ করে শুনতে হত, এমনি বলার ভঙ্গি ছিল। প্রত্যেক কথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকতো না।

সেদিন যে-ভদ্রলোকেরা শরৎদার সঙ্গে নতুন আলাপ করতে এসেছিলেন, তাঁরা তো স্তম্ভিত। আড়ষ্ট হয়ে শুকনো মুখে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে পড়লেন একে একে সকলে। যত ভালো লেখকই হোন না, ঐ রকম পরিবেশের মানুষ যিনি, আর ঐ গল্প ভদ্রসমাজে রসিয়ে গল্প করতে যাঁর রুচিতে বাধে না, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গ সাহচর্যের জন্য তাঁদের তখন আগ্রহ উবে যাওয়া আশ্চর্য নয়। পাড়ার দু'একজন ভদ্রলোকও এটা-ওটা ছুতো করে উঠে পড়লেন। গল্পটি রোমহর্ষক হলেও বিস্ফোরকও ছিল। সভ্যভব্য ছাপোষা গৃহস্থের পক্ষে একটি খুনে ডাকাতের সাহচর্যটা খুব স্বস্তিজনক নয়। তাঁরা উঠে গেলে, শরৎচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—ওরা আমার সম্বন্ধে আজ যা ধারণা করে গেলো, সেটা ওদের বই পড়ার খুশির সঙ্গে মিলবে না। এই জাতের একটা মানুষকে এত খাতির করে গেল ভেবে—ওদের গা ঘিনঘিন করবে।

ঐ গল্প বলার কিছুদিন পরে একদিন শরৎদা আমাদের বাড়ির বৈঠকে

গল্পগুজব করছেন বিকেলবেলায়। বার্মার গল্প। বলতে বলতে প্রসঙ্গক্রমে সেই মিস্ত্রিদের কথা এসে পড়লো। বললেন—'সেই যে—বীরেন মিস্ত্রি—খুনের হাঙ্গামায় যে পড়েছিল, যার দাদা তাকে আরাকানে পাঠিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে-ছিল—' ইত্যাদি। আমি তাড়াতাড়ি জেরা করতে লাগলুম তাঁকে। জানা গেল, সেই খুনের কাহিনীটি ওদেরই মুখে শরৎদার শোনা। তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে আদপেই উপস্থিত ছিলেন না। অথচ, সেদিন তাঁর বৈঠকখানায় একঘর লোককে পাথরের মূর্তি বানিয়ে দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা নিয়ে গল্পটি বলেছিলেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললুম—তবে যে আপনি সেদিন বললেন, আপনিও ওদের সঙ্গে ছিলেন। বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে লোহার তারের কাঁটায় হাত পা ছড়ে, জামা কাপড় ছিঁড়ে পালিয়ে ছিলেন?

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন—ওটা সত্য কথাই। পালিয়ে ছিল ট্যারা কানাই। সে-ই তো আমাকে সমস্ত গল্পটা পরে এক সময়ে বলে-ছিল। গল্পটা কিন্তু সত্যি।

আমি খুব রেগে গিয়েছিলুম। 'তা বলে ঐ রকম একটা নোংরা জায়গায়, মিস্ত্রি মজুরদের মাতলামি খুনখারাপির মধ্যে নিজেকে 'হিরো' করে গল্প করতে ভদ্রলোকদের সামনে আপনার বাধলো না বড়দা? অতলোক আপনাকে সেদিন কী না কী ভাবলো বলুন তো? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করচে!'

শরৎদা হেসে উঠে বলেছিলেন—চাক্ষুস ঘটনা বলে না বললে গল্প ঐ রকম জমে উঠতো কি? রাগ করিস কেন? আমি ছিলুম না বটে, কানাই তো সত্যিই সেখানে ছিল। তার কাঁটাতারে হাত পা ছড়ে রক্তপাত হয়েছিল, কাপড় ছিঁড়ে-ছিল, সমস্তই সত্যি। শুধু কানাই নামটার বদলে 'শরৎ চাটুয্যে' বসিয়ে দিয়েছি মাত্তর।"

যামিনীকান্ত সোম একদিন শরৎচন্দ্রের মুখে একটি গল্প শুনেছেন :

"গুরুজীর বহু শিষ্য-সেবক। সবাই থাকেন তটস্থ। গুরুজী একদিন বললেন, দেখ গঙ্গামাঈর পূজা করতে হবে। তার ব্যবস্থা কর দেখি।

শিষ্যরা বললেন, সে আর বেশী কথা কি! কালকেই করছি। এই বলে, পূজার নৈবেদ্য, নানা উপকরণ—নানা রকমের ফুল সব হাজির করলো শিষ্যেরা। পূজার ব্যবস্থা হোল গঙ্গা ঘেঁসে।

গুরুজী পূজায় বসলেন। শিষ্যরাও ঘিরে বসেছে সব। এমন সময় ভীষণ গর্জন করতে করতে, জল তোলপাড় কোরে, এক বড় জাহাজ এসে পড়লো সেই ঘাটে। রোজই আসে, আজও এলো। আর ঘাটের ধার দিয়ে যাবার সময় জল তোলপাড় কোরে, ভীষণ ঢেউ তুলে, গুরুজীর গঙ্গাপূজার নৈবেদ্য, উপকরণ,

ফুলটুল সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। গুরুজী তো রেগেই অগ্নিমূর্তি। আস্ফালন কোরে বললেন, আচ্ছা! জাহাজ, কাল তুমি এসো—তোমার মুণ্ডু খাব আমি, তবে আমি গুরুজী! কাল আমি জাহাজকে জাহাজ খেয়ে ফেলবো, তবে আমার নাম! শিষ্যরা গুরুজীর রাগ দেখে, আর জাহাজ খাওয়ার কথা শুনে ভেবেই অস্থির।

পরদিন জাহাজ আসতে লাগলো দূরে। গুরুজী তাই দেখে এক হাঁটু জলে রইলেন দাঁড়িয়ে। সে তাঁর কি রুদ্রমূর্তি। জাহাজ আসুক, এলেই খাব। তারপর ভীষণ গর্জন করতে করতে জাহাজ আসতে লাগল। গুরুজী বিরাট এক হাঁ করে এগুতে লাগলেন। এমন সময় হোল কি, গুরুজীর জনকয়েক শিষ্য আর সেবিকা মহা আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে গুরুর পায়ের তলায়, সেই জলের মধ্যেই লুটিয়ে পড়লো। বললো, এ কি করছেন আপনি গুরুজী? জাহাজ খাবেন? জাহাজে কত নিরীহ ছেলে-পিলে, মেয়ে-মানুষ, কত ভাল-মানুষ লোক সব আছে! তারা তো কোন অপরাধ করেনি। জাহাজ খেতে হোলে, তাদেরও সব খেতে হবে। তাদের কি দোষ! আপনি এত বড় গুরুজী, আপনার কি এ কাজ সাজে? ক্ষান্ত হোন্। ক্রোধ সম্বরণ করুন। মাফ করে দিন জাহাজটাকে। ও জড় পদার্থ, ও কি বোঝে।

গুরুজী চোখ বড় বড় কোরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ভয়ানক গম্ভীর হোয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক বলেছিস তোরা। নিরীহদের খাবো না—জাহাজটা খাবো না তাহলে। যাক্। তোদের কথায় ওকে ছেড়ে দিলাম। জাহাজ ততক্ষণে এসে পড়েছে। জাহাজটা ভীষণ গর্জনে ভয়ানক ভয়ানক ঢেউ তুলে গুরুজী আর শিষ্য-সেবিকাদের ভিজিয়ে দিয়ে সেখান দিয়ে চলে গেল। গুরুজী হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বললেন, "যা, যা, এ যাত্রা বেঁচে গেলি।"

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের দৌলতে শরৎচন্দ্রের মুখের একটি গল্প পাওয়া গেছে :

"অনেক বছর আগেকার কথা...তখন কলকাতায় একটা অফিসে চাকরি করছি...থাকি বৌবাজার অঞ্চলে একটা মেসে।...

মেসের এক বন্ধুর বিয়ে। বন্ধুর বাড়ী মগরায়...বিবাহ হবে শ্রীরামপুরে... মেয়ের বাড়ী শ্রীরামপুরে। বর যাবে দেশের বাড়ী থেকে বিয়ে করতে ট্রেনে চড়ে শ্রীরামপুর। রাত দশটায় বিয়ে। আমরা মেসের বন্ধুরা যাবো কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে বরযাত্রী। মেস থেকে শেয়ালদার ট্রামে চড়ে এসে হেয়ার স্ট্রীট-স্ট্রাণ্ড রোড ক্রশিংয়ে নিমতলার ট্রামে চড়ে উঠে নামতে হবে হাওড়া ব্রিজের এপারে এবং হেঁটে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে হাওড়া ষ্টেশনে আসা—তারপর

হাওড়া থেকে ইণ্টার-ক্লাশ রিটার্ণ টিকিট কিনে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নেমে কন্যার বাড়ী যাওয়া। আমরা যাবো চারজন...চারজনের জন্য ট্রেনের আর ট্রামের ভাড়া বর দিয়ে গেল।

বিয়ের দিন আমরা বরযাত্রী সেজে রওনা হলুম। শ্রীরামপুর ষ্টেশনে যখন পেঁাছলুম...সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন কন্যাকর্ত্তার বাড়ী যাওয়া। ছাপানো একখানা চিঠি বর দিয়েছিল...তাতে কন্যাকর্ত্তার নাম ছিল। কিন্তু সাজসজ্জার ধুমে সে-চিঠিখানি সঙ্গে নিয়ে আসা হয়নি। কার বাড়ী যাবো... নাম জানি না। ভাবনা হলো...কিন্তু চকিতের ভাবনা। মনে হলো, ছোট গ্রাম... এ-গ্রামে বিয়ে-বাড়ী খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। বেরুলুম...কিন্তু এমন গ্রহ... শ্রীরামপুরে সেদিন বাড়ী-বাড়ী বিবাহ চলেছে...সানাই বাজছে। চলতে চলতে দেখি, কটা বাড়ীতে সানাই বাজছে...শাঁখ বাজছে...সামনে লোকজনের ভিড়! তাকিয়ে তাকিয়ে কোনো চেনা মুখ দেখি না...কাজেই কটা বাড়ী পার হয়ে আমরা চলেছি তো চলেছি। ঘণ্টাখানেক পাগলের মতো ঘুরে চটকদার একটা বাড়ীতে ঢুকলুম...পরিচয় দিলুম—বরযাত্রী। তাঁরা খাতির করে বসালেন। শুনলুম, বর তখনো আসেনি। বেশ! আমরা বসে আছি। কিন্তু বসে আছি তো বসেই আছি! আরো পাঁচজন আসরে বসেছেন...তাঁদের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝলুম, কায়স্থ-বাড়ী...আমাদের বর কিন্তু জাতে ব্রাহ্মণ। বুঝলুম, ভুল বাড়ীতে এসেছি। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, এ'দের বর আসবে বালি থেকে। তখন চারজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে উঠে পড়লুম এবং ঘুরতে ঘুরতে আরো দু-তিন বাড়ী গোঁত্তা খেয়ে সাড়ে নটা নাগাদ ঠিক ঠিকানায় এসে পেঁাছুলুম। বরকে দেখা গেল। আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কিন্তু ও হরি...কেউ খাতির করে না...সকলের যেন কেমন ছাড়-ছাড় ভাব। ছুটোছুটি চলেছে...সেই সঙ্গে তর্কাতর্কি, বাদানুবাদ। শুনলুম, বরপণের বাকি টাকা নিয়ে গোলযোগ চলেছে। বরপক্ষ রেগে কাঁই...কন্যাপক্ষ বিনয়নম্রভাবে কাকুতি-মিনতি করছে। আমরা তো প্রমাদ গণলুম। বর দেখি, নির্লিপ্ত-নির্বিকার বসে আছে একটা ঘরে; আমরা আছি সে-ঘরের বাহিরে লম্বা একটা দালানে। দালানের নীচে উঠান...উঠানে রাংচিতার বেড়া...বেড়ার ওদিকে খানিকটা বাগান। দু'-চারটে এসেটিলিন বাতি জ্বলছে...আমাদের দালানে আর বরের ঘরেও এসেটিলিন বাতি।

হঠাৎ এক সময়ে দেখি, রফা হয়ে গেছে! কন্যাপক্ষ এসে বরকে নিয়ে গেল। এবারে বিবাহ। আমাদের কেউ খেতে বলে না। ভাবলুম, বিয়ে ওদিকে সুরু হলে...তার পর এদিকে খাওয়ানোর পালা।

বসে আছি...বসে আছি...ভিতর-বাড়ীতে শাঁখ বাজলো...উলু-উলু রব

উঠলো এবং প্রায় এগারোটা নাগাদ কজন বরপক্ষীয়ের লোক এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে ওদিককার বড় দালানে এনে বসালো। সেখানে কুশাসন পাতা... কুশাসনের সামনে কলাপাতা ভাঁড় খুরি। মনে হলো, যাক...এবারে খেতে পাবো।

আসলে বসে আছি...লুচি আর আসে না! হঠাৎ বাহিরে হৈ-হৈ রব। শুনলুম, কজন বলে উঠলো—খাওয়াবো কি! এমন ছোটলোক...বিয়ে তো সেরে দিয়েছি...রাংচিতার বেড়া উপড়ে মেরে তাড়া সব ব্যাটাকে!

এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাঁচামেচি গোলমাল...দু-পক্ষে ক্রমে মারামারি লেগে গেল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো...তাইতো, দালানে কুকুরমার-ভোগ করতে হবে নাকি? চাচা আপন বাঁচা! উঠে দে দৌড়! আমরা চারজনেই শুধু নয়...অনেকেই! তখন মারামারি চলেছে...আমরা তো দৌড়ে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে পথে এসে যেদিকে দুচোখ যায়...চলেছি। চলে চলে গঙ্গার ধারে এলুম। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে...তার উপর এত রাত হয়েছে...কলকাতায় ফিরবো...ট্রেন নেই। থাকলেও এ-অন্ধকারে পথ চিনে ষ্টেশনে যাওয়া অসম্ভব। পথে কোনো গাছ-তলায় কিম্বা কোনো বাড়ীর রোয়াকে পড়ে রাত কাটাবো...সকাল হলে মেসে ফেরা! কিন্তু খিদে...তোমরা বুঝবে না হে, কি খিদেই পেয়েছে সকলের! বরযাত্রীর নিমন্ত্রণে চলেছি...ভুরি ভোজ...সেজন্য আসবার সময় দুখানা করে বিস্কুট আর এক পেয়ালা করে চা খেয়ে কজনে বেরিয়েছি।

কিছু খেতে হবে...কিন্তু পুঁজি তেমন নেই! সকলের আর্থিক অবস্থা—সেই কথায় বলে, অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণ! ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারেই একটা দোকান পেলুম...মুড়ি মুড়কি বাতাসার দোকান। দোকানী বসে খাতা খুলে তার পাওনাগণ্ডার হিসাব কষছে। আমরা গিয়ে বললুম—খাওয়াতে পারো?

দোকানী বললে—আজ্ঞে...মুড়কি আছে...চিঁড়ে আছে...মুড়ি আছে...বাতাসা আছে।

ব্যস-ব্যস-ব্যস! আমরা বললুম—তাই খাবো। পেট ভরে খাওয়াও তো বাপু।

দোকানী বেশ যত্ন করে খাওয়ালো। চারজনের পেটে সে-রাত্রে বহু রাক্ষস এসে জুটেছিল! পেট ঠেসে খেলুম দোকানীর দেওয়া মুড়ি মুড়কি বাতাসা আর চিঁড়ে। দোকানী কলা এনে দিলে। দুধ পাবো কোথায়? জল দিয়ে চিঁড়ে মুড়কি মুড়ি আর বাতাসা মেখে ফলার যা খাওয়া গেল...পেট ঠেসে খাওয়া। দোকানী তার ষ্টক প্রায় উজাড় করে দিয়েছিল! এখন দাম দেওয়া। দোকানী হিসেব করে বললে—প্রায় তিন টাকা! তখন পকেট হাতড়ে হাতড়ে আমাদের কজনের কাছে দেখি, আছে প্রায় পাঁচসিকে। দোকানীকে বললুম—নগদ পাঁচসিকে আছে বাপু... নাও।

দোকানীর চোখ উঠলো কপালে! সে বললে—বলেন কি বাবুরা! আমি

গরীব মানুষ! আমার...

বুঝিয়ে আমাদের অবস্থার কথা বললুম...তা সে শুনবে কেন? শেষে আমরা ট্রেনের রিটার্ণ হাফ টিকিটগুলো বার করে তার হাতে দিলুম...বললুম —এই নাও চারখানা টিকিট...শ্রীরামপুর থেকে হাওড়া যাবার ইণ্টার-ক্লাস টিকিট। কলকাতায় যেতে হয় তো...যাবার বেলায় এই টিকিটে যেয়ো...দাম লাগবে না। ফেরবার সময় টিকিট কিনে ফিরবে—এক-পিটের ভাড়া বাঁচবে... তাই লাভ! আমাদের কাছে এ ছাড়া আর একটি পয়সা নেই বাপু।"

সন্ধ্যাবেলা কৃষ্ণনগরে এসেছেন শরৎচন্দ্র। উঠেছেন ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "সকলকে লইয়া সেই যে তাঁহার হাসি গল্প এবং রহস্যালাপ আরম্ভ হইল হাতমুখ না ধুইয়া ও একরকম আহার নিদ্রা সব ভুলিয়াই অনেক রাত্রি অবধি তাহার একটানা স্রোত বহিয়া চলিল। পরদিন সকালবেলা হইতেই শরৎবাবুর আবার গল্পস্রোত আরম্ভ হইল। এত কথাও জানিতেন, কত দেশের কত রকম অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল এবং সে সবই কেমন রহস্যের সহিত সুন্দর গল্প করিতে পারিতেন ও গল্পচ্ছলে কত হাসি ও আনন্দ বিতরণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে কেবল দু এক কাপ চা খাইতেছিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোকগণও কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে একাধিকবার চা খাইতে দেখিয়া একজন বলিলেন— "এত চা খাইলে আহারের ক্ষুধা থাকে না"—সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবু উত্তর দিলেন—"যদি চা খেলে দুর্দান্ত খিদেটা চলে যায় সে তো ভালই।" তাঁহার বলিবার ভাব ও ভঙ্গি দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।"

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী শরৎচন্দ্রের মুখের একটি গল্প বলেছেন। আমাদের ভাগ্য ভালো, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গল্পটি শরৎচন্দ্রের জবানিতেই শুনিয়েছেন :

"একবার ছেলেবেলা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হ'য়ে গেল হার্ণিয়া। মহা-মুস্কিল, চলতে ফিরতে পারিনে, যন্ত্রণায় অস্থির! গেলুম ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার মানে আমাদের গাঁয়ের ডাক্তার। ডাক্তার তো অবস্থা দেখে নিজেই ভড়কে গেল। সে বললে—এ তো এমনিতে যাবে না. অস্ত্র করতে হবে। ট্রাস পরে থাকলে যন্ত্রণার অবসান হবে, কাজকর্ম অল্পস্বল্প করতে পারবে। নইলে অবিলম্বে মারা যাবার সম্ভাবনা আছে।

বলে কি রে বাবা! কোমরে সেই ট্রাস এ'টে আমি বেড়াতে পারব না। এ—তে যাই হোক! হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, অস্ত্র করলে ভালো হতে পারি না?

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বললে—হ্যাঁ, তা ভালো হ'তে পার, আবার—

—আবার কি মশায়?

—আবার না-ও হ'তে পার। হার্ণিয়া অপারেশন করে শতকরা পঞ্চাশটি

লোক মারা যায়। তাছাড়া অপারেশনের পরেও আবার হ'তে পারে।

—তবে উপায়! আমি তো মশাই ট্রাস পরে ঘুরে বেড়াতে পারব না—তাতে মারা যাই যাব।

ডাক্তার এমন করে একটা ঢোঁক গিললেন যাতে মনে হ'ল অনেক কথাই বলবার ছিল কিন্তু তা না বলাই ভালো। যা হোক, ঢোঁকের পর কিছু উদ্গারের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলুম কিন্তু সে উদ্গার আর উঠছে না দেখে জিজ্ঞাসা করে ফেললুম—ডাক্তারবাবু, আমি অপারেশনই করাব স্থির করেছি, আপনি করবেন?

ডাক্তার বললেন—ও সব বড় বড় অপারেশন কি আর বাড়ীতে হয় হে! কাটাতে যদি চাও তো হাসপাতালে যেতে হবে।

হাসপাতালের নাম শুনে দস্তুর মতো ভড়কে গেলুম। দুনিয়ায় যার কেউ নেই সে ব্যক্তিও নেহাৎ জীবন-মরণের ব্যাপার না হ'লে সেকালে হাসপাতালে যেত না। সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, হাসপাতালে ঢুকলে তাকে একেবারে খাটে চড়ে বেরুতে হয়। আগের দিনে লোকে যেমন উইল করে তীর্থ করতে যেত, সে সময়ে হাসপাতালে যেতে হ'লেও বিষয়ী লোক উইলের কথাটা একবার ভেবে নিত। যাই হোক, বাড়ীতে হাসপাতালের নাম করতেই তো সেখানে মড়াকান্না উঠে গেল। গুরুজনেরা বললেন ডাক্তারের ত্রিসীমানায় যেও না, বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা। জোরসে জড়িবুটি, মন্ত্রপূত তৈল, কবচ ইত্যাদি চলতে লাগল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না—শেষকালে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে ঠিক করলুম--যা থাকে কপালে, হাসপাতালে গিয়ে অস্ত্রই করাব। সেরে যদি যাই তো বেঁচে গেলুম আর মরে যদি যাই তো এ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়ে যাব। এই মনে করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে একদিন কারুকে কিছু না জানিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে কলকাতা আসা গেল।

মেডিক্যাল কলেজে ঢোকা হবে না, তাহ'লে বাড়ীর লোক টের পেয়ে গিয়ে বাধা দিতে পারে মনে ক'রে ভাবলুম অন্যত্র কোথাও চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। কিন্তু অন্যত্র কোথায়ই বা চেষ্টা করি! এখন যেমন অলিতে-গলিতে হাস-পাতালের ছড়াছড়ি তখন তা ছিল না। খোঁজ করতে করতে শেষকালে হদিশ একটা লেগে গেল।

কলকাতার একজন উৎসাহী চিকিৎসক ডাক্তার চৌধুরী তাঁর নাম। তিনি একটি বেসরকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই যুগে। ভদ্রলোক জীবনমরণ পণ করে সেই হাসপাতাল ও তৎসংলগ্ন মেডিক্যাল স্কুলে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তখনকার দিনে সহরের উপান্তে শৃগাল-নেকড়ে-অধ্যুষিত খানিকটা জমিতে চালাঘরে ছিল সেই হাসপাতাল। যে রুগীকে সব হাসপাতাল

থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত তারা গিয়ে জুটত সেই চৌধুরীর হাসপাতালে। ঠিক করা গেল এইখানে গিয়ে ভর্ত্তি হ'লে কোনো খোঁজ পাওয়া বাড়ীর লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না।

পরের দিন সকালবেলা তো ভাই তাদের আউটডোরে গিয়ে বললুম—আমি হার্ণিয়া কাটাতে চাই।

—আরে এস এস—তারা শুনে তো আমায় মহাসমাদর ক'রে ভর্তি করে নিলে। বললে—বড় ভাল সময়ে এসে গেছ তুমি। কালই আমাদের বড় সার্জেনের অপারেশন করবার দিন। একটু পরেই তিনি আসবেন, তোমায় দেখে-শুনে যাবেন।

ভর্তি হয়ে গেলুম। বড় সার্জেন এসে দেখে গেলেন। সঙ্গে ডাক্তার চৌধুরীও এলেন। তিনি বললেন—আজ আর তোমায় খেতে-টেতে কিছু দেওয়া হবে না। জোলাপ খেয়ে শুয়ে পড়।

আমাকে একটা আলাদা ঘরে থাকতে দেওয়া হ'ল। ভাবলুম ভালই হ'ল, অন্য রুগীদের সঙ্গে থাকতে হ'লে তারা সব চ্যাঁ-ভ্যাঁ করবে দিনরাত, এ বেশ নিরালায় থাকা যাবে।

শুয়ে আছি আর ভাবছি। বেলা প্রায় বারটা নাগাদ এক ভদ্রলোক একটি আউন্স-গ্লাস ভর্তি ক'রে জোলাপ এনে বললে—নাও খেয়ে ফেল, এটা জোলাপ।

বললুম—মশাই, জোলাপ তো খাওয়াচ্ছেন—তার আগে দয়া ক'রে পায়খানাটা দেখিয়ে দেবেন কি?

লোকটা তিরিক্ষি হয়ে বললে—বাক্যি-টাক্যি তো বেশ বেরোয় দেখছি--ঐ যে পায়খানা।

পায়খানাটা দেখিয়ে দিয়ে লোকটি বললে—যাও আজকের মত উঠে হেঁটে যাও, আর তো উঠতে হবে না—

আউন্স-গেলাশটা শেষ করে তার হাতে দিয়ে বললুম—কেন মশাই?

বেশ চটে গিয়ে সে বললে—কেন মশাই! এখানে মরতে এসেছ কেন? সজ্ঞানে কি কেউ এখানে আসে!

—বলেন কি!!

—হ্যাঁ, কেউ রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ল—কেউ বিষ খেয়ে শেষ অবস্থায় পেঁছিল—যার তিন কুলে কেউ নেই, রাস্তায় পড়ে মরছে, রাস্তার লোকে তুলে এইখানে পেঁছে দিয়ে গেল—লাশটা মড়াকাটার কাজে লাগল—

লোকটা আরো কি সব গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ভাবলুম, আর কেন, এবার লম্বা দেওয়া যাক। শেষকালে কি বেঘোরে

প্রাণটা খোয়াব! গুটি গুটি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছি, একটু ফাঁকা পেলেই স'রে পড়ব—কিন্তু লোক লোক লোক—লোক চলার আর বিরাম নেই। সবাই হাঁ ক'রে আমার মুখের দিকে চায়। এই রকম করতে করতে প্রায় দু-ঘণ্টা কেটে যাবার পর একটু নিরিবিলি হ'তেই পালাব মনে করে কয়েক পা এগিয়েছি। এমন সময় পেটের ভেতর বুঝলে কিনা ডাক ছাড়লে—কৌন্ হ্যায়?—

দরজার দিকে না গিয়ে ছুটতে হ'ল পায়খানায়। এক পায়খানাতেই হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল—কিন্তু রেহাই নেই—বারকয়েক যাতায়াত ক'রে একেবারে নিঃঝুম হয়ে এসে ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

সন্ধ্যে হবার একটু আগে ডাক্তার চৌধুরী এসে একবার দেখে গেলেন। বললেন, ঘর ঠিক আছে তো?

বললুম—ঠিক আছে কি মশায়? ক্ষিদের চোটে মারা গেলুম যে। হয় আমাকে কিছু খেতে দিন, নইলে আমি বাইরে গিয়ে খাবার-দাবার খেয়ে আসি।

ডাক্তার চৌধুরী খিঁচিয়ে উঠলেন—বাইরে খাবার খেয়ে এসে একেবারে আমায় উদ্ধার করবে—জানো, তোমার পেট থেকে বদহজম খাবার বের করতে আমার কত খরচ হয়েছে! আজ আর কিছু খেতে পাবে না—কাল অপারেশন হবে, চুপ ক'রে শুয়ে থাক।

দেখলুম এখানকার সবার মেজাজই তেরিয়া। যাক, পড়েছি মোগলের পাল্লায় মনে করে চুপ ক'রে পড়ে রইলুম। সারা রাত অন্ধকারে পড়ে পড়ে নানান ভাবনায় ঘুমই এল না।

"কালনিশি পোহাইল!"

ভোর হতে না হতে দুই যমের দূত ঝোলা নিয়ে এসে হাজির! বললে—চল।

—কে বাপু তোমরা! কোথায় যেতে হবে?

দু-একজন লোক—খুব সম্ভব হাসপাতালেরই পুরোনো রুগী তারা, সকালবেলা এদিক-ওদিক ক'রে বেড়াচ্ছিল, এগিয়ে এসে বললে—ঝোলায় উ'ঠে পড়—উচ্ছুগ্‌গ্য হবার আগে ঝোলায় চড়তে হয়।

বুঝলুম অপারেশন-রুমে নিয়ে যাবার জন্য ঝোলা এসেছে। বললুম—চল আমি হেঁটেই যাচ্ছি, ঝোলায় চড়বার দরকার নেই।

যমদূতেরা কিছুতেই শুনলে না। তারা একরকম জোর ক'রে আমায় পেড়ে ফেলে নিয়ে চলল অপারেশন-রুমে।

অপারেশন-রুমে পৌঁছে দেখি সেখানে অনেক লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন—ডাক্তার চৌধুরীও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। দেখলুম তিনিই সর্বেসর্বা।

আমায় নিয়ে যাওয়া মাত্র ডাক্তার চৌধুরী বললেন—এস এস ছোকরা, তাড়াতাড়ি এই টেবিলে শুয়ে পড়। ভয় কি—ভয় নেই—কিছু ভয় নেই—

মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল—ভরসাও তো কিছু পাচ্ছি নে।

আমার কথা শুনে ডাক্তার চৌধুরী চটে লাল—ভরসা পাচ্ছ না তো এখানে এসেছ কি করতে—শোবার হয় তো শুয়ে পড় নয়তো চলে যাও—

অন্য যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মাঝে পড়ে বললেন—যাক যাক, শুয়ে পড়, তোমার কোনো ভাবনা নেই।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—মশায়, অজ্ঞান করা হবে তো?

চৌধুরী মশায় খিঁচিয়ে উঠলেন—না, তোমায় মুরগী জবাই করা হবে—এখন শুয়ে পড় তো।

ইষ্টনাম জপতে জপতে তো শুয়ে পড়া গেল। শুতে না শুতে মুখের ওপর কি একটা বাটির মত চাপা দিয়ে তার ভেতর দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে ছাড়তে লাগল ক্লোরোফর্ম।

বাপ রে বাপ! এ কি দম বন্ধ করে দিয়ে অজ্ঞান করবে নাকি! কিন্তু প্রথমটা তাই মনে হলেও পরে বেড়ে লাগতে লাগল হে! ক্লোরোফর্ম বেশ উঁচুদরের নেশা হে! হ'ল মন্দ নয়। শুয়ে শুয়ে বেড়ে নেশা উপভোগ করতে লাগলুম। কিন্তু সুখের পথে পদে পদে কণ্টক। একবার শুনলুম কে যেন বললে—হয়ে গিয়েছে।

—ওরে বাবা! হইনি—হইনি—এখনো অজ্ঞান হইনি। ডাক্তারবাবু, এখনো আমার জ্ঞান আছে।

ডাক্তার চৌধুরীর গলা পেলুম—হওনি তো কেতাত্থ করেছ—শীগগির অজ্ঞান হও বলছি, নইলে সজ্ঞানেই অস্ত্র ক'রে দেব।

নাকের ওপর ভোঁস ভোঁস করে সজোরে ক্লোরোফর্ম এসে পড়তে লাগল। নেশায় বুঁদ হয়ে গেলুম, কত রকমের মজার কল্পনা এসে জুটতে লাগল। ডাক্তার চৌধুরীকে নিয়ে মনে মনে একটা মজার গানও তৈরি ক'রে ফেললুম। সেটা গাইব কিনা ভাবছি এমন সময় চৌধুরীর গলা পেলুম—ছোকরা!

—আজ্ঞে।

—এখনো তুমি অজ্ঞান হওনি! হায় হায়, বদমাইস আমার চার আউন্স ক্লোরোফর্ম মেরে দিলে। লোকের কাছে ভিক্ষে করে আমি হাসপাতাল চালাই—এ রকম আর দুটি জুটলে তো হাসপাতাল তুলে দিতে হবে।

বললুম—আজ্ঞে মনে হচ্ছে এইবার অজ্ঞান হয়ে যাব।

বেশ কড়া গলায় ডাক্তার চৌধুরী বললেন—কত রকম নেশা করা হয় শুনি?

বাজে প্রশ্নের জবাব দিয়ে আর কি হবে! চুপ করে শুয়ে ক্লোরোফর্ম

টানতে লাগলুম। ওরি মধ্যে কখন যে ভাই ঘুমিয়ে পড়লুম তা মনেও নেই। ক্লোরোফর্মে যে এমন উঁচুদরের নেশা হয় হাসপাতালে না গেলে তা জানতেও পারতুম না।

জ্ঞান হয়ে মনে হল এ কোথায় যেন এসে পড়েছি। চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে, ঘরের মধ্যে আবছা আবছা আলো, দেখলুম সেই আলো-আঁধারির মধ্যে কারা যেন সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক, তার এক পা রাইট-এঙ্গেলের মত হাঁটু থেকে পেছন দিকে চলে গিয়েছে—লাঠি ধরে পাখীর মত এক পায়ে লাফাতে লাফাতে আমার কাছে এল। একটি স্ত্রীলোক, ব্যাণ্ডেজ-করা একখানা হাত তার গলায় ঝুলছে—আর একজন তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, একটা চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—আরো এই রকম দু'-একজন আমার খাটের কাছে এগিয়ে এসে আমায় দেখতে লাগল। অন্ধকারে তাদের মুখও ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমি হার্ণিয়া অপারেশন করতে হাসপাতালে এসেছিলুম, অস্ত্র করার পর বোধ হয় মরে গেছি। এই সব ল্যাংড়া খোঁড়ারাও হাসপাতালে মরেছে—ভূত হয়ে এখন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবতে ভাবতে কোমরে সাংঘাতিক জ্বালা বোধ হতে লাগল। প্রাণান্তকর জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠতে লাগল। কোনো রকমে গলা দিয়ে একটু স্বর বার করলুম—জল।

রাইট-এঙ্গেল-পায়া লোকটি বললে—এই যে জ্ঞান হয়েছে, আমরা তো মনে করলুম অজ্ঞানেই তোমার গঙ্গালাভ হল—যাক, তোমার জ্ঞান হয়েছে।

—আমায় একটু জল দিতে পারেন?

একজন বললে—জল তো তোমায় দেওয়া হবে না বাপু!

স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল—পোড়ারমুখো হাসপাতালে মরবার সময় মুখে একটু জল দেয় না গা!

লোকটি বললে—জল দেবে কি—পেট কাটা হয়েছে যে!

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলুম—বাবা গো, আর যে পারি না—

মাথায় ব্যাণ্ডেজওলা একচক্ষু লোকটি এগিয়ে এসে সহানুভূতির স্বরে বললে—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে?

তারপর বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল—আঃ—এত যন্ত্রণা হবার কথা তো নয়।

বললুম—অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, আর সহ্য করতে পারছি না।

—তা হ'লে বাপু ওরা তোমার পেটে কোনো যন্ত্রপাতি ভুলে রেখে দিয়েছে—আবার কাটতে হবে!

—এ্যাঁ—আবার কাটতে হবে!!!

মাথা ঘুরতে লাগল! চার আউন্স ক্লোরোফর্মে যা করতে পারেনি লোকটার এক কথায় তা হয়ে গেল—অর্থাৎ তখুনি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।"

গল্পগুজব করবার ক্ষমতা শরৎচন্দ্রের অসামান্য। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: গল্পগুজব করবার শক্তি হল তাঁর অদ্ভুত ও বিচিত্র,—শ্রোতাদের তাঁর সমুখে বসে থাকতে হত মন্ত্রমুগ্ধের মত। একদিন এমন কৌশলে একটি ভূতের গল্প বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রে একলা বাড়ী ফিরতে ভয় পেয়েছিলেন। সেই গল্পটি পরে আমি আমার "যকের ধন" উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর মুখের ভাষার অভাবে তার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে।"

—